সীরাতে সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ.

[প্রতিষ্ঠাতা : নদওয়াতুল উলামা, লাখনৌ, ভারত]

মূল

মাওলানা মুহাম্মাদ আল হাসানী রহ.

সম্পাদক, আল বা'ছুল ইসলামী

সম্পাদনা

মাওলানা লিয়াকত আলী

[নাযেমে তা'লীমাত, মাদরাসা দারুর রাশাদ]

ব্যবস্থাপনা

মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান

[মুহতামিম, মাদরাসা দারুর রাশাদ

খলিফা, মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.]

মুহাম্মদ ব্রাদার্স

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা

(16) سیرت سید محمد علی مونگیری از سید ابوالحسن علی ندویؒ

مترجم: ابوسعید محمد عمر علی

ناشر: محمد برادرس 38، بنگلہ بازار، ڈھاکہ 1100.

সীরাতে সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ.

মূল : মাওলানা মুহাম্মাদ আল হাসানী রহ.

প্রকাশক : মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা-১১০০

সেল : ০১৮২২-৮০৬১৬৩, ০১৭২৮-৫৯৮৪৪০

স্বত্ব : প্রকাশক

প্রকাশকাল : সফর, ১৪৩৭ হিজরী; অগ্রহায়ণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ; ডিসেম্বর, ২০১৫ ঈসায়ী

অক্ষর বিন্যাস : আর রাশাদ কম্পিউটার্স, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

মুদ্রণ : তাওয়াক্কুল প্রেস, ৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : সালসাবিল

মূল্য : ৩২০.০০ টাকা মাত্র।

ISBN : 978-984-91841-9-5

"Seerat-E-Sayed Muhammad Ali Mongery" written by Mawlana Muhammad Al Hasani in Urdu, Bangla Translation Edited by Mawlana Liaquat Ali. Published by Muhammad Brothers, Dhaka, 38, Banglabazar, Dhaka- 1000, Bangladesh. Price-Tk.320.00 only & U.$ 10 only.

উৎসর্গ

'মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত
দা'ঈ ও মুবাল্লিগ, মশহুর বুযর্গ,
আমাদের রূহানী উস্তাদ, মুফাক্কির-এ ইসলাম
আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর
অমর রূহের ছওয়াব রেছানীর উদ্দেশে যিনি ১৯৯৯ সালের
৩১ ডিসেম্বর/২২ রমযান শুক্রবার ১১.৫০ মিনিটে পবিত্র কুরআন
শরীফের সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াতরত অবস্থায় পরম প্রভুর আহ্বানে
তাঁর প্রিয় সান্নিধ্যে গমন করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।'

প্রকাশকের কথা

মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (রহঃ) ভারতীয় উপমহাদেশে শিক্ষার ইসলামীকরণ (Islamization of Education), খ্রিস্টানদের মিশনারী তৎপরতা প্রতিরোধ ও দ্বীনি দাওয়াতের ময়দানে এক লড়াকু সৈনিকের নাম। স্যার সৈয়দ আহমদ যেমন আলীগড় আন্দোলনের পুরোধা, তেমনি মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী নদওয়াকেন্দ্রীক ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। বহুমাত্রিকতা তাঁর জীবনকে করেছে বর্ণাঢ্য ও আদর্শস্থানীয়। জ্ঞান আহরণ, জ্ঞান বিতরণ, রূহানিয়তের চর্চা, ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ও দ্বীনের দাওয়াত মাওলানা মুঙ্গেরীর জীবনের আলোকিত দিক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ভারতের লক্ষ্ণৌস্থ দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা যুগপরম্পরায় তৈরী করেছে একগুচ্ছ ইসলামী পণ্ডিত যারা উপমহাদেশে বিশেষভাবে এবং এর সীমানা ছাড়িয়ে গোটা দুনিয়ায় সাধারণভাবে ইসলামী শিক্ষা, আদর্শ ও কৃষ্টির বাণী প্রচারে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হন।

মনীষীদের জীবনী দেশ ও মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ এবং জাতীয় ইতিহাস রচনার মৌলিক উপাদান। এ সম্পদ লালন, সংরক্ষণ ও বিস্তার জাতীয় কর্তব্য। ভবিষ্যত প্রজন্ম মনীষীদের জীবনাদর্শ ও কর্মপ্রয়াস থেকে দিকনির্দেশনা ও প্রেরণা পেয়ে থাকে। এ বিবেচনা ও ঐতিহ্যবোধ থেকে মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (রহঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী মুদ্রণ ও প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ঢাকার মিরপুরস্থ দারুর রাশাদ মাদরাসার প্রধান পরিচালক হযরত মাওলানা মোঃ সালমান সাহেবের (দাঃ বাঃ) তত্ত্বাবধানে এ গ্রন্থটি উর্দূ থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন দৈনিক নয়া দিগন্ত-এর সহকারী সম্পাদক বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা লিয়াকত আলী সাহেব। গ্রন্থটি মুহাম্মদ ব্রাদার্সের পক্ষ হতে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা কৃতার্থ। উল্লেখ্য লক্ষ্ণৌ দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার কৃতি সন্তান, বিশ্ববরেণ্য ইসলামী পণ্ডিত হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)-এর সব গ্রন্থ উর্দূ ও আরবী থেকে বাংলায় ভাষান্তর করে তা প্রকাশের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ আমরা হাতে নিয়েছি। ইতোমধ্যে ২৫টিরও অধিক গ্রন্থ আমরা পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। সঠিক সফলতার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে তাওফিক চাই। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মেহনত কবুল করুন, আমিন!

মুহাম্মদ আবদুর রউফ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

আল্লামা মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী

নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম পরিচালক মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ.-এর জীবনচরিত উপস্থাপন করার সময় নদওয়াতুল উলামার এক নগণ্য খাদেম ও সদস্য এবং মরহুম হযরতের গুণাবলী ও অবদানের এক অধম গুণগ্রাহী ও ভক্ত হিসেবে আমার অন্তর কৃতজ্ঞতা ও কৃতার্থতার আবেগে ভরপুর এবং আনন্দ ও উৎফুল্লতায় মুগ্ধ।

হিজরী ত্রয়োদশ ও খৃস্টীয় উনবিংশ শতাব্দী সারা ইসলামী বিশ্বে রাজনৈতিক অধঃপতন ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতার শতাব্দী। এই শতাব্দীতেই ইসলামী বিশ্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদশালী ও জনবলসমৃদ্ধ দেশগুলো পাশ্চাত্যের জাতিগুলোর দাস হয়ে যায়। সব জায়গায় সভ্যতা ও ইসলামী শিক্ষাগুলোকে জীবন মরণের টানাপোড়েনের শিকার হতে হয়। ইসলামী বিশ্বে নতুন নতুন ফিতনা, ভ্রষ্টকর আন্দোলন, এমন কি নবুওয়াতের দাবীদার পর্যন্ত জন্ম নেয়। খৃস্টান মিশনারীরা উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে নেমে পড়ে। নিরেট জড়বাদভিত্তিক নতুন শিক্ষাব্যবস্থা মুসলিম দেশগুলোতে ছায়া বিস্তার করে। মুসলিম বিশ্বের এই পরিস্থিতি মেধা ও সাহসিকতার সব প্রবাহ শুষ্ক এবং ইসলামী ভাবধারা ও জীবনের বৃক্ষ নির্জীব ও পত্র-পল্লবহীন হয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ঠ ছিল। কিন্তু খোদায়ী কুদরতের অনুপম লীলা, যা আগেও কয়েকবার হয়েছে, এই শতাব্দীতেই ইসলামী বিশ্বে বেশ কয়েকজন এমন ব্যক্তিত্ব জন্ম নিয়েছেন, যাদের চিন্তার স্তর এবং যাদের দৃঢ় মনোবল ওই যুগের সাথে মোটেই মিল খায় না এবং যারা নিজ চিন্তাভাবনা, নিজেদের খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতা, নিজেদের প্রতিভা ও দক্ষতা এবং নিজেদের জ্ঞান ও মানসিকতার সিদ্ধির দিক দিয়ে কোনোভাবেই সেই অধঃপতনের যুগের সৃষ্টি বলে মনে হয় না।

বুদ্ধিবৃত্তিক ও জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং ইতিহাসদর্শনের মূলনীতি অনুযায়ী তো এটির এ–ই ব্যাখ্যা করা যায় যে, প্রতিকূল পরিস্থিতি, মানসিক দ্বন্দ্ব ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ইসলামী মনের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে দেয় এবং পরিস্থিতির অবিরাম

পীড়ন এই নুড়ি পাথরকে পাথরে পরিণত করে দেয়, যা থেকে অবিরাম আলোকশিখা বিচ্ছুরিত হতে থাকে। কিন্তু এ উম্মতের সাথে আল্লাহ তাআলার যে আচরণ রয়েছে এবং তিনি যেভাবে এ উম্মতের জীবন ও অস্তিত্ব নিশ্চিত করেছেন, তা বিবেচনায় রেখে এই রহস্যের জট খোলা ও এই দ্বন্দ্ব অনুধাবন করা মোটেই কঠিন নয়। বরং এই বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে এ বিষয়টি অনুধাবন করা আরও সহজ হয়ে যায় অধঃপতনের যুগে এমন উন্নত ব্যক্তিত্বসমূহ কেন বেশি জন্ম নেন। জীবনের ধারা পাঠকের প্রতি জগতপ্রভু ও জীবন মৃত্যুর স্রষ্টার পক্ষ থেকে সবসময় এই নির্দেশনা যে–

نوارا تلخ تر می زن چو ذوق نغمہ کم یابی

حدی را تیز تر می خواں چو محمل را گراں بینی

'সুরের আবহ যখন কম অনুভব করবে
তখন তারে নমনীয় বাড়ি দেবে।'

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ .

'সেই আল্লাহ যিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন লোকদের নিরাশ হওয়ার পরে এবং তিনি তার রহমত বিস্তার করেন। আর তিনি প্রশংসনীয় অভিভাবক।'

ভারতবর্ষের জন্য এই বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অধঃপতন ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতার অংশ অন্যান্য মুসলিম দেশের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত ছিল। এখানে মোগল সাম্রাজ্য এবং প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের শেষ রাজনৈতিক শক্তির বাতি সবেমাত্র নিভে গিয়েছিল এবং এখানে সরাসরি সেই ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যারা মুসলমানদের শেষ প্রতিরোধ শক্তি দ্বারা আহত হয়ে মুসলমানদের জন্য সমবেদনা ও সহিষ্ণুতা বরং শাসকসুলভ নিরপেক্ষতা, সুবিচার ও সাম্যের মনোভাব থেকে শূন্য এবং প্রতিশোধের স্পৃহায় ভরপুর ছিল। এ ছিল অত্যন্ত অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা, অস্থিরতা, হতাশা, দ্বিধা ও দোদুল্য এবং অসহায়তা, নিঃসঙ্গতার যুগ। এমন পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষ যদি মহৎ ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব থেকে শূন্য থাকত এবং এখানে ব্যক্তিদুর্ভিক্ষের যুগ থাকত, তাহলে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। কিন্তু বিপরীতক্রমে এ যুগটি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও কর্মীদের দিক দিয়ে, শাস্ত্রীয় বিশেষজ্ঞ, রচয়িতা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের দিক দিয়ে, আধ্যাত্মিক সাধককের দৃষ্টিকোণ থেকে, শিক্ষা ও সংস্কার আন্দোলনের বিচারে এবং এ যুগে বেশ কয়েকটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, যেগুলো নিছক পাঠ্যালয় নয় বরং চিন্তাকেন্দ্র ও স্বতন্ত্র দর্শনকেন্দ্র– এ দিক দিয়েও ভারতবর্ষ ছিল সারা ইসলামী বিশ্বে বিশেষ অবস্থানের অধিকারী।

এই যুগের সেই অসাধারণ ব্যক্তিবর্গের একজন ছিলেন মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী। তিনি ছিলেন সামগ্রিকতা ও ভারসাম্যের এমন সমাহার, যার নজির সেই যুগে পাওয়া কঠিন ছিল। খোদামুখিতা ও স্রষ্ঠাগত প্রাণ, আল্লাহর প্রেম ও বিভোরতা, সুন্নতের পূর্ণ অনুসরণ ও রাসূলের আদর্শে বিলীনতা, ইসলামের জন্য অন্তর্জ্বালা ও উম্মতের চিন্তা, উচ্চ মনোবল ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তার সজীবতা ও সাহসিকতাপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি, ঈমানী দূরদৃষ্টি, বাস্তবপ্রিয়তা ও বাস্ত বতা, যুগের নাড়ির স্পন্দনবোধ, ভবিষ্যতের আশঙ্কা সম্পর্কে সচেতনতা, উদারচিত্ত, উদার দৃষ্টি, সমাজ সেবার যোগ্যতা, বিচিত্র রুচির সাথীদের নিয়ে কর্মসম্পাদন ও সহযোগিতায় সবসময় প্রস্তুতি- এসব বিভিন্ন ও দৃশ্যতঃ সাংঘর্ষিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য তার সত্তায় এমনভাবে সমাহার ও সহাবস্থান নিয়েছিল যে, তা দর্শকের জন্য ও তার জীবনী পাঠকের দৃষ্টির সামগ্রিকতার জন্য স্বতন্ত্র পরীক্ষা হয়ে যায়।

তিনি যেভাবে পেয়ালা ও বাটি এবং সীসা ও লোহা একত্র করেছিলেন, তিনি যেই সীমিত পরিসরে অবস্থান করে বাইরের প্রশস্ত জগত প্রত্যক্ষ করেন, যেসব অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ ইঙ্গিতের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের আশঙ্কাসমূহ স্পষ্টভাবে সনাক্ত করেন ও তাৎপর্যপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করেন, যেখানের দ্বার ও দেয়াল থেকে-

(گوش بند و چشم بند و لب بہ بند)

চোখ-কান ও মুখ বন্ধ রাখার আহ্বান থাকত, সেই ক্ষুদ্র ও অনাড়ম্বর পরিবেশে থেকেও যুগের আধুনিক চাহিদা অনুভব করেন ও এ জন্য অস্থির হন, যেই স্বল্প উপকরণ নিয়ে এমন এক বিশ্বমানের ও বৈপ্লবিক দীনী শিক্ষা আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেন, যার সামনে মিসর ও তুরস্কের সংস্কারকরাও এ যুগে যেতে পারেননি- তা এক বিস্ময়কর কাহিনী। আর তা তার নিছক সহজাত প্রজ্ঞা ও প্রখর প্রতিভার প্রমাণ। এ থেকে আরো প্রমাণিত হয়, তার মন মস্তিষ্ক শুধু সেই পরিবেশ ও শিক্ষা-দীক্ষার ফল নয়, যা তিনি পেয়েছিলেন। বরং সেই মহান সম্পর্কের ফল, যা তিনি লাভ করেছিলেন পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক উপায়ে। কবির ভাষায়,

تری آگ اس خاکداں سے نہیں

'তোমার আগুন এই মাটির পাত্রের নয়।'

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি নদওয়াতুল উলামার যে ব্যাপক ও উন্নত ধারণা পেশ করেন, যেভাবে উদ্দেশ্য ও উপকরণ বিশ্লেষণ করেন, যেভাবে সনাতন পাঠ্যক্রমে সহযোগী বিষয়গুলোর প্রাধান্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক পাঠ্যসমূহের

অহেতুক আধিক্যের সাহসিকতাপূর্ণ সমালোচনা করেন, যেভাবে আরবি ভাষায় বুৎপত্তি ও ইসলামী বিষয়সমূহে দক্ষতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন, যেভাবে ফিকাহ্‌র নতুন সংকলন এবং আধুনিক প্রশ্নাদি ও প্রয়োজনাদি নিয়ে নতুনভাবে চিন্তার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন, যেভাবে পরস্পরকে কাফের ঘোষণা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কোলাহলপূর্ণ যুগে ঐক্যের এবং বিকর্ত-বিতণ্ডা ও প্রান্তিকতার উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে মধ্যপন্থার আহ্বান জানান, তিনি যেভাবে ইসলামীবিরোধীদের প্রশ্নসমূহ খণ্ডন করার জন্য আধুনিক দর্শন অধ্যয়ন ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার ওপর জোর দেন, যে পরিবেশে প্রতিটি নতুন বিষয়কে ধর্মহীনতা ও প্রকৃতিবাদের আলামত মনে করা হতো, সেই পরিবেশে তিনি যেভাবে উপকারী জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইংরেজিভাষা ও বক্তৃতা-রচনা অনুশীলনের উৎসাহ দেন, নিঃসঙ্গতা ও কুধারণার যুগে তিনি যেভাবে দীনী মাদরাসাগুলোর জোট গঠনের আহ্বান জানান, তিনি যেভাবে মাদরাসা ও সংগঠনগুলোর বার্ষিক সভাগুলোতে ইসলামী উম্মাহকে নিয়ে চিন্তার জন্য আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণিকে আহ্বান জানান, তাদেরকে উলামা মাশায়েখের পাশাপাশি বসান এবং তাদের প্রতি সহযোগিতা ও আস্থার হাত প্রসারিত করেন, তিনি যেভাবে বৈরি ও প্রতিদ্বন্দ্বী উলামা ও সংগঠনগুলোর পরস্পরে লড়াইরত নেতৃবৃন্দকে একত্র করেন এবং আলিঙ্গন করান, তিনি যেভাবে মাদরাসাগুলোর আলেম ও স্নাতকদের যুগপরিস্থিতি সম্পর্কে অবগতি, বাস্তবজীবনে অংশগ্রহণ এবং স্বর্ণযুগের মতো মুসলমানদের পথনির্দেশের দায়িত্ব নেয়ার আহ্বান জানান, তিনি যেভাবে সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও দীনের সেবার জন্য ইসলামপ্রদত্ত স্বাধীনতা ও ফিকাহ্‌প্রদত্ত অবকাশকে আরও কাজে লাগানো বৈধ সাব্যস্ত করেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে ও আচরণে উঁচুমাপের তাকওয়া ও সাধুতা সত্ত্বেও সামষ্টিক কাজে তা শুধু মেনে নেননি বরং জরুরি সাব্যস্ত করেন– এগুলো এবং এমন আরও অনেক অনন্যতা ও বৈশিষ্ট্য যদিও এখন বিরল ও অসাধারণ মনে করা হয় না কিন্তু এগুলোর মধ্যে অনেক বিষয় ওই যুগের চেয়ে অগ্রসর ছিল। আর এগুলোর সাহস কেবল তিনিই করতে পারতেন, যার ইসলাম, দীনীবোধ ও তাকওয়া-সাধুতা সন্দেহাতীত এবং যিনি জ্ঞানের গভীরতার সম্পদ, দীনেরবোধ, অন্তর্দৃষ্টি ও আস্থার শক্তি অর্জন করেছেন। নিঃসন্দেহে এগুলোর মধ্যে অনেক বিষয় বর্তমানে পরিচিত ও স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হয় এবং এগুলো সাধারণভাবে সমাদৃত হয়েছে। এতেও তার নিষ্ঠা, অন্তর্জ্বালা, বেদনার্ততা ও অবিরাম চেষ্টা সাধনার প্রভাব রয়েছে।

এই মহান ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের (নদওয়াতুল উলামা) প্রতিষ্ঠাতা হওয়া ছাড়াও তার অন্যান্য দিকও সর্বজন স্বীকৃত ও অসাধারণ। তিনি একজন অত্যন্ত

উঁচুমাপের আলেম এবং উন্নত মানের ইসলাম প্রচারক ও সংস্কারক। খৃস্টবাদ ও কাদিয়ানী মতবাদ প্রতিরোধে তার কার্যক্রম ইজতিহাদী ও তাজদীদী মর্যাদার অধিকারী। সর্বোপরি তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের শায়খে তরিকত এবং উন্নত স্তরের আধ্যাত্মিক বুযুর্গ ও আরেফবিল্লাহ। তার জীবনযাত্রা, রূহানি হালাত, মাকামাত ও প্রভাব প্রথম যুগের আওলিয়ায়ে কেরামের স্মৃতি জাগায়। তাঁর দ্বারা আল্লাহর হাজার হাজার বান্দা উপকৃত হয়েছে ও জীবনের সাফল্য লাভ করেছে। মোটকথা তিনি এমন প্রচুর গুণের সমষ্টি যে, তিনি এক ব্যক্তি নন বরং অনেক সিদ্ধ ব্যক্তির সমষ্টি।

وہ اپنی ذات سے ایک انجمن ہیں

'তার সত্তাই একটি সংগঠন।'

এই গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলী এবং তাঁর অবদান ও কীর্তিসমূহের দাবি ছিল তাঁর জীবনী এখন থেকে অনেক আগেই প্রণীত ও প্রকাশিত হয়ে যাওয়া। এটি আরও যুক্তিসঙ্গত ছিল এ জন্য যে, তিনি এমন এক আন্দোলন ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা, যা অসংখ্য লেখক ও কলমসৈনিক তৈরি করেছে এবং তারা জীবনী রচনা ও চরিত বিন্যাসকে নিজেদের বিশেষ ক্ষেত্র করেছেন। কৃতজ্ঞতাবোধ ও দায়িত্ববোধের দাবি ছিল নদওয়াতুল উলামার পক্ষ থেকে তার যথোপযুক্ত জীবন চরিত খণ্ড খণ্ড আকারে প্রণীত ও প্রকাশিত হওয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তা তাড়াতাড়ি হতে পারল না এবং এ সময় যতই অতিক্রম করতে থাকল, কাজটি ততই কঠিন মনে হতে লাগল। কেননা তথ্যসমূহ খুব বিক্ষিপ্ত এবং বেশির ভাগই ছিল হযরতের শেষ আধ্যাত্মিক সাধনাকেন্দ্র মুঙ্গেরের খানকাহে রহমানীতে। হযরতের সাহেবজাদা মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ রাহমানী (আমীরে শরীয়ত বিহার)–এর আকাঙ্ক্ষা ছিল মাওলানা সাইয়িদ মানাজির আহসান গিলানি রহ. এটি প্রণয়ন করবেন। কেননা হযরতের সাথে মাওলানা গিলানির বিশেষ সম্পর্ক ও আত্মীয়তা ছিল। তেমনি তারা ছিলেন একই এলাকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর এ কাজের সুযোগ হয়নি, ফলে কাজটি রয়েই গেল।

یک حرف کاشکے است کہ صد جا نوشتہ ایم

'শত জায়গায় শুধু লিখলাম হায়!'

এই অধম যদিও হযরতকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেনি এবং নিজের স্বল্প পুঁজি ও অযোগ্যতার কারণে হযরতের জাহেরি ও বাতেনী কামালাত অনুধাবনে একদম অক্ষম ছিল, তবুও নিজের সৌভাগ্য ও নদওয়াতুল উলামার পক্ষ থেকে একটি নৈতিক দায়িত্ব মনে করে আন্তরিক কামনা রাখতাম এই কাজটি যেন আমার

হাতে সম্পন্ন হয় এবং এ সৌভাগ্য যেন আমারই হয়। তবে মনে মনে রূপরেখা তৈরি করলাম এভাবে যে, প্রথমে হযরত মাওলানার মহান শায়খ এবং নদওয়াতুল উলামার অধিকাংশ সদস্যের মুরশিদ ও মুরব্বি, যুগের ওয়ায়েস হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ.-এর জীবনী প্রণীত হোক। আগেরটা আগে এই নিয়মে। আল্লাহ তাআলা এ কামনা পূরণ করেছেন এবং ১৩৭৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৮ খৃস্টাব্দে তা প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছে। এবার ছিল হযরত মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ.-এর জীবনীর পালা। আর এতে বিলম্বের কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। এদিকে হযরতের সাহেবজাদা হযরত মাওলানা সাইয়িদ মিন্নাতুল্লাহ রাহমানী (আমিরে শরীয়ত বিহার) এর কামনা ও পীড়াপীড়ি ছিল এ অধমই যেন কাজটি সম্পাদন করেন। বিভিন্ন কারণে এই জীবনীটি অধমেরই কর্তব্য ছিল। আর এ অধম নিজের স্বল্প পুঁজি সত্ত্বেও এটিকে নিজের সৌভাগ্য ও সার্থকতার উপায় মনে করত। কিন্তু সেই সময়ে চোখে পানি ঝরার রোগে এমন কাবু হয়ে পড়লাম যে, সূক্ষ্ম লেখা পড়া ও নিজে লেখা কঠিন হয় পড়ল। হযরত মাওলানার জীবনী লেখার জন্য প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত হাজার হাজার পৃষ্ঠা পাঠ করা প্রয়োজন ছিল। পারিবারিক লেখা, পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্রের বিরাট ভাণ্ডার (যার বড় একটি অংশ আমাদের এখানে সংরক্ষিত রয়েছে), নদওয়াতুল উলামার সভাগুলোর কার্যবিবরণী, ব্যবস্থাপনা পরিষদের কার্যক্রমের ফাইল, হযরত মাওলানার রচনাবলী ও নিবন্ধসমূহ– এসবই এক বিরাট অফিস, বরং একটি পাঠাগার ছিল। এগুলো বিস্তারিত পর্যালোচনা ছাড়াও পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ করা ছাড়া তার জীবনী লেখা সম্ভবও ছিল না, সঠিকও ছিল না। আমি মাওলানা সাইয়িদ মিন্নাতুল্লাহ সাহেবের কাছে অনুমতি নিলাম যে, কাজটি আমি নিজের তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনায় করাবো। অবশ্য আমার নিজের লেখা কঠিন হবে। তিনি কিছুটা দ্বিধা ও সংশয়ের সাথে অনুমতি দিলেন এবং নিজের কাছ থেকে হাতে লেখা ও প্রকাশিত সব তথ্য ভাণ্ডার হস্তান্তর করলেন। নদওয়াতুল উলামার কুতুবখানা ও নদওয়াতুল উলামার দফতর থেকে সংশ্লিষ্ট সব কিতাব, রোয়েদাদ ও ব্যবস্থাপনা পরিষদের কাগজপত্র সংগ্রহ করা হলো। দারুল উলূমের ভবনের এক অংশে 'তালীফে সাওয়ানেহে মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী' নামে একটি অফিস ও বিভাগ চালু করা হলো। আমি কাজের একটি রূপরেখা ও গ্রন্থের অধ্যায় ও বিষয়গুলোর সূচীও তৈরি করলাম। কাজটি সম্পন্ন করার জন্য দেশের একজন বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবীর সেবা নেয়ার চিন্তা হয়। কেননা বুযুর্গানে দীন ও উলামা মাশায়েখের জীবনী ও বাণীসমূহ সঙ্কলনের সাথে তার গতিশীল ও সজীব কলমের বিশেষ সম্পর্ক

রয়েছে। তার সাথে চিঠিপত্র বিনিময় হয় এবং তিনি এ আহ্বান (নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করে) কবুল করলেন। সিদ্ধান্ত হলো তিনি কিছুদিন লাখনৌ অবস্থান করবেন এবং আমার পরামর্শে গ্রন্থখানা প্রণয়ন করবেন।

এ সময়ে একদিন হঠাৎ জানা গেল আমার স্নেহের ভাতিজা সাইয়িদ মুহাম্মদ আল হাসানী (তার আল বাছুল ইসলামীর অফিস ছিল সেই কামরায়, যেখানে এই নতুন অফিস চালু করা হয়) কারো বলা ছাড়াই নিজের আগ্রহে এ কাজ শুরু করেছে এবং তার একান্ত কামনা তার হাতেই কাজটি সম্পাদন হোক। সম্ভবতঃ এটার প্রণোদক ছিল এই যে, তার দাদা (আমার আব্বাজান) মাওলানা হাকীম সাইয়িদ আবদুল হাই সাহেব রহ. ছিলেন মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. এর প্রথম আস্থাভাজন এবং দীর্ঘকাল নদওয়াতুল উলামার কাজে তার একান্ত সহযোগী। তাছাড়া হযরত মাওলানা মুঙ্গেরীর সাথে তার বিভিন্ন দিক দিয়ে বিশেষ সম্পর্ক ছিল। হয়ত তার ধমনীতে প্রবাহিত এই পুরনো ও গভীর আত্মিক সম্পর্কের প্রতিক্রিয়া তার ওপর প্রভাব ফেলে। এই অধমের সাথে যেসব স্নেহভাজনের বিশেষ ও প্রিয়ভাজনসুলভ সম্পর্ক রয়েছে, তাদের মধ্যে উক্ত স্নেহভাজনের সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্য রয়েছে আমার ভালোমন্দ লেখার পদ্ধতির সাথে। মাঝে মধ্যে তার লেখা ও আমার নিজের লেখার মধ্যে আমিই বিভ্রাটে পড়ি। আল্লাহ তাআলা তাকে কু-নজর থেকে রক্ষা করুন। যে নিজের দাদার লেখনির গতি ও লেখার সাবলীলতা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে। আমি তার আগ্রহ উদ্দীপনা দেখে এবং তার লেখা ও রচনা আমার লেখা ও রচনার সবচেয়ে বেশি প্রতিনিধিত্ব করবে বলে আশা রেখে তাকে অনুমতি দিলাম। আমার আরো প্রশান্তি ও আনন্দ হলো এ কথা জেনে যে, সে এই কাজটি নিছক নিজের সৌভাগ্য মনে করে সম্পাদন করেছে এবং সেইসব নিয়ম লক্ষ্য রাখছে, আহলুল্লাহ ও বুযুর্গানে দীনের জীবনী প্রণয়ন ও রচনার সময় যেগুলো লক্ষ্য রাখা উচিত।

সে অল্প দিনের মধ্যেই জীবনীটি সম্পন্ন করলো। দেখে বোঝা গেল সে গ্রন্থখানা প্রণয়নে পুরো পরিশ্রম করেছে এবং নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। সে সংশ্লিষ্ট সব তথ্য গভীর দৃষ্টিতে পাঠ করেছে এবং তা খুব ভালোভাবে কাজে লাগিয়েছে। গ্রন্থখানা যে আঙ্গিক ধারণ করেছে, তা প্রকৃতপক্ষে আমার কল্পনা ও প্রত্যাশার চেয়ে ঊর্ধ্বে ছিল। এ সত্য প্রকাশে আমার মোটেই দ্বিধা নেই এবং এতে মোটেই কোন আত্মীয়তার প্রভাব নেই যে, এখন আমার নিজের না লেখার কারণে একটুও অস্বস্তি ও দুঃখ নেই। বরং বলা যায়, এই অবসরহীনতা ও মানসিক বিক্ষিপ্ততা-অস্থিরতার সময়ে আমার খুবই সন্দেহ হয় আমি এটিকে এত

সুন্দর করে সম্পাদন করতে পারতাম কি না এবং এটির প্রাপ্য আদায় করতে পারতাম কি না!

মানবীয় সব কাজের মতোই, তাছাড়া এমন একজন নবীন লেখকের লেখা হিসেবে, যিনি এই গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর প্রসঙ্গে কলম ধরেছেন, অনেক আন্দোলন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্বের সাথে যার সমকালীনসুলভ সম্পর্ক রয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে সবার প্রতিক্রিয়া ও মনোভাব তার ব্যাপারে সমান নয়– এতে দৃষ্টিকোণের ভিন্নতা ও সমালোচনার অবকাশ রয়েছে। এতে অপরিপক্বতাও থাকতে পারে, ঘাটতিও থাকতে পারে। কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই যে, লেখক এতে নিজের বয়স ও যোগ্যতার চেয়ে পরিপক্বতার প্রমাণ দিয়েছে এবং কোথাও নিরপেক্ষতার আঁচল ও ভারসাম্যের বিন্দু হাত ছাড়া হতে দেননি। গ্রন্থখানা যেমন সামগ্রিক, তেমনি প্রভাবশালী। এটি নিছক একজন মহান ও বুযুর্গ ব্যক্তির জীবনী নয়, বরং এক মহান আন্দোলনের ইতিহাসও। এক সমাজের চিত্র এবং একটি পুরো যুগের প্রতিচ্ছবিও। তা যেমন অতীতের কাহিনী, তেমনি ভবিষ্যতের স্বপ্নও, যা দেখেছিলেন আল্লাহর এক প্রিয় ও উচ্চ মনোবলের ব্যক্তি এবং যার বাস্তবরূপ এখনও পুরোপুরি প্রকাশ পায়নি। এই মহান প্রতিষ্ঠানের সন্তানদের ও দায়িত্বশীলদের অবশ্য কর্তব্য এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেষ্টা করা।

আবুল হাসান আলী নদভী
দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা, লাখনৌ, ভারত

১১ রজব, ১৩৮৩ হিজরী
২৮ নভেম্বর, ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দ

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার নাযেম
হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ রাবে হাসান নদভী দা. বা.-এর
দুআ ও ইজাযত

মানুষের জীবন তার জ্ঞান অনুযায়ী গঠিত ও বিকশিত হয়। তেমনি উপকারযোগ্য জ্ঞান অর্জন করা মানুষের চাহিদা মেটানোর বড় মাধ্যম হয়। উপকারযোগ্য জ্ঞানেরই নাম ইলম। ইলমের গুরুত্ব কুরআন মজীদে প্রকাশ করা হয়েছে এবং সেটিকে অসাধারণ সৃষ্টি হিসেবে হযরত আদম আলাইহিস সালামের গুরুত্বপূর্ণ গুণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। জ্ঞান অর্জনের প্রেরণা সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রাখা হয়েছে। শিশুর জন্মের পরেই তার মধ্যে তা পাওয়া যায়। প্রথমে সে নিজের পরিবেশ দেখে এবং পরিবেশের ঘটনাবলী দেখে জ্ঞান অর্জন করে। তারপর সামনে গিয়ে জীবনের বিকাশ সাধন এবং আরো সামগ্রী ও উপকারী উপকরণসমূহের অর্জন সম্পন্ন করে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে।

মুসলমানেরা কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী শিক্ষার অনেক উন্নতি সাধন করেন এবং শিক্ষার সামগ্রিক ও উৎকৃষ্ট নির্দেশনার আদর্শ নির্মাণ করেন। তারা পার্থিব চাহিদার দিক দিয়ে ও দীনী চাহিদার দিক দিয়ে জ্ঞান অর্জন করেন এবং নিজেদের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে অনেক উন্নতি সাধন করেন। পরের শতাব্দীগুলোতে এ দিকে মনোযোগ কমে যায়। তাদের কাছে শিখে পাশ্চাত্যের জাতিগুলো উন্নতি আরম্ভ করে। কিন্তু তারা শুধু পার্থিব চাহিদার পরিসরে উন্নতি লাভ করে। কিন্তু মুসলমানেরা তাদের উন্নতির শতাব্দীগুলোতে দীনী ও পার্থিব উভয় দিক দিয়ে উন্নতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু পরে তারা সাধারণভাবে শুধু দীনী চাহিদা পর্যন্ত শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। অথচ আগে তারা উভয় ধারার শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

অবশ্য বিগত এক শতাব্দী আগে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামের পরামর্শে এ প্রয়োজন অনুভূত হয়। হযরত মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ মুঙ্গেরী রহ. ছিলেন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব সে সময় এক পরামর্শ সভায় দীনী শিক্ষাব্যবস্থায় বৈধ পার্থিব চাহিদার উপযোগী বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই অনুযায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষালয় স্থাপন করা হয়,

নদওয়াতুল উলামা ও দারুল উলূম নামে যা আখ্যায়িত। এটির পৃষ্ঠপোষকতা করেন হযরত মুঙ্গেরী। আর তাঁর সহযোগিতায় অংশ নেন কয়েকজন শিক্ষাবিদ ও দীনী ব্যক্তিত্ব।

তাদের মধ্যে মাওলানা শিবলি নোমানীর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য সহযোগীর মধ্যে মাওলানা আব্দুল হাই হাসানীর নামও উল্লেখযোগ্য। মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ. যেহেতু এই আন্দোলন ও সংস্থার মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন, এটির প্রথম পরিচালক হন। এজন্য তাঁর জীবন এবং তাঁর দাওয়াতী, ইসলামী ও শিক্ষা প্রচেষ্টাসমূহ সম্পর্কে অবহিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়। তাঁর সম্পর্কিত রচনার সৌভাগ্য তাঁর সহকর্মী মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই হাসানী (সাবেক পরিচালক নদওয়াতুল উলামা)–এর পৌত্র এবং ইসলামী মনীষী হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভীর ভাতিজা প্রিয় ভাই মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ হাসানী প্রস্তুত করে সম্পন্ন করেন। এটি হযরত মুঙ্গেরী রহ. সম্পর্কিত এক উৎকৃষ্ট দলিলের মর্যাদা রাখে। দাওয়াত ও শিক্ষার দিক দিয়ে হযরত মুঙ্গেরীর বিশেষ মর্যাদা ছিল, তা ছাড়া তিনি মুরুব্বি ও মুরশিদ হিসেবেও এক উঁচু মর্যাদার অধিকারী। তিনি সমকালীন বুযুর্গ হযরত মাওলানা শাহ ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদীর খলিফাদের মধ্যে অনন্য মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ধন্যবাদ জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান কাসেমী যীদা তাওফীকুহুকে। তিনি তা বাংলাভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন। ফলে এই চিন্তাধারা ও সংস্থার এবং এটির কার্যক্রমের পরিচয় বাংলাদেশের জ্ঞানীগুণী মহলে ব্যাপক প্রসারিত হবে। তাছাড়া এই নতুন ধারায় কাজ করার প্রেরণা লাভ হবে।

মুহাম্মাদ রাবে হাসানী নদভী
দায়েরায়ে শাহ আলামুল্লাহ, তাকিয়া, রায়বেরেলি
লাখনৌ, ভারত
১০/১০/২০১৫ ঈসায়ী

ব্যবস্থাপকের কথা

বিসমিহি তাআলা

উপমহাদেশের মুসলিম পুনর্জাগরণের ইতিহাসে মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ.-এর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তৎকালীন বৃটিশ ভারতে চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের, বিশেষ করে উলামা সমাজের চলার পথকে সুগম করার লক্ষ্যে তিনি একটি মিশন নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতবী, আলীগড় ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মতো মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরীর মধ্যেও কাজ করেছিল জাতিকে বাঁচানোর একটি অস্থিরতা। যা তাঁকে চালিত করেছিল নদওয়াতুল উলামার মতো একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন দাঁড় করাতে। মাওলানা কাসেম নানুতবী যেমনি হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর আধ্যাত্মিক রাহবারীর মাধ্যমে দেওবন্দ আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তেমনি মাওলানা মুঙ্গেরীও যামানার কুতুব হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাবাদীর রূহানী রাহবারী হাসিল করে ১৮৯২ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নদওয়াতুল উলামা সংগঠন। প্রায় তিন বছর পরে এই সংগঠনের অধীনে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা। আল্লাহর শোকর দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা প্রতিষ্ঠিত না হলে নদওয়াতুল উলামা সংগঠনের অস্তিত্ব হয়তো খুঁজেও পাওয়া যেত না।

যা হোক আমাদের বাংলা ভাষাভাষি উলামা এবং সুধী সমাজের কাছে নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা মহান কর্মবীর দূরদর্শী আলেমেদীন মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরীর পরিচিতি তুলে ধরার জন্য কয়েক বছর পূর্ব হতে পরিকল্পনা চলছিল। আমাদের শিক্ষাসচিব মাওলানা লিয়াকত আলী ও আমি দু'জনে মিলে এ কাজকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে থাকি। হযরত মুঙ্গেরীর উপর মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর ভাতিজা অসাধারণ প্রতিভাধর আলেমেদীন মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আল হাসানী রহ. রচিত 'সীরাতে' সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী'র অনুবাদের কাজ শুরু হয়ে যায়।

অনুবাদ কাজে আমাদের মাদরাসার কয়েকজন কলমসৈনিক আলেমেদীন অংশ নেন।

আমার সৌভাগ্য যে কিছু দিন পূর্বে ভারত সফরের সময় মুঙ্গেরে হযরত মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরীর কবর যিয়ারত এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামিয়া রহমানী ও খানকাহে রহমানী পরিদর্শনের সুযোগ পাই। এরপর লাখনৌ অবস্থানকালে হযরত মাওলানা মুঙ্গেরীর পীর ও মুরশিদ কুতুবে জামান মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদীর কবর যিয়ারত করারও সুযোগ হয়।

লাখনৌ অবস্থানকালে এই বইয়ের উপর কিছু লিখে দেওয়ার অনুরোধ করলে আমাদের বর্তমান পীর ও মুরশিদ এবং নদওয়ার নাযেমে আ'লা মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ রাবে হাসানী নদভী দা. বা. কিছু লিখে দেন। এছাড়া এদেশের কয়েকজন বিখ্যাত আলেমেদীনের অভিমত ও দুআও এ গ্রন্থের শুরুতে স্থান পেয়েছে।

বিশিষ্ট আলেমেদীন মাদরাসা দারুর রাশাদের শিক্ষাসচিব মাওলানা লিয়াকত আলী গ্রন্থখানা সম্পাদনা করেছেন। এছাড়া মাওলানা মুহাম্মাদ কামালুদ্দীন ফারুকী ও নবীন লেখক মাসিক আর রাশাদের সহকারী সম্পাদক মাওলানা মিযানুর রহমান জামীল এবং আমাদের সাংবাদিক বিভাগের ছাত্র মাওলানা মিছবাহুল ইসলাম বইখানার কম্পোজ ও প্রুফ রিডিং এর কাজে রাত-দিন একাকার করে দিয়েছেন।

সর্বপরি হযরত মুফাক্কিরে ইসলামের কিতাবগুলোর বাংলা ভাষায় প্রকাশনার সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব 'মুহাম্মাদ ব্রাদার্স' (Academy of Islamic Pablications)-র সত্ত্বাধিকারী জনাব প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুর রউফ সাহেব বইখানা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় তা অনেক সহজেই পাঠকসমাজের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। দুআ করি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই গ্রন্থের সাথে জড়িত সকলকে কবুল করুন এবং হযরত মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ.-এর চিন্তা-চেতনার মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

তারিখ : ০২. ১২. ২০১৫ ঈসায়ী

মুহাম্মাদ সালমান
মুহতামিম, মাদরাসা দারুর রাশাদ
পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

বাংলা ভাষার অন্যতম পুরোধা কিংবদন্তি আলেমে দীন
মাসিক মদীনার সম্পাদক

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান দা. বা.-এর

মূল্যবান বাণী ও দুআ

ভারতের লাখনৌ অবস্থিত নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. এর পরিচয় নতুন ভাবে দেয়ার দরকার পড়ে না। উনবিংশ শতাব্দিতে উপমহাদেশে যখন গোমরাহীর জোয়ার শুরু হয়, ইসলামী দুনিয়া যখন বাইরের পরোক্ষ ইন্ধনের শিকার, ঠিক তখনই মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরীর অপরিসীম বিপ্লব জাতির চেতনাকে নতুনভাবে শাণিত করে। তাঁর কর্মময় জীবন্তিকা, অক্লান্ত সাধনা ও চারিত্রিক শিষ্টাচার উপমহাদেশের শিক্ষা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে অমর হয়ে থাকবে।

মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. ছিলেন হযরত আব্দুল কাদের জিলানী এর বংশধর, ফলে তাঁর জীবন ও চিন্তা-চেতনায় সাধারণ সুফি-সাধক ও দরবেশদের জীবনের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যেত। ভারতসহ সমগ্র জাহানে রয়েছে তাঁর চার লাখ মুরিদান। তিনি যে মানুষের কাছে কত জনপ্রিয় ও গ্রহনযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন উক্ত সংখ্যায় তার প্রমাণ মিলে।

সাইয়িদ মুহাম্মদ আল হাসানী উর্দূ ভাষায় আল্লামা মুঙ্গেরী রহ. এর ৪২৪ পৃষ্ঠার জীবনীগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এতে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম দার্শনিক ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. ভূমিকা টানেন। সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এর অন্যতম খলীফা, দারুর রাশাদ এর প্রধান পরিচালক মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান দা. বা. এর ব্যবস্থাপনায়, মাদরাসার শিক্ষাসচিব নয়া দিগন্তের সহ-সম্পাদক মাওলানা লিয়াকত আলী দা. বা. এর সম্পাদনায় উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করার এ মহতি উদ্যোগকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

আলহামদুলিল্লাহ! মাওলানার পাণ্ডুলিপি দেখেছি। মাশাআল্লাহ ভাষা ঝরঝরে প্রাঞ্জল ও গতিশীল। বর্তমান সময়ে বাংলাভাষায় রচিত জীবনী সাহিত্যের ভাণ্ডারে এ গ্রন্থটি হবে একটি অন্যতম সংযোজন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশী পাঠকবৃন্দ এমন এক মনীষীর খোঁজ পাবেন যিনি গোটা জীবন দ্বীনি ইলাহীর খিদমতে ফানাহ করেন। আমি গ্রন্থটির ব্যাপক প্রচার প্রসার কামনা করি। আল্লাহ তার ব্যবস্থাপক সম্পাদক অনুবাদক ও সংকলককে উত্তম বিনিময় দান করুন।

খতীবে আজম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ রহ. এর সুযোগ্য জামাতা
ও মাসিক আত-তাওহীদের সম্পাদক
মাওলানা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন দা. বা.-এর

মূল্যবান অভিমত ও দুআ

বিশ্বখ্যাত দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারতের লাখনৌ নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মাওলানা সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. এর পরিচিতি নতুন করে দেয়ার অপেক্ষা রাখে না। উনবিংশ শতাব্দিতে ভারতীয় উপমহাদেশে যখন লা দীনিয়াতের জোয়ার বইতে শুরু করে, মুসলিম মিল্লাত যখন অভ্যন্তরীণ সজ্ঘাত ও বহির্শক্তির চক্রান্তের শিকার সে মুহূর্তে মাওলানা সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরীর কুরবানী ও জিহাদী ভূমিকা জাতি কখনও ভুলতে পারে না। তাঁর কর্মমূখর জীবন, অনুপম সাধনা ও আকর্ষণীয় চরিত্রমাধুর্য উপমহাদেশের শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

তাঁর জীবনের আরেকটি উজ্জ্বল দিক হচ্ছে তিনি ছিলেন উঁচুমাপের আলেমে দীন, রূহানী রাহবার, মুবাল্লিগে ইসলাম, খৃস্টান মিশনারী ও কাদিয়ানী মতবাদের বিরুদ্ধে এক আপসহীন সিপাহসালার। হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গাঞ্জেমুরাদাবাদী রহ. এর একজন খলীফা হিসেবে তিনি সারা জীবন পথহারা মানুষদের সিরাতুল মুস্তাকিমের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর জীবনসংগ্রাম, নিষ্ঠা ও লিল্লাহিয়াত বর্তমান ও অনাগত প্রজন্মের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। তিনি ছিলেন হযরত শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী এর বংশধর, ফলে তাঁর কথা-বার্তার আচার-আচরণ ও চিন্তা-চেতনায় সুফিয়ানা ও দরবেশী জীবনের প্রভাব লক্ষ্য করা যেত। ভারতসহ গোটা দুনিয়ায় তাঁর মুরিদের সংখ্যা চার লাখ। তিনি যে কত জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন উক্ত সংখ্যায় তার প্রমাণ মিলে।

সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আল হাসানী উর্দূ ভাষায় আল্লামা মুঙ্গেরী রহ. এর ৪২৪ পৃষ্ঠার জীবনী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং এর ভূমিকা লেখেন বিশ্ববিশ্রুত ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক মনীষী আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.।

দারুর রাশাদ—এর পরিচালক ও আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এর অন্যতম খলীফা জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান সাহেব দা. বা. এর তত্ত্বাবধানে ও দৈনিক নয়া দিগন্তের সহ সম্পাদক মাওলানা লিয়াকত আলী

সাহেব দা. বা. এর সম্পাদনায় উক্ত গ্রন্থের বাংলা ভাষ্য বের করার উদ্যোগকে আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।

বাংলা পাণ্ডুলিপি আমি দেখেছি। মাশাআল্লাহ ভাষা সুন্দর, ঝরঝরে ও যুৎসই। বাংলাভাষায় রচিত জীবনী সাহিত্যের ভাণ্ডারে এ গ্রন্থটি হবে মূল্যবান সংযোজন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশী পাঠকবৃন্দ এমন এক মনীষীর সন্ধান পাবেন যিনি পুরো জীবনটাই ইসলামের খিদমতে উৎসর্গ করেন। আমি গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠক প্রিয়তা কামনা করি আল্লাহ তাআলার দরবারে।

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
ওমরগণি এম. ই. এস কলেজ চট্টগ্রাম

শাইখুল ইসলাম শাহ আহমদ শফী দা. বা.-এর বিশিষ্ট খলিফা
সাপ্তাহিক জমিয়ত –এর সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ইসলামাবাদী দা. বা.-এর

মূল্যবান অভিমত ও দুআ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. ছিলেন উপমহাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। শিক্ষা সংস্কারক এবং ওলীয়ে কামেল। ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানসহ গোটা উপমহাদেশে তাঁর দীনী খেদমত অতিপরিচিত। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তিনি যে সংস্কার ও অবদান রেখে গিয়েছেন তা যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক মিশন এখনও জারী এবং চালু আছে। বাংলাদেশে তাঁর আধ্যাত্মিক খলীফা ছিলেন চট্টগ্রাম পাচলাইশ ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ওয়াজেদ আলী খান রহ.। খান সাহেবের পুত্র ও খলীফা হযরত মাওলানা আতিকুল্লাহ খান রহ. দীর্ঘকাল পর্যন্ত পাচলাইশ ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদরাসায় প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পিতা পুত্র উভয়ই আধ্যাত্মিক সিলসিলা ও মাদরাসা শিক্ষা সম্প্রসারণে শতাব্দি ব্যাপী যে অবদান রেখে গেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ লেখার জন্য হাজার পৃষ্ঠার গ্রন্থও যথেষ্ট নয়। ১৯০০ সনের দিকে ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদরাসা স্থাপিত হয়। এ মাদরাসার বহু শাখা-প্রশাখা স্থাপিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রদের খেদমতও রয়েছে উল্লেখযোগ্য।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ.-এর পীর ভাই ছিলেন শায়খুলকুল হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ বাঙ্গালী রহ.। তিনি ছিলেন দেশ বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. ও হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল ওয়াহেদ বাঙ্গালী রহ. উভয়ে শায়খুল আরব ওয়াল আজম হযরত হাফেজ মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. ও কুতুবে জামান হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা। হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী রহ. মুহাদ্দিসকুল শিরমণি হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.-এর সরাসরি শাগরিদ।

হযরত শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী রহ. ইমামুল হিন্দ যুগের মুজাদ্দিদ হযরত মাওলানা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.-এর সাহেবজাদা ও জানেশীন। ভারতের মুঙ্গিরে খানকাহে রহমানিয়ার প্রদীপ এখনও জ্বলছে। হাজারো লাখো মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ.-এর পীর ভাই হযরত মাওলানা আব্দুল হাই হাসানী নদভী রহ.-এর সন্তান এবং দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা-এর কৃতিছাত্র ও সাবেক নাজেমে আলা হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা, মাদরাসা দারুর রাশাদের মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান কাসেমী তিনি মাওলানা আলী মিয়াঁর নির্দেশনায় মুহাম্মাদ আল হাসানী রহ. প্রণীত 'সাওয়ানেহে মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ.' বাংলাভাষায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। এ জন্য তাঁকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। হযরত মাওলানা সালমান সাহেবকে আল্লাহপাক দীর্ঘজীবী করুন এবং তার ফয়েজ ও বরকাত ব্যাপকতর করে দিন।

মুহাম্মদ আবদুর রহীম ইসলামাবাদী
মুহতামিম, পূর্ব সুয়াবিল তালিমুল ইসলাম বালিকা মাদরাসা
থানা : ভুজপুর, পো : বৈদ্যারহাট, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

সূচিপত্র

উৎসর্গ/০৩
প্রকাশকের কথা/০৫
ভূমিকা : আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ./০৬
হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ রাবে হাসান নদভী দা. বা.-এর দুআ ও ইজাযত/১৪
ব্যবস্থাপকের (মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান)-এর কথা/১৬
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান দা. বা.-এর মূল্যবান মূল্যবান বাণী ও দুআ/১৮
মাওলানা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন দা. বা.-এর মূল্যবান অভিমত ও দুআ/১৯
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ইসলামাবাদী দা. বা.-এর মূল্যবান অভিমত ও দুআ/২১

প্রথম অধ্যায়

বংশ, প্রাথমিক অবস্থা, শিক্ষা ও শিক্ষকতা এবং গবেষণায় ঝোঁক
বংশধারা/৩৮
শৈশব ও প্রাথমিক জীবন/৩৯
আহলে হক্কের অনুসন্ধান ও মদীনা যিয়ারতের আগ্রহ/৪১
ফয়যে আম মাদরাসার প্রথম ছাত্র/৪২
শিক্ষার উৎসাহ ও মেধা/৪৩
সুষ্ঠু চিন্তা ও সত্যের অন্বেষণ/৪৪
দর্শনের প্রতি অনাগ্রহ, হাদীসের প্রতি আগ্রহ/৪৪
আহলে হকের সন্ধানে/৪৬
মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ.-এর খেদমতে/৪৬
গঞ্জেমুরাদাবাদে প্রথম উপস্থিতি ও বাইয়াত/৪৯
তাকমীলে হাদীস/৫০
অন্তরের অমুখাপেক্ষিতা/৫১
ইজাযত ও খেলাফত/৫২
শিক্ষকতার খেদমত/৫২
আঞ্জুমানে তাহযীব প্রতিষ্ঠা/৫৪
ইলমী যওক ও তাহকীকের জযবা/৫৪
ফিকাহশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ/৫৫
মাওলানার কুতুবখানা/৫৬

দ্বিতীয় অধ্যায়
খৃস্টবাদ প্রতিরোধ

হিন্দুস্তানে খৃস্টান মিশনারি কার্যক্রমের সূচনা/৫৭
খৃস্টানদের কর্মপদ্ধতি/৫৮
মুনশি সফদর আলী ও এমাদুদ্দীন/৬০
খৃস্টবাদ প্রতিরোধে মাওলানার সংগ্রামের সূচনা/৬১
মনশুরে মুহাম্মদী/৬১
কানপুরে ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠা/৬৩
কুরআনে কারীমের ওপর খৃস্টানদের একটি প্রশ্নের জবাব/৬৩
খৃস্টবাদ প্রতিরোধে মাওলানার লিখনি/৬৭
খৃস্টবাদের ইতিহাস অধ্যয়ন/৬৭
আয়নায়ে ইসলাম/৬৮
মাওলানার লিখনপদ্ধতি/৬৯
তারানায়ে হেজাজী ও দফয়ে তালবিসাত/৭০
পয়গামে মুহাম্মদী/৭১

তৃতীয় অধ্যায়
নদওয়াতুল উলামা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

সমকালীন পরিবেশ/৭৪
পুরনো ধাঁচের আরবি মাদরাসাসমূহ/৭৪
স্যার সাইয়িদ আহমদের চিন্তাদর্শন/৭৬
সাইয়িদ আমীর আলী ও মৌলভী চেরাগ আলী/৭৭
আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ও খানকাসমূহ/৮০
শিক্ষা-ব্যবস্থা ও মাদরাসার সাধারণ পর্যালোচনা/৮১
কুফরীর ফিতনা ও পারস্পরিক সঙ্ঘাত/৮৬
মুকাল্লিদ ও গায়রে মুকাল্লিদদের সঙ্ঘাত/৯০
ফৌজদারী ও মামলাবাজী/৯৫

কদীম ও জাদীদের সমস্যা/৯৭
একজন নতুন ও সমন্বিত গুণের অধিকারী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা/৯৮
মাওলানার ব্যক্তিত্বের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান/৯৯
প্রথম উপাদান/১০০
দ্বিতীয় উপাদান/১০১
তৃতীয় উপাদান/১০২

চতুর্থ অধ্যায়

নদওয়াতুল উলামা প্রতিষ্ঠা এবং মাওলানার পরিচালনা ও উন্নয়নকাল

প্রথম মৌলিক সম্মেলন/১০৬
নদওয়াতুল উলামার পরিচিতির জন্যে প্রথম প্রতিনিধি দল/১০৮
প্রথম উদ্দেশ্য/১০৯
দ্বিতীয় উদ্দেশ্য/১০৯
উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে অভিনন্দন/১০৯
মাওলানা শিবলী রহ.-এর সাথে সাক্ষাত ও নদওয়ার পরিচয় জ্ঞাপন/১০৯
হাজী ইমদাদুল্লাহ রহ.-এর সমর্থন/১১০
মাওলানার লিখনীতে নদওয়াতুল উলামার উদ্দেশ্য/১১০
নদওয়াতুল উলামার প্রথম সাধারণ সভা/১১৩
প্রথম বৈঠক/১১৪
দ্বিতীয় বৈঠক/১১৪
মাওলানা হালীর পাঠানো বয়ান/১১৬
মাওলানা মুহাম্মদ আলী রহ.-এর সুচিন্তিত ও কার্যকরী দিক-নির্দেশনা/১১৬
নদওয়াতুল উলামাকে পরিচিত করার প্রচেষ্টা/১১৭
নদওয়ার লাখনৌ সম্মেলন/১১৮
দারুল ইফতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মাওলানার প্রস্তাব/১২০
নদওয়াতুল উলামার প্রথম ফসল/১২২
আধুনিক শ্রেণির পক্ষ থেকে নদওয়ার প্রথম সমর্থন লাভ/১২৩
লাহোর আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের সমর্থন/১২৪
মিসর ও সিরিয়ায় নদওয়াতুল উলামা আন্দোলনের পরিচিতি/১২৪
নদওয়ার সমালোচনাকারীদের প্রতি মাওলানার জবাব/১২৪

দারুল ইফতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মাওলানার বয়ান/১২৫
ফেকাহশাস্ত্রে গবেষণা ও প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা/১২৬
দারুল উলূমের প্রস্তাব ও মাওলানা রহ.-এর রূপরেখা/১২৬
দীনী ইলম, ফেকাহ ও কালাম শাস্ত্রে পূর্ণ যোগ্যতা/১২৭
বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগতি/১২৭
একটি ইসলামী পোশাক/১২৮
ঘোড় সওয়ারী ও তীরন্দাযি/১২৯
চরিত্র সংশোধন ও আত্মশুদ্ধি/১২৯
আরবি ভাষার চর্চা/১২৯
রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিষয়গুলোর ওপর বয়ান/১৩০
উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক পত্রসমূহ/১৩০
মাওলানা থানভী রহ.-এর অভিমত/১৩১
নদওয়াতুল উলামার প্রথম প্রস্তাবিত নেসাবে তালিম/১৩১
ইতিহাস শাস্ত্রের গুরুত্ব/১৩২
বিধি-বিধানের তাৎপর্য/১৩২
নেসাবের ওপর একটি নজর/১৩২
মাওলানার অক্ষমতা/১৩৩
দ্বিতীয় সমস্যা/১৩৪
বিপ্লবী নেসাব/১৩৬
ইস্তফা দেয়ার চেষ্টা/১৩৬
শিয়াদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকরণ/১৩৭
নদওয়ার পরিচিতির জন্য উলামা প্রতিনিধি দল/১৩৭
মাওলানার নেতৃত্বে নদওয়ার প্রতিনিধি প্রেরণ ও উল্লেখযোগ্য সফলতা/১৩৭
একটি পুরনো বিবাদের সমাপ্তি/১৩৮
কাজের গতি/১৩৯
হায়দারাবাদের পক্ষ থেকে ভাতা ধার্যকরণ ও মাওলানার অমুখাপেক্ষিতা/১৩৯
বেরেলীর সম্মেলন/১৩৯
দারুল উলূমের খসড়া পরিকল্পনার অনুমোদন/১৪০
মাওলানার বয়ান/১৪০
বিশেষ সভা/১৪২
বক্তা নিযুক্তকরণ/১৪২

বিরোধিতার ঝড়/১৪২
প্রশ্নের ভিত্তি/১৪৪
বিরোধীদের অপকৌশল অবলম্বন/১৪৫
পুস্তিকা প্রচারের অপকৌশল/১৪৫
মাওলানার কর্মকৌশল/১৪৬
নদওয়াতুল উলামা মুসলমানদের জন্য অদৃশ্যের দান
হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ.-এর অভিমত/১৪৭
মাওলানার দিল্লি সফর এবং 'মুঈনুন্ নদওয়া' সংস্থা প্রতিষ্ঠা/১৪৮
মাওলানার গাজীপুর সফর এবং নদওয়াতুল উলামার শাখা প্রতিষ্ঠা/১৪৮
পরোপকারের ঈর্ষণীয় দৃষ্টান্ত/১৪৯
পুরনো ও নতুনের প্রথম প্রতিনিধিত্বশীল সম্মেলন/১৫০
অন্যান্য দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য ছাত্রদের ভাতা/১৫১
মিরাঠ সম্মেলন/১৫২
উলামায়ে কেরামের বৈঠক/১৫২
বসার পদ্ধতি সম্পর্কে মাওলানা রহ.-এর গুরুত্বপূর্ণ মতামত/১৫২
দুর্ভিক্ষের প্রভাব ও নদওয়ার সমস্যাসমূহ/১৫৩
কানপুরের বিশেষ সম্মেলন/১৫৪
দারুল ইফতার কার্যক্রম/১৫৪
কানপুরের ইয়াতিম খানা/১৫৫
এক হাজার নিয়মতান্ত্রিক সদস্য/১৫৫
দারুল উলূমের জন্য লাখনৌর প্রস্তাব/১৫৫
মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ.-এর অভিমত/১৫৫
প্রাথমিক শ্রেণীগুলোর অনুমোদন/১৫৬
মাওলানার প্রতিনিধি প্রেরণের প্রস্তাব/১৫৬
বাস্তব উদ্দীপনা ও কাজের গতিময়তা/১৫৬
ইংরেজি শিক্ষিত ছাত্র ও দারুল উলূম/১৫৭
ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে মাওলানা রহ.-এর সময়োপযোগী ঘোষণা/১৫৭
আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা/১৫৮
ভাষাই মুখ্য নয়, আল্লাহ-রাসূলের ভালোবাসাই মূল/১৬০
আরবি ও ইংরেজি ভাষাদ্বয় একযোগে অর্জনের পন্থা/১৬১
দারুল উলূমের জমি সন্ধান/১৬২

লাখনৌতে নদওয়ার অফিস স্থানান্তর/১৬২
জনৈকা বৃদ্ধা মোটা অংকের অনুদান/১৬২
প্রাথমিক স্তরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান/১৬৩
শিক্ষকমণ্ডলী/১৬৪
ছাত্রদের নিয়মানুবর্তিতা/১৬৫
সমালোচকদের আচরণ/১৬৫
আরো শাখা প্রতিষ্ঠা/১৬৫
মাওলানা শিবলীর রহ. সাথে মতানৈক্য/১৬৬
মাওলানা শিবলী রহ.-এর ইলমী ব্যস্ততা ও অসুস্থতা/১৬৭
বার্ষিক মাহফিলে অংশগ্রহণের জন্য দাওয়াত/১৬৮
মতানৈক্যের কারণ/১৬৮
শাহজাহানপুরের মাহফিল/১৬৯
চাঁদা আদায়ে বিপুল আগ্রহ উদ্দীপনা/১৭২
অপূর্ব দৃশ্য/১৭২
সাধারণ মাহফিল/১৭৩
বিশেষ অধিবেশন/১৭৩
মাদরাসার প্রস্তাব/১৭৩
টাকার বর্ষণ/১৭৫
শ্রমিকদের আত্মার মিলন ও ত্যাগ/১৭৫
এক বক্তার অবস্থার পরিবর্তন/১৭৬
শহরে মাহফিলের আবেদন ও উৎসাহ-উদ্দীপনা/১৭৬
নারীদের উদারতা/১৭৬
বেরেলীর উদ্দেশ্যে নদওয়ার প্রতিনিধি দল/১৭৬
এক মহাজনের আবেগপূর্ণ দান/১৭৭
মাওলান আব্দুল হাই রহ.-এর অকৃত্রিম খিদমতের স্বীকৃতি/১৭৭
নতুন মুহতামিম/১৭৮
মাওলানা শেরওয়ানীর রিপোর্ট/১৭৮
ইংরেজি ভাষা পাঠ্য তালিকাভুক্তকরণ/১৭৯
দারুল ইফতার কার্যক্রম বন্ধ/১৭৯
সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয় আযীমাবাদ-পাটনায়/১৮০
মাহফিলের বাণী চিত্র/১৮০

প্রথম মজলিস/১৮২
ছাত্রদের পরীক্ষা/১৮৩
দ্বিতীয় মজলিস/১৮৪
এক তরুণ ব্যারিস্টারের বক্তৃতা/১৮৮
আধুনিক শিক্ষিতদের শ্রদ্ধানিবেদন/১৯২
হাজী এমদাদুল্লাহ রহ.-এর ওফাতে শোক প্রকাশ/১৯৩
দারুল উলূম সম্পর্কে মাওলানা রহ.– একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি/১৯৪
ইলমের সঙ্গে দীনদারী ও সচ্চরিত্রের আবশ্যকতা/১৯৬
শারীরিক সুস্থতা এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ/১৯৭
জীবনের পাঁচটি উপাদান/১৯৭
উর্দু সাহিত্য/১৯৭
ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তাধারা এবং যথাযোগ্য মূল্যায়ন/১৯৮
কুরআনের ইলম ও আরবি সাহিত্য/১৯৯
কুরআন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য বিশেষ পুরস্কার/২০০
মাওলানার প্রথম হজ্বের সফর/২০১
পাথেয় শুধুই তাওয়াক্কুল/২০২
ইশকে ইলাহিতে আত্মহারা/২০৩
চট্টগ্রামে ব্যাপক সাড়া পড়ে গেল/২০৩
নদওয়ার স্মৃতিচারণ/২০৫
ইস্তাম্বুলের একটি চিঠি/২০৭
সুলতানের প্রতিনিধির ভক্তি ও শ্রদ্ধা/২০৭
মক্কার আমিরের চিঠি ও সাহায্যের আবেদন/২০৯
মাওলানা শিবলীর ব্যাপারে 'লর্ড মেকডোনাল' এর কু-ধারণা/২০৯
শাবান ১৩১৯ হিজরী মোতাবেক ডিসেম্বর ১৯০১ কলকাতায় ৬ষ্ঠ জলসা/২১১
বিরোধীদের সাথে মাওলানার আচরণ/২১২
মাওলানার প্রত্যাবর্তন, অসুস্থতা ও কলকাতায় উপস্থিতি/২১৩
ছাত্রদের পরীক্ষা/২১৩
পুরস্কার বিতরণী/২১৪
লাখনৌতে প্লেগ এবং দারুল উলূম স্থানান্তর/২১৪
নতুন স্তরের উদ্বোধন/২১৫
ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা/২১৫

সরকারের আচরণে পরিবর্তনের প্রভাব/২১৫
শাহজাহানপুরে নদওয়ার অফিস/২১৬
অমৃতসর-এর মাহফিল ও মাওলানা শিবলীর আগমন/২১৬
শিক্ষা কমিশনে মাওলানা শিবলীকে মনোনয়ন/২১৬
মাদরাজের বৈঠক ও সমঝোতার শেষ প্রচেষ্টা/২১৭
মাওলানা মুহাম্মাদ আলীর মাদরাজ সফর/২১৭
জনাব হাসান নিজামীর আকর্ষণীয় বয়ান/২১৯
মাওলানার অব্যাহতির স্বীকৃতি/২১৯
মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ও মাওলানা শিবলী রহ./২২০
সমস্যার বিস্তারিত বিবরণ/২২০
কুধারণা/২২২
বিরোধের মূল কারণ/২২৩
১. মেজাজের ভিন্নতা/২২৪
২. শিক্ষা-দীক্ষায় ভিন্নতার রূপ/২২৫
অব্যাহতি চাওয়ার মূল কারণ/২২৮
ইস্তফা দেওয়ার দ্বিতীয় কারণ/২৩১
অবশেষে ইস্তফা গৃহীত/২৩১
বাস্তব সত্য/২৩২

পঞ্চম অধ্যায়

কাদিয়ানীদের মোকাবেলা

এক প্রতিদ্বন্দ্বী নবুয়াত ও প্রতিদ্বন্দ্বী উম্মত/২৩৪
মুসলমানদের আত্মমর্যাদাবোধ এবং আমানতের পরীক্ষা/২৩৪
কাদিয়ানীদের দাওয়াত ও প্রচারণা/২৩৫
বিহারে সর্বগ্রাসী থাবা/২৩৫
একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক বিতর্ক/২৩৭
কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী কার্যক্রম/২৩৮
খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি বিমুখতা/২৩৯
তাহাজ্জুদের সময় লেখালেখি/২৪১
পত্রাবলী/২৪২
ফায়সালায়ে আসমানী/২৪৪

শাহাদাতে আসমানী/২৪৯
এক নজরে মাওলানার অন্যান্য রচনা/২৫১
নিযামে হায়দারাবাদে শিক্ষা কর্মকর্তার নামে পত্র/২৫৪
মাওলানার রচনাবলীর প্রতিক্রিয়া/২৫৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

হেদায়াত ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও তার গুরুত্ব/২৫৮
মুঙ্গেরে অবস্থান/২৫৯
মুঙ্গেরের পথে প্রথম সফর/২৬১
মুরশিদের সাথে তায়াল্লুক/২৬২
এক হাতে দীনের পেয়ালা আরেক হাতে প্রেম-শরাব/২৬২
সুউচ্চ মর্যাদা ও অমুখাপেক্ষিতা/২৬৩
আমীর উমারাদের দাওয়াত পরিহার/২৬৫
আলী মুঙ্গেরী সম্পর্কে মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদীর কিছু মূল্যবান উক্তি/২৬৫
প্রচলিত বয়ান-বক্তৃতার প্রতি অনীহা/২৬৭
মানুষের ঢল/২৬৮
সবচেয়ে বড় কারামত/২৭০
ইনকিলাব ও পরিবর্তন/২৭০
মুরিদানের ভক্তি ও ভালোবাসা/২৭৪
মাওলানার দ্বিতীয় হজ্বের সফর/২৭৭
চীনের এক বিশিষ্ট আলেমের বাইয়াত ও ইরাদা/২৭৯
দুনিয়াবিমুখতা ও রাজকীয়তা/২৮০
চার লাখ মুরিদ/২৮১
তারবিয়ত ও তারবিয়াতের উসূল/২৮২
তলব (অন্বেষা) ও লালসা/২৮৫
শরীয়তের বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে স্তরবিন্যাস/২৮৬

সামাজিক সম্পর্ক/২৮৭
হযরতের পত্রাবলি/২৮৮
ওয়াহদতে ওজুদ সম্বন্ধে হযরতের একটি পত্র/২৯০
সত্তা ও গুণাবলী দর্শনই হচ্ছে মূল বিষয়, কাশফ ও কারামাত কাম্য নয়/২৯২
নূর ও কাশফের দৃষ্টান্ত/২৯৪
যিকিরের প্রভাবহীনতা ও মন্দ চিন্তা উদয়ের একটি বড় কারণ/২৯৫
অকৃতজ্ঞতার কারণে যে নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয় তা পুনরায় পাওয়া যায় না/২৯৬
যিকিরের স্বাদ থেকে পৃথিবীতে আর কোন বড় স্বাদ নেই/২৯৭
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব/২৯৮
স্বাদ ও কায়ফিয়াত নয়; বরং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য/২৯৮
অযীফার পরিমাণ নয় গুণগত মানই বিবেচ্য/৩০০
দুনিয়া বর্জন নয় বরং দুনিয়া সংশোধন/৩০১
'হিজাব' ও এনায়েত/৩০১
ইরশাদে রহমানী/৩০২
অভিরুচি ও কায়ফিয়াত/৩০৫
ইশকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম/৩০৬
কুদরতী সেমা!/৩০৭
নামাজের প্রতি ইশক/৩০৮
রুচি ও সুপরিচ্ছদ/৩০৮

সপ্তম অধ্যায়

জীবনের শেষ দিনগুলো, মৃত্যু এবং খলিফাবৃন্দ

নদওয়ার স্মরণ/৩১০
শেষ দিনগুলো/৩১১
শেষ সময়/৩১৩
ইন্তেকাল/৩১৪
সন্তানাদি/৩১৫
মুরিদ এবং খলীফাবৃন্দ/৩১৭

সীরাতে সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ.

[প্রতিষ্ঠাতা : নদওয়াতুল উলামা, লাখনৌ, ভারত]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রথম অধ্যায়

বংশ, প্রাথমিক অবস্থা, শিক্ষা ও শিক্ষকতা এবং গবেষণায় ঝোঁক

মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ. নদওয়াতুল উলামার মতো যুগশ্রেষ্ঠ ও উদ্ভাবনী আন্দোলন, তাছাড়া সুলূক ও ইরশাদ, তাযকিয়া ও তরবিয়াত, কাদিয়ানি মতবাদ ও খৃস্টবাদ উৎখাত এবং নিজের বিভিন্ন দীনী ও দাওয়াতী খেদমতের মাধ্যমে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অর্জন করেছেন তা কোনো বিশেষ পারিবারিক সম্পর্ক ও ইতিহাসের অনুগ্রহ নয়। কিন্তু তার এই উন্নত মর্যাদায় তার উচ্চ বংশপরিচয় আরো সংযোজন ঘটিয়েছে। তিনি সব যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি নবী পরিবারের সদস্য। তার বংশ পরম্পরা শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রহ. পর্যন্ত পৌঁছে। তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে হযরত শাহ বাহাউল হক মাখদুম হাবীবুল্লাহ মুলতানী ও তার বিশিষ্ট পুত্র হযরত শাহ আবু বকর চরমপোশের মতো বড় মাপের ওলী এবং রুশদ ও হেদায়েতের আকাশের উজ্জ্বল তারকা দৃষ্টিগোচর হয়।

হযরত শাহ আবু বকর চরমপোশ এখন থেকে তিনশ বছর আগে তার বংশের আবাসভূমি মুলতান থেকে মুযাফফার নগর জেলায় আগমন করেন এবং খাতুলি গ্রামের পাশে অবস্থান নেন। যেখানে তার খানকাহ ছিল, সেটি এখনো শেখপুরা নামে প্রসিদ্ধ। স্থানটি তখন সম্পূর্ণ জনবসতিশূন্য ও অনাবাদ ছিল। কিন্তু তার অবস্থানের পর তা একটি জনবহুল ও উন্নত পল্লীতে পরিণত হয়। এলাকাটি বারেহা নামে পরিচিত ছিল এবং এখানকার সাইয়িদ বাসিন্দাদের বারেহার সাইয়িদ বলা হতো। কয়েক পুরুষ পর্যন্ত বারেহার সাইয়িদ বংশের সাথে কারো আত্মীয়তা হয়নি। কিন্তু শেষে তাদের সাথে আত্মীয়তা স্থাপনের ধারা শুরু হয়। (কামালাতে মুহাম্মাদীয়া, পৃ.- ৩)

টীকা

- সাইয়িদ বাহাউল হক মুলতানী ছিলেন হিজরী দশম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আওলিয়ায়ে কেরামের একজন। তিনি ছিলেন ওই অঞ্চলের লোকদের মধ্যমণি। তাঁর ফয়েজ ও বরকতের পরিধি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
- শাহ আবু বকর চরমপোশের মাজার খাতুলি স্টেশনের রেল লাইন থেকে কয়েক গজ দূরে এখনো বিদ্যমান এবং সব শ্রেণীর মানুষের যিয়ারতে মুখর।

হযরত শাহ আবু বকর চরমপোশ রহ. একবার বলেছিলেন– 'আমার বংশধারা কখনও বেলায়েত থেকে শূন্য থাকবে না।' ইতিহাস সাক্ষী এই সোনালী ধারা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী পর্যন্ত অব্যহত ছিল।

শাহ আবু বকর চরমপোশের সন্তানদের মধ্যে এক বুযুর্গ ছিলেন শাহ্ শরফ। তার গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন– শাহ্ শরফ ছিলেন অসাধারণ প্রভাব, অনুপম কারামাত ও উন্নত মাকামের অধিকারী।

শাহ শরফেরও দুই ছেলে ছিল। শাহ্ সানওয়ালে ও শাহ্ এনায়েত। টীকায় উল্লিখিত পুস্তিকায় শাহ এনায়েতের কথা বর্ণিত আছে। এ থেকে বারেহার সাইয়েদের সাথে তার গভীর সম্পর্কের কথা জানা যায়। তাছাড়া তার দুনিয়া বিমুখতা ও আত্মভোলা চরিত্রের বর্ণনা করা হয়েছে।

বারেহা সাইয়েদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ তার মহান দরবারে মাথা নত করতেন ও তার ভক্তদের কাতারে শামিল হতেন। ইলম পিপাসুরাও তার দ্বারা উপকৃত হতেন। তিনি পার্থিব সম্পদ ও ধনীদের প্রতি একেবারেই অমুখাপেক্ষী ছিলেন। এক ব্যক্তির এক জটিল সমস্যা সমাধান হলে তার জন্য বিরাট অংকের অর্থ নজরানা পেশ করেন। কিন্তু তিনি অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তা কবুল করলেন না। লোকটিও ছিল নাছোড়াবান্দা। শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে জনসাধারণের উপকারার্থে একটি পুকুর খননের পরামর্শ দেন।

টীকা

- মুযাফফার নগর ও মীরাঠের মাঝখানে একটি স্টেশনের নাম খাতুলি। তখনো তা ছিল একটি পল্লী এবং সমকালীন বাদশাহের পক্ষ থেকে সেখানে কাজী নিযুক্ত ছিলেন।
- হযরত জায়দ শহীদ রহ. এর বংশধরের বারেহা সাইয়িদরা কয়েকশ বছর আগে মনসুরপুর ও আশপাশ এলাকায় বাস করতেন। বরং বলা উচিত সেখানে তাদের বসতি স্থাপন করা হয়। শাসক শ্রেণীর ওপর তাদের বিশেষ প্রভাব ও কর্তৃত্ব ছিল এবং তারা সামান্য ও খুঁটিনাটি ব্যাপারে সমকালীন শাসককে অপসারণ করে অন্যকে শাসনভার ন্যস্ত করতেন। এ জন্যই ইতিহাসে তাদেরকে কিংমেকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বারেহা বলার কারণ বর্ণনা করা হয় এই যে, তাদের ছিল বারোটি শাখা। তাদের মধ্যে এগারটি শিয়া ও একটি সুন্নী ছিল। বাদশাহ্ তাদেরকে বারোটি পৃথক পৃথক গ্রামে স্থায়ী করেন, যেন এভাবে তাদের শক্তি ভাগ হয়ে যায় এবং তারা শাসকশ্রেণীর জন্য অশান্তি ও মাথা ব্যথার কারণ না হয়। তাদেরই একটি শাখা খাতুলিতে বাস করত। মনসুরপুর, খানজাহানপুর ও থেড়ির শিয়া বংশগুলো হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবি রহ.-এর হাতে তওবা করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতে শামিল হয়ে যায়।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরীর জীবনী প্রসঙ্গে মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ রহমানী এক প্রবন্ধে লিখেছেন- পুরনো কাগজপত্রের মাঝে আমি একটি ছাপা পুস্তিকার আটটি পৃষ্ঠা পাই। সেটি পাঠ করে জানা গেল পুস্তিকাটি এখন থেকে ৪৬ বছর আগে ছাপা হয়েছিল। তাতে হযরত মাখদুম বাহাউল হক মুলতানী থেকে শুরু করে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত তার বংশের লোকদের আলোচনা রয়েছে। এতে তার নর ও নারী সন্তানদের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। তারপর যার যেখানে বিয়ে হয়েছে তার বর্ণনা রয়েছে। বংশের মধ্যে কে কখন রাজকীয় জায়গীর ও সম্পত্তি পেয়েছেন তারও উল্লেখ রয়েছে। দুঃখের বিষয় পূর্ণাঙ্গ পুস্তিকাখানা আমার কাছে নেই। মাত্র আট পৃষ্ঠা আমার সামনে রয়েছে। আমার ধারণা, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরীর তত্ত্বাবধানে পুস্তিকাখানা ছাপা হয়। যাই হোক ঘটনাক্রমে ওই পৃষ্ঠাগুলোতে হযরত শাহ শরফের ওপর আলোচনা রয়েছে। তার পরের পৃষ্ঠাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে।

এই বংশের আরেক বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন সাইয়িদ শাহ আলী। তার বুযুর্গির কথা সমকালীন সম্রাটও স্বীকার করতেন। ওই পুস্তিকায় তার সম্পর্কে বলা হয়েছে- সম্রাট ফররুখশিয়ার মুহিউদ্দীনপুরে গাছ-গাছালিপূর্ণ ও চাষযোগ্য ৪৬ বিঘা জমি তার নামে জায়গির দেন।

মুহিউদ্দীনপুর ছিল শেখপুরা থেকে মাত্র সোয়া মাইল দূরের একটি গ্রাম। এ ঘটনার পর বংশের বেশিরভাগ লোক ওই গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। তবে তাদের মুহিউদ্দীনপুরে স্থানান্তরিত হওয়ার আরেক কারণ ছিল। তা হলো- শেখপুরার সম্পত্তি ও জায়গা-জমি বংশের শিয়া শাখার দখলে চলে যায়। ফলে সুন্নী শাখাটির পক্ষে শেখপুরাকে বিদায় জানিয়ে মুহিউদ্দীনপুরে চলে যাওয়া ছাড়া বিকল্প ছিল না। মাওলানা মুহাম্মাদ আলীর অষ্টম ঊর্ধ্বতন পুরুষ সাইয়িদ শাহ হাজী ছিলেন নিজ যুগের অন্যতম বুযুর্গ। সম্রাট মুহাম্মাদ শাহ তাঁর ভক্ত ছিলেন এবং তিনি তাকে কিছু জায়গিরও দান করেছিলেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরীর বংশের দ্বিতীয় শাখায় শাহ গোলাম মুস্তাফা নামে এক বুযুর্গ ছিলেন। তিনি ছিলেন শাহ মুহাম্মাদ নাসীরের পৌত্র। আর শাহ মুহাম্মাদ নাসীর ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরীর সপ্তম ঊর্ধ্বতন পুরুষ শাহ মুহাম্মাদ আশেকের পুত্র। শেখপুরায় তার যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল এবং একটি সুন্দর বাড়ি ছিল। কিন্তু তিনি সবকিছু ফেলে কানপুরে চলে আসেন। তখন কানপুর ছিল একটি সাধারণ জায়গা। এখানে একটি সেনাশিবির ছিল। এর্জন্য লোকেরা এটিকে ক্যাম্পু বলত। কামালখান মহল্লার যেখান বর্তমানে লারী মসজিদ অবস্থিত ওই জায়গাটি তিনি পছন্দ করলেন এবং সেখানে অবস্থান নেন।

উল্লেখ্য, উক্ত লারী মসজিদে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী অনেকদিন দরস দিয়েছেন।

যাই হোক, আশপাশের দরিদ্র লোকেরা যখন দেখলো যে, একজন বুযুর্গ ব্যক্তি এখানে এসেছেন, তখন তারা এটিকে আল্লাহ তাআলার বিশেষ দান মনে করলো এবং তার জন্য একটি ছোট বাড়ি তৈরি করে দিল। তিনি ঘরের কাছে একটি কাঁচা মসজিদ নির্মাণ করলেন। ওই মহল্লায় সেটাই ছিল প্রথম মসজিদ। দীন মুহাম্মাদ তব্বাখ নামে এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রী দুলারী সেনাবাহিনীর রুটি সরবরাহ করতেন। তিনি পরে মসজিদটি পাকা করেন। মসজিদটিতে ১২১৯ হিজরী খোদাই করা রয়েছে। এখন সেটি দুলারী মসজিদ নামে পরিচিত। মাকামাতে মুহাম্মাদিয়ার লেখক এ ঘটনা উল্লেখ করে লিখেছেন– মসজিদে লাগানো পাথরে দীন মুহাম্মাদের নাম রয়েছে। তবে তা তার স্ত্রীর নামে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য মাকামাতে মুহাম্মাদিয়ায় মসজিদটির নির্মাণকাল ১২১২ হিজরী লেখা হয়েছে যা সঠিক নয়।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরীর সম্মানিত দাদা সাইয়িদ শাহ গাউস আলী নিজেই ছিলেন সাহেবে নিসবত বুযুর্গ। তার বেলায়েতের কথা স্বীকার করেছেন মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদীও। একশ বছরের বেশি আগে সাইয়িদ শাহ গাউছ আলী রহ. মুযাফফারনগর থেকে কানপুরে এসে বসবাস করতে থাকেন এবং শাহ গোলাম মুস্তাফার পর তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত হন।

বাল্যকালে সৈনিক জীবনের প্রতি তার ঝোঁক ছিল। তরুণ বয়সে তিনি এক জমিদার মহিলার সেনা বাহিনীতে চাকুরি নেন এবং ভালো পদে আসীন হন। দীনী ইলমসমূহ শিক্ষা আগেই সম্পন্ন করেছিলেন। শেষে শাহ গোলাম মুস্তফার আদেশে চাকুরি ছেড়ে তার সাহচর্য অবলম্বন করেন এবং তার স্থলাভিষিক্ত হন।

সাইয়িদ শাহ গাউস আলীর প্রকৃতিতে ছিল অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতা। তাছাড়া ছিল আত্মগোপনের মানসিকতা। সারা জীবনে তিনি কাউকে মুরিদ করেননি।

বংশধারা

তাঁর বংশধারা নিম্নরূপ। মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী ইবনে সাইয়িদ আবদুল আলী, ইবনে সাইয়িদ গাউস আলী ইবনে সাইয়িদ রাহাত আলী, ইবনে সাইয়িদ আমান আলী ইবনে শাহ নূর মুহাম্মাদ ইবনে শাহ মুহাম্মদ উমর ইবনে শাহ আশেক মুহাম্মাদ ইবনে হাজীয়ে হারামাইন মুহাম্মাদ শাহ ইবনে বন্দেগী শাহ আতিকুল্লাহ ইবনে শাহ কুতবুদ্দীন ইবনে হযরত মাখদুম আবু বকর চরমপোশ ইবনে শাহ বাহউল হক হাবীবুল্লাহ মুলতানী ইবনে হযরত সাইয়িদ হাসান ইবনে

হযরত সাইয়িদ ইউসুফ ইবনে হযরত সাইয়িদ হাসানুল হক ইবনে হযরত সাইয়িদ ইবরাহীম ইবনে হযরত সাইয়িদ রাজী হামেদ ইবনে সাইয়িদ মূসা আহমদ শিবলী ইবনে হযরত সাইয়িদ আলী ইবনে হযরত সাইয়িদ মুহাম্মাদ ইবনে সাইয়িদ হাসান ইবনে সাইয়িদ আবু সালেহ ইবনে হযরত সাইয়িদ আবদুর রাযযাক ইবনে হযরত শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী রহ.।

এই পুরো খান্দান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শরীয়ত ও তরিকতের সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর অবিচল থাকে এবং অচেনা পথগুলো এই বংশের আলোয় উদ্ভাসিত হতে থাকে। শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রহ. থেকে নিয়ে মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী পর্যন্ত এই সোনালী ধারায় বিচ্ছিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না। প্রত্যেক যুগ ও জামানায় বংশের কোন না কোন শাখায় এই বাতি সবসময় প্রজ্জ্বলিত ছিল। তাঁর পূর্বপুরুষরা বুখারায় ছিলেন। সেখান থেকে তারা মুলতানে আসেন। তারপর মুলতান থেকে তারা মুযাফফরনগর আসেন। তারপর সেখান থেকে শুধু উত্তরপ্রদেশ ও বিহার নয়, পুরো ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েন। এই বংশের ইতিহাসের শেষ ও সোনালী অধ্যায় মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী-এর জীবনী, যার বিস্তারিত বর্ণনা সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আসছে।

শৈশব ও প্রাথমিক জীবন

তিনি ৩ শাবান ১২৬২ হিজরী মোতাবেক ২৮ জুলাই ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে কানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার দুই বছর বয়সে পিতার ইন্তেকাল হয়। এজন্য শৈশবকাল দাদা শাহ্ গাউস আলীর সাথে অতিবাহিত হয়।

তিনি কুরআন মাজীদের পাঠ নেন চাচা সাইয়িদ জহুর আলীর কাছে এবং ফার্সীর প্রাথমিক কিতাবগুলো পড়েন সাইয়িদ আবদুল ওয়াহিদ বিলগিরামীর কাছে। কুরআন মজীদের হিফজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু প্রায়ই অসুস্থ্ থাকতেন বলে তা বন্ধ হয়ে যায়। পাঠ্য কিতাবগুলো সম্পন্ন করেন উস্তাযুল আসাতিযা মাওলানা লুৎফুল্লাহ্ আলীগড়ী ও মুফতি এনায়েত আহমদ কাকুরির কাছে। তবে বেশিরভাগ কিতাব তিনি মাওলানা লুৎফুল্লাহর কাছে পড়েন।

মাওলানা লুৎফুল্লাহ আলীগড়ী উস্তাযুল হিন্দ ও উস্তাযুল আসাতিযা হিসেবে প্রসিদ্ধ। তার পবিত্র সত্তার মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইলমের যে ঝর্ণাধারা জারি হয়েছে, তার নজির খুঁজে পাওয়া কঠিন। আলীগড়ে ১২৮৫ থেকে ১৩১২ হিজরী পর্যন্ত পুরো ২৭ বছর তার দরসের সুধা বিতরণ অব্যাহত ছিল। ওই যুগের এমন কোন নামকরা আলেম খুঁজে পাওয়া কঠিন যিনি তার ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেননি। তার গর্বিত ছাত্রদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী ছাড়াও

রয়েছেন মাওলানা আবদুল হক হাক্কানী, মাওলানা শিবলী নোমানী, মাওলানা জহুরুল ইসলাম ফতেহপুরী, মাওলানা নূর মুহাম্মাদ পাঞ্জাবী প্রমুখ। পাণ্ডিত্যের এমন গভীরতা ও প্রসিদ্ধি সত্ত্বেও তার স্বভাবে ছিল ভারসাম্য ও সামগ্রিকতা। তিনি কখনো কাউকে কাফের সাব্যস্ত করেননি। ১৩৩৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

মুফতি এনায়েত আহমদ কাকুরি ছিলেন ভারতবর্ষের অন্যতম সেরা আলেম। তিনি আলীগড়ে কাযী পদে নিযুক্ত হন এবং দরসদানের ধারাও জারী রাখেন। তারপর তাকে আকবরাবাদে 'সদরুস সুদূর' পদে নিয়োগ দিয়ে পাঠানো হয়। কিন্তু তার আগেই ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ শুরু হয় এবং এই বিদ্রোহে জড়িত থাকার দায়ে তাকে মাল্টা দ্বীপে নির্বাসনে দেয়া হয়। সেখানে থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন এক বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। ওই দ্বীপের প্রশাসক এমন কাউকে খুঁজছিলেন যিনি ভূগোলের জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ বালাজুরির তাকবীমুল বুলদান উর্দুতে অনুবাদ করতে পারেন। তাহলে তারপর সেটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা যাবে। মুফতি এনায়েত আহমদ কাকুরি এই কাজটি সম্পন্ন করেন এবং বিনিময়ে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। এরপর তিনি কানপুর চলে আসেন এবং মাতবায়ে নেজামীর মালিক আবদুর রহমান খানের আহ্বানে মাদরাসায়ে ফয়সে আম প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিন বছর দরস দানের পর হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ান হন। কিন্তু আল্লাহর কী মর্জি। জেদ্দার কাছেই ডুবো চরে ধাক্কা লেগে তার জাহাজটি ডুবে যায় এবং তিনি পানিতে ডুবে শাহাদাত বরণ করেন। এ ছিল ১২৭৯ হিজরীর ঘটনা।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরীর বয়স যখন দশ বা বারো বছর তখন তাঁর দাদা সাইয়্যিদ শাহ গাউস আলী ও চাচা সাইয়্যিদ জহুর আলী উভয়েই ইন্তেকাল করেন। ঘরে ছিল ৫/৬ সদস্য। এখন তাদের দায়িত্ব এসে পড়লো বালক মুহাম্মাদ আলীর ওপর। স্বাভাবিক নিয়মেই তিনি দুশ্চিন্তায় পড়েন এবং লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন। কিন্তু এক বিশেষ ঘটনায় সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায় এবং তিনি মনস্থির করে পড়াশোনায় নিমগ্ন হন। ঘটনাটি তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন– আমরা আরবি পড়াশোনা শুরু করলাম। সহপাঠীদের মধ্যে হাফেজ ইমাম আলী নামে একজন ছিলেন খুবই সজ্জন ও আমার ঘনিষ্ঠ। আমি তার সাথে আলাপ করতাম, অন্য ছাত্রদের সাথে তেমন কথাবার্তা বলতাম না। তখন আমার চিন্তায় এলো– দিনাতিপাত করার কোনো উপায় তো নেই। অথচ আমার দায়িত্বে পাঁচজন নারীর ভরণ পোষণ। চিন্তা প্রবল হতে লাগলো এবং লেখাপড়া কঠিন হয়ে গেল। হাফেজ সাহেবের

সাথে বিষয়টি আলোচনা করলাম। হাফেজ সাহেব আমাকে 'সিরাজুস সালেকীন' কিতাবখানা দিলেন এবং বললেন– রিযিকের অধ্যায়টি পড়ো। তাতে প্রথমে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রথমে করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা সবার রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং কসম খেয়ে নিশ্চয়তা দিয়েছেন। এরপর তাতে বলা হয়েছে– এখন একটু চিন্তা করে দেখো, একজন অতি সাধারণ ব্যক্তি যদি কখনো তোমাকে দাওয়াত দেয়, তাহলে তার কথায় তোমার এমন আস্থা হয়ে যায় যে, সেই বেলা খাবারের চিন্তা কিসের? ঘরে খাবার রান্না নিষেধ করা হয় এবং অন্য কারো দাওয়াতও কবুল করা হয় না। কারণ প্রথম দাওয়াতকারীর কথায় আস্থা রাখা হয়েছে। অন্তরে বিন্দুমাত্র অস্থিরতা থাকে না। আর এখানে আহকামুল হাকেমীন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা কসম খেয়ে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন। অথচ তার কথায় আস্থা রাখা হচ্ছে না এবং রিযিকের চিন্তায় এতই বিভোর হয়ে পড়ছ যে, রিযিকের মালিককে ভুলে যাচ্ছ। হযরত বলেন– বয়ানটি পাঠ করেই মন শান্ত হয়ে গেল, সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল এবং যথারীতি পড়াশোনায় নিমগ্ন হলাম। অন্তরে কোনো প্রকার অস্থিরতা রইল না। [কামালাতে মুহাম্মদীয়া]

আহলে হক্কের অনুসন্ধান ও মদীনা যিয়ারতের আগ্রহ

যে বয়সে দরস ও ফুর্তি ছাড়া ছাত্রদের সাধারণত অন্য কোনো দিকে মনোযোগ থাকে না। সেই বছরে মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরীর মধ্যে আহলে হকের অনুসন্ধান ও নিরেট চাহিদা বিদ্যমান ছিল। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন–

সম্মানিত দাদার ইন্তেকাল হয় আমার শৈশবকালেই। আমি নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম। ঘরে ছিলেন পাঁচ-ছয়জন মহিলা। আমি প্রায়ই অসুস্থ থাকতাম। কিন্তু সবসময় দরবেশের খোঁজে থাকতাম। যদি জানা যেত যে, কোথাও কোনো বুযুর্গ ব্যক্তি তাশরীফ এনেছেন, তাহলে দেরি না করেই তার সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা করতাম এবং সব কাজ ছেড়ে প্রথমে এই কাজটি সম্পন্ন করতাম। মদীনা তৈয়েবা যিয়ারতের আগ্রহ এতই প্রবল হয় যে, নির্জনে বসে কাঁদতাম। একবার ইচ্ছা হলো বাড়ি ইত্যাদি বিক্রি করে সবাইকে নিয়ে রওয়ানা হই। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা তেমনটি ছিল না। দরবেশ চরিত্রের এক বুযুর্গের সাথে সাক্ষাত হলো। তিনি এ ইচ্ছা থেকে নিবৃত্ত করলেন। কামালাতে মুহাম্মাদীয়া গ্রন্থকার লিখেছেন–

একবার তিনি বলেন, আমার বয়স যখন বারো-তেরো বছর বা সর্বোচ্চ চৌদ্দ বছর, তখন মদীনা তৈয়েবা ও রওযায়ে মুনাওয়ারার যিয়ারতের আগ্রহ প্রবল হলো। এমনকি নির্জনে বসে কাঁদতাম। আম্মাজান তা দেখে খুব পেরেশানীতে পড়লেন। কেননা সফরের কোন পাথেয় নেই। বাড়িতে পাঁচ জন মহিলা। যেতে

হলে সবাই যাই। ঘরে এতটুকু সম্বল নেই যে, একজন যেতে পারে। বাধ্য হয়ে ইচ্ছা করলাম থাকার বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে চলে যাই। আল্লাহর ওপর ভরসায় এতই অমুখাপেক্ষিতা ও উচ্চ মনোবল, অল্প বয়সে এ চিন্তাও এলো না যে, কোনো ধনী ব্যক্তির কাছে গিয়ে নিজের অবস্থা বলি। থাকার ছোট একটি বাড়ি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসায় তা উৎসর্গের ইচ্ছা করলাম। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা তা ছিল না। হিন্দুস্তানে শিক্ষা-দীক্ষার পর সেখানে যাওয়ার চিন্তা করছিলাম। তাই গায়েবী উপকরণ হলো এই যে, আবদুল্লাহ শাহ নামে একজন কামেল দরবেশ তাশরীফ আনলেন। অভ্যাস ছিল, কোনো বুযুর্গের কথা শুনলে তার সাথে সাক্ষাত করা। তাই হযরত আবদুল্লাহ শাহের সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলেন। বসতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, বাবা! তোমার মদীনা তৈয়েবা যাওয়ার আগ্রহ? জবাব দিলেন– জ্বী, হ্যাঁ। শাহ সাহেব বললেন– এক্ষুণি যেয়ো না। হযরত বললেন– মন নিয়ন্ত্রণে নেই। জবাব দিলেন– নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে। একথা বলতেই মনের অস্থিরতা চলে গেলো।

ফয়যে আম মাদরাসার প্রথম ছাত্র

সাইয়িদ শাহ গাউস আলী রহ. এর অন্যতম ভক্ত হাফেজ ইমামুদ্দীন সাহেব সর্বপ্রথমে তাকে আরবি শিক্ষার উৎসাহ দেন। অন্যদিকে সম্মানিত আম্মাজান সবসময় উৎসাহিত করতে থাকেন।

১২৭৭ হিজরীতে সর্বপ্রথম যেসব ছাত্র মাদরাসায়ে ফয়যে আমে ভর্তি হয়। তাদের তালিকার শীর্ষে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরীও ছিলেন। তিনি এখানে দুই বছর পাঠ্য কিতাবাদি চর্চায় নিমগ্ন ছিলেন। অন্যান্য কিতাব ছাড়াও ইলমুস সীগা তিনি স্বয়ং মুফতি সাহেবের কাছেই পড়েন। তখন তিনি যে আগ্রহ উদ্দীপনা এবং পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সাথে এসব কিতাব চর্চা করতেন এবং দরসের জন্য প্রস্তুতি নিতেন, তা অনুমান করার জন্য একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়।

একদিন মুফতি সাহেব বললেন– আগামীকালের পাঠটি জটিল ও কঠিন। ভালোভাবে দেখে আসবে। তাই সেদিন খুব কষ্ট করে সামনে পাঠটি দেখলাম এবং বিষয়বস্তু আয়ত্ব করলাম। এতে আনন্দবোধ করলাম। পরদিন সকালে মুফতি সাহেবের খেদমতে হাজির হলাম এবং কিতাব খুলে মূল পাঠ পড়লাম, তরজমা করলাম। রীতি ভঙ্গ করে মুফতি সাহেব পাঠটি জটিলতার কথা চিন্তা করে নিজেই ভাবার্থ বর্ণনা শুরু করলেন। আমার বড়ই দুঃখ লাগল। চোখ দিয়ে পানি ঝরল। মুফতি সাহেব কথা বন্ধ করে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম– রাতে অনেক কষ্ট করে পাঠটি চর্চা করেছিলাম এবং বিষয়বস্তুও আয়ত্ত

করেছিলাম। মুফতি সাহেব সান্ত্বনা দিলেন এবং খুব উৎসাহ দিলেন। [জীবনীর ওপর মাওলানা রহমানির প্রবন্ধ]

দুই বছর পর মুফতি সাহেব হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন এবং তার স্থালভিষিক্ত হন মাওলানা লুৎফুল্লাহ আলীগড়ি। মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরীর লেখাপড়া নিয়মতান্ত্রিকতা, উৎসাহ উদ্দীপনা ও অধ্যবসায়ের সাথে চলতে থাকে। তিনি কাফিয়া শরহে মিসবাহ, শরহে মুল্লা জামি ও মানতেকের কয়েকখানা কিতাব পড়েন মাওলানা সাইয়িদ হুসাইন শাহের কাছে। অন্যান্য কিতাব পড়েন মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেবের কাছে।

উল্লেখ্য, মাওলানা সাইয়িদ হুসাইন শাহ ছিলেন মুফতি এনায়েত আহমদ কাকুরির ছাত্র ও বিশিষ্ট আলেম। ভারতবর্ষের বিশিষ্ট মুদাররিসীনের তালিকায় মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেবের পরেই আসে মাওলানা সাইয়িদ হুসাইন শাহের নাম।

শিক্ষার উৎসাহ ও মেধা

মাওলানা সহুল সাহেবের কাছে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন– চিন্তা করে দেখুন, আমি শরহে মুল্লা পড়তাম এবং জনাব মাওলানা সাইয়িদ হুসাইন শাহ মরহুমের সাথে কোন কোন পাঠ নিয়ে তিনদিন ধরে আলোচনা চলত। এতে সাইয়িদ সাহেব ক্ষুব্ধ হতেন। মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেবের কাছে হেদায়া ও তাওজীহ পড়তাম। তখন এই অধম যুক্তিতর্ক পেশ করত। মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেব তার কোনো কোনো বন্ধুর সাথে বলতেন– আল হামদুলিল্লাহ! আমাদের কোন কোন ছাত্র দরসের সময় এমন সুন্দর যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে যে আশ্চর্য হতে হয়। [প্রবন্ধ]

তখন তিনি নীচের দিকের কিছু কিতাবের পাঠ দানও করেন। মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী ও মুফতি আবদুল লতীফ সাহেবও তাঁর কাছে কয়েকখানা কিতাব পড়েন। [প্রবন্ধ]

এই সময়ে তার আম্মাজান তাকে বিয়ে দেয়ার চিন্তা করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ২২ বছর। তাই তিনি মুযাফফার নগর রওয়ানা হন এবং খাতুলি থেকে দুই মাইল দূরে মুহিউদ্দীনপুরে গিয়ে বিয়ে করেন। এখানেই তার পূর্বপুরুষরা শেষদিকে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। বিয়ের পর তিনি সেখানে দুই বছর অবস্থান করেন। ইতোমধ্যে মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেব কানপুর থেকে আলীগড়ে চলে যান এবং সেখানে দরস চালু রাখেন। মাদরাসাটি ছিল আলীগড় জামে মসজিদে এবং তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেবের উস্তাযের উস্তাদ মাওলানা বুযুর্গ আলী। মাওলানা মুহাম্মাদ আলী তখন মুযাফফর নগর থেকে সোজা

আলীগড়ে চলে যান এবং অবশিষ্ট কিতাবগুলো সম্পন্ন করেন। সেখানেও ছাত্ররা তার কাছে পড়তো। সেখানকার পরিবেশ তার শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ সহায়ক হয়।

উল্লেখ্য মাওলানা বুযুর্গ আলী ছিলেন মানকুল ও মা'কুল উভয় প্রকার ইলমে পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী। তিনি মাওলানা হায়দায় আলী রামপুরীর বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। তবে হাদীসের সনদ লাভ করেন হযরত শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী থেকে। তিনি কিছুকাল আকবরাবাদে দরস দানের খেদমত করার পর আলীগড়ে কাযী পদে অধিষ্ঠিত হন। পাশাপাশি দরস দানও অব্যাহত রাখেন। নওয়াব উযীরুদ্দৌলার সময়ে তিনি টংকের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং বাকী জীবন তাতেই অতিবাহিত করেন। তার ওফাত হয় ১২৬২ হিজরীতে। [নুযহাতুল খাওয়াতের খণ্ড- ৭/৯৯]

সুষ্ঠু চিন্তা ও সত্যের অন্বেষণ

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরীর শিক্ষা জীবন পর্যালোচনা করে দুইটি বিষয় পাওয়া যায়। আর এই দুইটি বিষয়ই তার জীবনের প্রচ্ছদ এবং তার কর্মকাণ্ড ও শিক্ষা ও দীনী খেদমতের প্রাণশক্তি।

সুষ্ঠু চিন্তা সম্পর্কে এতটুকু বলা যায় যে, যদিও তিনি নিয়ম ও রীতি অনুযায়ী সেই সব বিদ্যা অর্জন করেন যার একটি বড় অংশ মানতিক ও ফালসাফা দর্শন সম্পর্কিত। কিন্তু তার মানসিকতা কখনই এই জাদুতে আক্রান্ত হয় নি এবং তার মন-মানসিকতায় কখনই জটিলতা ও বক্রতা সৃষ্টি হয়নি। অথচ মাকুলাতের ছাত্রদের অনেক সময় এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। বরং মানতিক ও ফালসাফার প্রতি তার সুস্থ হৃদয় সবসময় অনীহা লালন করত। তিনি বলতেন, কুতবী পর্যন্ত মাকুলাত আগ্রহসহ পড়েছেন। মাইবুযীতে পৌঁছে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। মাওলানা লুৎফুল্লাহ আলীগড়ী চমৎকার বাচনভঙ্গিতে সবক উপস্থাপন করতেন। কিন্তু তাঁর অন্তর সেদিকে আকৃষ্ট হতো না। অবশেষে মাওলানাকে বললেন, জনাব! মাইবুযী পড়বো না। মাওলানা ভাবলেন, কঠিন কিতাব, তাই হয়তো বোঝে না। বললেন, হাদিয়ায়ে সাঈদিয়া পড়। তিনি উত্তর দিলেন, জনাব! মাইবুযী কঠিন লাগে না। আগ্রহ সৃষ্টি হলে সাথে সাথে বুঝে ফেলি। কিন্তু কী করবো! আগ্রহই হয় না। অবশেষে এভাবে এই সবক ছেড়ে দিলেন।

দর্শনের প্রতি অনাগ্রহ, হাদীসের প্রতি আগ্রহ

দর্শনের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিলো যে পরিমাণে, ওই পরিমাণেই আগ্রহ ছিলো হাদীসের প্রতি। 'ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসসাল্লাম কানে

পড়ার সাথে সাথে তিনি সম্মোহিত হয়ে পড়তেন। দীর্ঘকাল মাকুলাতের সবক পড়েননি। কিন্তু মাওলানা সব সময় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তাই ধীরে ধীরে হাদিয়া সাঈদিয়া পড়া শুরু করেন। কাযী মুবারক বেশ আনন্দের সাথেই পড়তেন। একবার হযরত কিবলা মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ. কানপুর এসেছিলেন। এমন বয়ান দিলেন যে, তাঁর অন্তর শান্ত হয়ে গেল। এভাবে তিনি মাকুলাতের কিতাবগুলো শেষ করেন, তবে মনোযোগ ও আগ্রহের সাথে নয়।

মাকুলাতের কিতাবগুলো মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেবের কাছে পড়ার পর তাঁর কাছেই সিহাহ সিত্তাহ খুব গুরুত্বসহ নিয়মতান্ত্রিকভাবেই পড়েছেন। এ সম্পর্কে মাওলানা সানাউল্লাহ আমৃতসরীকে তিনি এক চিঠিতে লেখেন–

'হাদীসশাস্ত্র প্রথমে মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেবের কাছে এমনভাবে পড়েছি, যেভাবে হেদায়ার মত কিতাবগুলো এক-দুই পৃষ্ঠা করে পড়া হয়।'

দরসিয়াত থেকে পুরোপুরি অবসর তিনি হননি। ইতোমধ্যে আরবি শুরু করার সময় যে রকম পেরেশানীতে তিনি পড়েছিলেন, ওরকমই পেরেশানীতে তিনি আবার পড়লেন। কিন্তু তারপর আল্লাহ তাআলার রহমে আপনাআপনি তা দূর হয়ে গেল এবং তিনি শান্তি ও স্থিরতা লাভ করলেন।

তিনি বলেন– আলিগড় থেকে কানপুর এসেছি। বিয়ে এর আগেই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখনও পড়াশোনা শেষ হয়নি। ঘরের অবস্থা ছিলো নিতান্ত মামুলি, যেমনটি ছাত্রদের হওয়া উচিত। আম্মাজান বললেন– বাবা! একটু রুজি কামাই কর। বিয়ে তো আল্লাহর হুকুমে হয়েছে। সন্তানাদি আসবে। একেবারে চিন্তামুক্ত থাকলে চলবে কি করে। আম্মাজানের কথায় অন্তরে দাগ কাটলো। খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। বাস্তবেই বেকার ছিলাম। রুজি-কামাইর পথও জানা ছিল না। তাই অব্যক্ত পেরেশানীতে পড়ে গেলাম। কানপুরের হাফেজ আব্দুল্লাহ সাহেবের সাথে খুব সম্পর্ক ছিলো। অনেক আমীর-উমারার সাথে তার জানাশোনা ছিল। তাঁকে বললাম, একটা চাকুরির ব্যবস্থা করে দিন। তিনি নবাব লোহারোর ওখানে ত্রিশ টাকা বেতনে চাকুরি ঠিক করে দিলেন। খানা ছিলো তাদের জিম্মায়। আমার দায়িত্ব ঠিক হলো। ছেলেদেরকে পড়াবো। এভাবে চাকুরি ঠিক হওয়ার পর হাফেজ সাহেব আমাকে যোগদানের কথা বললেন। তখনই আমি ভাবলাম, আমার তো পড়াশোনা এখনও শেষ হয়নি। কিতাবগুলো শেষ করবো কিভাবে! এ ভাবনা অন্তরে বেশ পীড়া দিতে লাগল। তাই একাকী বসে

কাঁদছিলাম। আল্লাহর কাছে দুআ করলাম, হে আল্লাহ! আমাকে ইলম অন্বেষণ থেকে বঞ্চিত করবেন না, আমার অন্তরকে স্থির করে দিন।

দয়ালু আল্লাহ দয়া করলেন। দুআ কবুল করে তাঁর কারিশমা দেখালেন। আমার অন্তর শান্ত হয়ে গেল। চাকুরির চিন্তা মন থেকে পুরোপুরি বিদায় নিল।

আহলে হকের সন্ধানে

মাওলানা শুরু থেকেই আহলে হকের সন্ধান করছিলেন। আল্লাহ ওয়ালা পীর-মাশায়েখের সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। সত্যানুসন্ধানের এ গোপন তাড়না তাঁকে অস্থির করে রেখেছিল। যে অস্থিরতা তাঁকে পার্থিব লালসা, তুচ্ছ বস্তুতে তুষ্টি ও পার্থিব মোহ থেকে নিরাপদ দূরে রাখতো।

সতের। আঠার বছর এমন বয়স নয়, যে বয়সে মানুষ নিজ ক্রটিগুলো অনুভূতিতে আনবে। এ শূন্যতা একমাত্র পূরণ করতে পারে ইয়াকীনের শক্তি, ঈমানের উষ্ণতা ও মারেফাতের স্বাদ।

যৌবনের শুরুতেই হাফেজ মুহাম্মদ রহ. নামের এক সাহেবে হাল বুযুর্গের সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। তিনি মাওলানাকে 'ইসমে জাত' আমল শিক্ষা দিলেন। এ আমলের ফলে মাওলানার মাঝে 'ইসতেগরাকী অবস্থা' ও অন্তরের উষ্ণতা সৃষ্টি হয়ে যায়। নামাজসমূহে খুব মজা পেতে শুরু করেন। দুনিয়া-বিমুখতা তাঁকে পেয়ে বসে। পবর্তীতে বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শে উক্ত আমল অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ছেড়ে দিলেন। তারপর তিনি মাওলানা কারামত আলী কাদেরী রহ. এর আঁচল ধরেন। তাঁর থেকে ইলমে মারেফাতের দীক্ষা যদিও দশ মাস নিয়েছিলেন কিন্তু এই অল্প সময়ে সুদীর্ঘ ফয়েয লাভের কাজ হয়েছিল। তিনি নিজেই স্বরচিত কিতাব 'ইরশাদে রাহমানী'-তে এ প্রসঙ্গে লিখেন-

তাঁর কাছে দশ মাস নিয়মিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। তারপর তিনি আখেরাতের পথে পাড়ি জমান। ইন্তেকাল করেছেন কালপিতে। তার তাওয়াজ্জুহের বরকতে ও সোহবতের ফয়েযে আমার মাঝে বিস্ময়কর পরিস্থিতি অতিবাহিত হয়েছে। মাওলানা শাহ কারামত আলী কাদেরী রহ. ছিলেন কাদেরিয়া সিলসিলার বুযুর্গ। প্রথম জীবনেই তিনি ইরান থেকে ভারতে আসেন। শাহ আবদুল আযীম মুহাদ্দিছে দেহলভী রহ.-এর কাছে শিক্ষা নেন। মাওলানা ইসমাইল শহীদ রহ. ছিলেন তার খেলার সাথী। তিনি কালপীতে ইন্তেকাল করেন। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।

মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ.-এর খেদমতে

মাওলানা শাহ কারামাত আলীর পরে তিনি আরেকজন মুরশিদের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। ইখলাসের জযবা ও সত্যানুসন্ধানের স্পৃহা তাকে অল্প সময়ে

একজন মুরশিদের পথ দেখিয়ে দিলো। তার দক্ষ দিক-নির্দেশনা ও দীক্ষার ফলে তাঁর আত্মিক উন্নতি ও সিদ্ধি এমন স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল যে, অনেক সময় তা দীর্ঘ মুজাহাদার পরেও অর্জিত হয় না।

এ মর্মে মাওলানা মুহাম্মদ আলী নিজেই লিখেছেন- মাওলানা কারামত আলীর ইন্তেকালের পর একজন মুরশিদের প্রয়োজনীয়তা পুনরায় অনুভব করলাম। হযরত কিবলা ওই সময় কানপুর আসা-যাওয়া করতেন। নিজামী ছাপাখানার মালিক জনাব মুহাম্মদ আবদুর রহমান খানের ওখানে তিনি অবস্থান করছিলেন। অধম শুনে তাঁর বরকতময় খেদমতে হাজির হল। ওই সময় হযরত রহ. আতর বিক্রেতা বন্ধু মুহাম্মদের ওখানে তাশরিফ নিয়েছিলেন। জায়গা সংকীর্ণ হওয়ার কারণে আমি জুতোগুলোর কাছে বসে গেলাম। তিনি বার বার নিজের কাছে বসার কথা বললেন। আমি আদবের আতিশয্যে ওখানেই বসে রইলাম। হঠাৎ আমার নড়াচড়ার দরুণ লাঠি পড়ে গেল। একটি বোতলও ভেঙ্গে গেল। হযরত বললেন, বড়দের কথা না শুনলে এমনই হয়। তারপর আমার প্রতি ভালোভাবে লক্ষ্য করে বললেন, অমুক বুযুর্গ যিনি এখানে ছিলেন, তুমি কি তাঁর ছেলে? আমি বললাম, আমি তাঁর নাতি। উক্ত দেখা সাক্ষাতে বেশি কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়নি। তারপর আমি উল্লিখিত আবদুর রহমান খান সাহেবের ওখানে হাজির হলাম। হযরত বললেন- তুমি কার সোহবত গ্রহণ করেছ? আমি বললাম- শাহ কারামত আলী রহ.-এর খেদমতে কিছুদিন ছিলাম। একথা শুনে হযরত অভ্যাস অনুযায়ী মাথা নিচু করে নিলেন। তারপর একটু চিন্তা করে বললেন, তিনি তো বড় মানুষ ছিলেন। ওই সময়ে হযরত সূরা আর রাহমানের তরজমা করছিলেন। মরহুম মৌলভী মুহিব্বুল্লাহ পানিপথী ও মৌলভী হাফেজ আবদুল গাফফার লাখনৌভী তাঁর কাছে বসে শুনছিলেন। আমি পৃথক জায়গায় বসে গেলাম। বয়ানের প্রভাবে আমার চোখ বেয়ে পনি ঝরতে লাগলো। হযরত আমার দিকে আড় চোখে তাকালেন এবং উক্ত দুই আলেমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা কি একে চেনো? তাঁর বললেন- জ্বি হ্যাঁ, তালিবে ইলম। মাদরাসা ফরযে আমে পড়ে। হযরত বললেন, তোমরা একে চেনো না। এ বলে আবার তরজমার আমল শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর উক্ত আলেমদের একই প্রশ্ন করলেন। তাঁরা উত্তর দিলেন, আমরা তো এতটুকুই জানি যে, একজন নেককার তালিবে ইলম। হযরত আবার বললেন, তোমরা এর সম্পর্কে জানো না।

একবার হযরত বেনারস যাচ্ছিলেন। অন্যান্য বারের মত এবারও কানপুর অবস্থান করলেন। আমি সংবাদ পাইনি। কিন্তু আমার অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠল। আমি অনিচ্ছাকৃতভাবেই দাঁড়িয়ে গেলাম। ব্যাকুল চোখে এদিক ওদিক করতে

লাগলাম। ইত্যবসরে আতর বিক্রেতা মুহাম্মাদের দোকানে হাফেজ মূসাকে পেয়ে গেলাম। তিনি হযরতের আগমনের সংবাদ জানালেন। আমি নিজামী ছাপাখানায় চলে গেলাম। জুমআর দিন ছিল। নিজামী ছাপাখানার মালিক খান সাহেব একাকী বসেছিলেন। আমি আবেদন করলাম, আমি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হতে চাই। অনুগ্রহপূর্বক আপনি বিষয়টি অবহিত করুন। খান সাহেব উঠে হযরত যে কামরায় ছিলেন, সেদিকে গেলেন, ফিরে এসে বললেন, আজ জুমআ আছে। এখন সাক্ষাত হবে না। জুমআর পর আসবেন। আমি মনমরা হয়ে ফিরে আসলাম। জুমআর নামাজ কর্নেল মুহাম্মদ জামান খানের মসজিদে পড়লাম। তারপর খান সাহেবের সাথে হযরতের খেদমতে হাজির হলাম। কিন্তু এর আগেই কিছু লোক সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলো। তিনি তাদের মাঝে কিছু কিতাব বণ্টন করে দিচ্ছিলেন। আমি ও খান সাহেব কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। যখন হযরত আমাদের দিকে দৃষ্টি করলেন, তখন সকলকে বললেন- এবার তোমরা যাও। এদের বসার সুযোগ দাও। দু'একজন তখনও বসে থাকার চেষ্টা করলো। কিন্তু হযরত তাদের অনুমতি দিলেন না। অবশেষে সবাই চলে গেলো। আমি ও খান সাহেব বসে পড়লাম। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী পড়? বললাম, কাযী মুবারক পড়ি। এটা শুনে হযরত 'আসতাগফিরুল্লাহ নাউযুবিল্লাহ' বলে উঠলেন। তারপর বললেন, কাযী মুবারক পড়ে কী লাভ? মেনে নিলাম, মানতিক পড়ে তুমিও কাযী মুবারকের মত হবে। তারপর কী হবে? কাযী মুবারকের কবরে গিয়ে দেখো, কী অবস্থা! আর আল্লাহর সাথে সম্পর্ক আছে, এখন কোনো মূর্খের কবরেও যাও, দেখবে কত নূর ও বরকত আছে।'

এভাবে হযরতের সংস্পর্শে এসে আমি নিজেকে কিছুটা হারিয়ে ফেললাম। তারপর তিনি খান সাহেবের সাথে কিছু কথাবার্তা বললেন। আবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি পড়? এবার উত্তর দিলাম, হিদায়াহ পড়ি। কারণ, মূলত আমি উক্ত দুই কিতাবই পড়ছিলাম। আমার উত্তর শুনে আমাকে বেচাকেনার মাসআলাসমূহ জিজ্ঞাসা শুরু করলেন। আর আমার অবস্থা ছিলো, যে মাসআলাগুলো আমি কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বলতে পারতাম, সেগুলোও খুব চিন্তা-ভাবনা করে উত্তর দিচ্ছিলাম। ইত্যবসরে হযরত আবদুর রহমান খান সাহেবের কাছে জানতে চাইলেন যে, তুমি সেই সকালে এসে বলেছিলে, একজন তালিবে ইলম দেখা করতে চায় সে কে ছিল? খান সাহেব উত্তর দিলেন, এ-ই সে। হযরত বললেন, তুমি তো দেখি নিতান্তই বোকা। আমাকে এসে বললে একজন তালিবে ইলম এসেছে। আমি কেমনে জানি কোন্ তালিবে ইলম। এ তো আমাদেরই ছেলে। খান সাহেব বললেন- হযরত! এটা আমার জানা ছিল না।

যাই হোক, এভাবে আসর পর্যন্ত আমি ও খান সাহেব হযরতের সংস্পর্শে ছিলাম। তখন পর্যন্ত হযরতের হাতে বাইয়াতের সৌভাগ্য হয়নি। তবে সোহবতধন্য হওয়ার সুযোগ তো হয়েছিল।

গঞ্জেমুরাদাবাদে প্রথম উপস্থিতি ও বাইয়াত

এরপর হযরত কিবলার কাছে আসা-যাওয়া নিয়মিত হয়নি। অপরদিকে আমার অন্তরে আগ্রহ জাগল সিলসিলায় প্রবেশ করব। এই উপস্থিতি যদিও বাইয়াতের নিয়তে ছিল, কিন্তু আমার মনে পড়ে দুনিয়াবী উদ্দেশ্য কিছুটা ছিল। অর্থাৎ হযরতকে দিয়ে কোনো বিশেষ জায়গায় চাকুরির সুপারিশ করিয়ে নিব। আলহামদুলিল্লাহ, সেখানে গিয়ে চিন্তাটা একেবারে দূর হয়ে গেল। সুপারিশ করানোর ইচ্ছা পুরোপুরি বিদায় নিলো। সেখানে পৌঁছেছিলাম সন্ধ্যায়। ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিলাম। হযরত ঘাস আগেই কিনে রেখে দিয়েছিলেন। সকালবেলা নামাজের পর বাইয়াতের আবেদন করলাম। হযরত কবুল করলেন এবং সিলসিলায় প্রবেশ করিয়ে দীর্ঘক্ষণ তাওয়াজ্জুহ দিলেন। শেষ করার পর বললেন, আমি অনেক দূর পর্যন্ত তাওয়াজ্জুহ দিয়ে দিয়েছি। এরপর হযরত উঠলেন এবং খাদেমকে ডাকলেন। খাদেমকে বললেন, বাসা থেকে এর জন্য কিছু নিয়ে আসো। খাদেম বাসা থেকে ফিরে এসে জানাল, এখনও রান্না হয়নি। হযরত বললেন, পাকা-কাঁচা যা-ই পাও, নিয়ে আসো। খাদেম গেল এবং ঝুড়িতে ভরে কিছু ছোলাবুট নিয়ে এল। আনুমানিক আড়াই সের হবে। হযরত আমাকে বললেন, তোমার কাছে কোনো কাপড় আছে কি? আমি রুমাল পেতে দিলাম। হযরত তিন আঁজলা ছোলা আমার রুমালে দিলেন এবং বললেন, এটা তোমাকে দুনিয়া দিচ্ছি, খাওয়ার জন্য। এটা ছিল মসজিদের ঘটনা। তারপর হযরত যখন বিশ্রামাগারে গেলেন, খাদেমকে বললেন, এর জন্য পান নিয়ে আসো। আমি বললাম, হযরত! পানের অভ্যাস আমার নেই। কিন্তু তিনি আমার কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। খাদেমকে আবার বললেন, পান নিয়ে আসো। পান আনা হল। হযরত পানটা নিজের মুখে নিলেন এবং একটু চিবিয়ে আমাকে দিলেন। ফয়েয-বরকতের অভিব্যক্তিতে যেন এও বললেন, 'নাও, এই পান ইরফান-মারেফাতের। খেয়ে নাও।' এ দু'টি বাক্য ছিল অস্বাভাবিক। তাই দুই বাক্যকে মাওলানা রুমীর নিম্নোক্ত কবিতার বাস্তব নমুনা বলাটা অসমীচীন হবে না–

گفتۂ او گفتۂ اللہ بود

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

'তার কথা মূলত আল্লাহরই কথা

যদিও তা বের হয় আল্লাহর বান্দার কণ্ঠ দিয়ে।'

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী হযরত ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদীর সাথে সাক্ষাত লাভের উদ্দেশ্যে যখন যেতেন, তখন কাউকে সঙ্গে নিতেন না। পথিমধ্যে কেউ সঙ্গী হয়ে গেলে তিনি কেটে পড়তেন। উদ্দেশ্য ছিল, নির্জনে স্থিরতার সাথে হযরতের দরবারে বসবেন, সময় কাটাবেন, হযরতের সম্পূর্ণ তাওয়াজ্জুহ অর্জন করবেন।

তাকমীলে হাদীস

হাদীসের সাথে যেমনটি ইতোপূর্বে বলা হয়েছে মাওলানার স্বভাবজাত সম্পর্ক ছিল। হযরত গঞ্জেমুরাদাবাদীর সংস্পর্শ ও বাইয়াতের ফলে এই রঙ আরও গভীর হলো। হাদীসের প্রতি তাঁর এই দারুণ অনুরাগ ও স্পৃহা কিছুটা অনুমান করা যায় এভাবে যে, তিনি এত গুরুত্বসহ হাদীস পড়ার পরেও তাঁর অন্তরে আরও পিপাসা ছিল। কিছুদিন পর এই পিপাসা আরো তীব্র হল। শেষ পর্যন্ত তিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরীর নিকট চলে যান এবং তাঁর কাছে এগার মাস অতিবাহিত হয়েছিল। এ সময়ে তিনি তার কাছে সিহাহ সিত্তাহ ও মুয়াত্তা মালেক পড়েছিলেন এবং সনদও অর্জন করেছিলেন।

মাওলানা আহমদ আলী রহ. তাঁকে খুব সম্মান ও মূল্যায়ন করেছিলেন। মনে হয় যেন তার দূরদর্শিতা ও ঈমানী ফিরাসত অনুভব করে নিয়েছিল যে, মাওলানার মাঝে সুপ্ত-রত্নভাণ্ডার লুকিয়ে আছে,

بالائے سرش ز ہوشمندی

می تافت ستارۂ بلندی

'বুদ্ধিমত্তার ফলে তার মাথার ওপর

মহত্ত্বের তারকা জ্বলজ্বল করছিল।'

টীকা : [মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী সমকালের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। হাদীসের ইজাযত নেওয়ার জন্য ওই যুগে অনেকেই আলেম হয়ে তাঁর খেদমতে যেতেন। তাঁর কাছ থেকে হাদীসের ইজাযত ও সনদ গ্রহণ করেননি, এমন প্রসিদ্ধ আলেম ওই যুগে বিরল ছিল। মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী ও মাওলানা শিবলীও তাঁর কাছে হাদীসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মাওলানা মামলুক আলীর ছাত্র ছিলেন এবং হাদীসের সনদ শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন সাহারানপুরী থেকে অর্জন করেছিলেন। তারপর পবিত্র হিজাযে গিয়ে মাওলানা আবদুল আযীয রহ.-এর নাতি শাহ ইসহাক দেহলভী রহ.-এর নিকট সিহাহ সিত্তাহ সম্পন্ন করেছিলেন এবং সারাজীবনেই হাদীসের খেদমতে মগ্ন ছিলেন। তন্মধ্যে সুদীর্ঘ দশ বছর অতিবাহিত হয়েছিল শুধু সহীহ বুখারীর টীকা ইত্যাদি লেখার কাজে। তিনি ১২৯৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

শাগরিদ নিজ উস্তাদকে যে রকম সম্মান করে, মাওলানা নিজ শাগরিদদের অনুরূপ সম্মান করতেন। মাকামাতে মুহাম্মাদিয়ার গ্রন্থকার লিখেন– .

মাওলানা তাকে এতটাই সম্মান করতেন যে, মানুষ আশ্চর্যবোধ করত। আসরের পর দরস শেষ করে মাওলানা নতুন ভবনে গিয়ে শুয়ে পড়তেন। তখন অধিকাংশ ছাত্র তাঁর আশেপাশে বসে যেত। কিন্তু যখন হযরত তাশরীফ আনতেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে যেতেন। একদিন হযরত বললেন, জনাব! আমি আপনার একজন নগন্য ছাত্র। হাজার হাজার আলেম আপনার ছাত্র। বয়সে আপনি আমার বাবার চাইতেও বড়। এই বয়সে আপনি সারা দিন পাঠ দান করে এই সময়ে এসে বিশ্রাম করেন কিন্তু আমার আসার কারণে আপনি উঠে বসে যান।' এ কথার কোনো উত্তর তিনি দিলেন না। কিন্তু হযরত এ সময়ে আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। [মাকামাতে মুহাম্মদিয়াহ]

ওই সময়েরই ঘটনা। মাওলানা বলেন, আমি স্বচ্ছলতা লাভের উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন থেকে দুটি অজিফা পড়তাম। প্রথমটি, চারশব্বার আমল। দ্বিতীয়টি, ইয়া-মুনয়িমের আমল যা খান্দানে বরকতিয়ার মধ্যে যথেষ্ট প্রসিদ্ধ আমল। আর ফলাফল দৃশ্যত বোঝা যেত। অর্থাৎ দিনকাল খুব স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়ে কাটতো। একদিন হঠাৎ নিজে নিজে ভাবলাম, উক্ত অজিফা তো আমি স্বচ্ছলতার নিয়তে পড়ি। খানাপিনা যেন একটু ভালো হয় সেজন্য পড়ি। যারা আমাকে দেখে, তারা তো ভাবে যে, আমি আল্লাহর যিকিরে মশগুল। মোদ্দাকথা, এটা তো এক প্রকার ধোঁকাবাজি মনে হয়। ওই দিন থেকে উভয় অজিফা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এরপরেও অবস্থার মাঝে কোনো প্রকার পরিবর্তন দেখা যায়নি। আগের মতোই সুন্দরভাবে দিন চলে যেতে লাগল।

অন্তরের অমুখাপেক্ষিতা

মাওলানা বলেন, হাদীস পাঠ সম্পন্ন হওয়ার পর মহান আল্লাহ হৃদয়ে প্রাচুর্য্য ও আল্লাহ ভীতির যে নেয়ামত দান করেছেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন বৈকি! অথচ বাহ্যত জীবিকা নির্বাহের কোনো মাধ্যম ছিল না। তবুও অন্তর ছিল এতই প্রশান্ত, যা কোনো রাজা-বাদশাহরও ভাগ্যে জোটে না। সেখান থেকে ফিরে আসার পর অন্তর থেকে চাকুরির চিন্তা একেবারে চলে গেল। এমন কি এই চিন্তাও উদ্রেক হত না যে, রুজি কামাই তো নেই। খাবো কী করে!

সাহারানপুর থেকে আসার পথে তিনি গঞ্জেমুরাদাবাদ গেলেন। তখন মাওলানা ফযলে রহমান সিহাহ সিত্তাহ, মুয়াত্তা ইমাম মালেক ও হিসনে হাসীনের ইজাযত দ্বারা ধন্য করলেন।

ইজাযত ও খেলাফত

ওই সময়ে মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী বাইয়াতের ইজাযতও দিয়েছেন। তাও ছিল বিস্ময়কর ও সহজ-সরল পদ্ধতিতে। ইরশাদে রাহমানীতে মাওলানা লিখেছেন–

যখন আমি চলে আসার উদ্দেশ্যে হযরতের সাথে মসজিদের ভেতর থেকে আঙ্গিনায় আসলাম, তখন হযরত কিবলা আমার হাত ধরে মসজিদের ভেতর ডান কোণে নিয়ে গেলেন এবং দুই পায়ের পাতার ওপর ভর করে বসে বললেন, তোমার কাছে বাইয়াত গ্রহণের উদ্দেশ্য যে-ই আসবে তাকে নকশবন্দীয়া ও কাদেরীয়া তরীকায় মুরীদ করে নিবে। আমি বললাম, হযরত! আমি এ কাজের যোগ্য নই। উত্তর দিলেন, তোমাকে এত কথা বলতে কে বলেছে? আমি যা বলি তা-ই কর। তখন আমি বললাম, এ বোঝা হযরতই সামলাবেন এবং খেয়াল রাখবেন।

শিক্ষকতার খেদমত

গঞ্জেমুরাদাবাদ থেকে ফিরে এসে তিনি কানপুরের দুলারী মসজিদে দরস দেয়া শুরু করলেন। মাওলানা আহমদ আলী রহ.-এর সংস্পর্শে এক বছর অবস্থান করে হাদীসের শিক্ষা নেওয়ার ফলে এবং মাওলানা ফযলে রহমান রহ.–এর সংস্পর্শ ও বাইয়াতের ফলে তাঁর মাঝে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল; তার ফলাফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, লোকজনের সাথে অধিক মেলামেশা ছেড়ে দিলেন। অধিকাংশ সময় ধ্যানে ডুবে থাকতেন। দিনরাতের অধিকাংশ সময় কাটাতেন হাদীসের দরস, যিকির-আমল ও মুরাকাবার ভেতর দিয়ে। ছাত্রদের পীড়াপীড়ি ও স্পৃহা এতটাই ছিল যে, জরুরি কাজের সময় ও নামাজের সময় ছাড়া ফজর থেকে শুরু করে ইশা পর্যন্ত গোটা সময় দরসের ভেতরেই চলে যেত। এরপরেও ছাত্রদের আগ্রহ-উদ্দীপনার মাঝে চিড় ধরত না।

ওই সময় মাওলানা হাদিয়াও গ্রহণ করতেন না। জোরাজুরি করলেও না। একবার হযরত গঞ্জেমুরাদাবাদীর খেদমতে গেলেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কারো কাছে থেকে হাদিয়া নাও না? উত্তর দিলেন, অন্তর কবুল করে না। হযরত বললেন, এটা অবশ্য প্রসিদ্ধি লাভের একটা মাধ্যম। তবে لا رد ولا كد অর্থাৎ, 'ফেরতও না; আশাও নয়' এ নীতির ওপর আমল করা উচিত। [মাকামাত- পৃ. ২৪]

মাদরাসা ফয়েযে আমের মুহতামিম যখন দরস-তাদরিসের উক্ত নমুনা দেখলেন, তখন এই চেষ্টা করলেন যে, মাওলানা মাদরাসায় দরস দিন। কিন্তু মাওলানা

অপারগতা প্রকাশ করলেন। এ দিক থেকে পীড়াপীড়ি শুরু হলো। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো মাওলানার বিষয়টি হযরত গঞ্জেমুরাদাবাদীর রায়ের উপর ছেড়ে দেয়া হোক। তিনি যা বলবেন তা-ই হবে। এ মর্মে তাঁর কাছে চিঠি লেখা হল। তিনি উত্তর পাঠালেন তার সারাংশ ছিল–

در امور شما اختیار شما است، صلاح ما ہمہ آنست

کاں صلاح شما است

'আপনার ব্যাপারে আপনার নিজের এখতিয়ার। আপনার জন্য যা ভালো, আমাদের সবার জন্য সেটাই ভালো।'

এ ঘটনার পর মাওলানা মাদরাসাকেই প্রাধান্য দিলেন। কয়েক মাস সেখানে পড়ালেন। বিরামহীন ব্যস্ততা ও মেহনতের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দীর্ঘ ছয় মাস পর্যন্ত তার অসুস্থতা কাটল না। সুস্থ হওয়ার পর ছাত্ররা আবার প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করল কিন্তু তিনি পড়াতে পারতেন না। এক-দুদিন দরস দিলে হাঁপানী উঠে যেত। এমনকি প্রয়োজনীয় কথাবার্তাও বলতে পারতেন না। অবশেষে বাধ্য হয়ে শিক্ষকতা ছেড়ে দিতে হল। [জীবনী সংশ্লিষ্ট মাকালা, পৃ. ১১]

আলীগড় থেকে আসার পর মাদরাসা ফয়েযে আমেই তিনি প্রায় সাড়ে তিন বছর হাদীসের দরস দিয়েছিলেন। তারপর সাহারানপুর যাওয়ার ইচ্ছা করলেন।

সাহারানপুর যাওয়ার আগে একটি ঘটনা ঘটে। মাওলানা আলে আহমদ মুহাদ্দিসে ফুলওয়ারী (মুহাজিরে মদীনা মুনাওয়ারা, মৃ. ১২৯৬ হিজরী) তিনি কানপুর এসে লাগাতার দুই মাস পর্যন্ত মাওলানার মেহমান হিসেবে ছিলেন। তিনি বুখারীর কিছু অংশ মাওলানার কাছ থেকে শোনেন এবং খুবই খুশি হয়ে আবেদন ছাড়াই তাঁকে হাদীসের সনদ দান করেন।

[মাওলানা আলে আহমদ মুহাদ্দিসে আসসানজিতীয়ার কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন এবং শায়খ মুহাম্মদ আকরাম লাহোরীর কাছ থেকে হিসনে হাসিনের বিশেষ ইজাযত লাভ করেছিলেন। তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করেন। সমরকন্দ, বুখারা, কাবুল, গজনী, কাশ্মির ও পাঞ্জাব কয়েকবার সফর করেন। বড় বড় আলেম তাঁর কাছ থেকে ইলমে হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। ১২৯৬ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। (নুযহাতুল খাওয়াতির, খণ্ড– ৭, পৃ. ২)]

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী বলেন, সনদ লাভের প্রতি অনেকেরই বিশেষ আগ্রহ থাকে। কিন্তু আমার মাঝে এ রকম কিছু ছিল না। কেননা, যদি আমার যোগ্যতা

থাকে, তাহলে এক সনদই যথেষ্ট। বরং লিখিত কোনো সনদ না থাকলে মানুষ পড়বে, ফায়দাও হবে। কেউ সনদ দেখে পড়বে না। যদি যোগ্যতা না থাকে এবং চিঠি লিখে সনদ নেয়, তবে এটা দুনিয়াবাসীকে এক প্রকার ধোঁকা দেয়া বৈ কি? [মাকামাত, পৃ. ১৪]

আঞ্জুমানে তাহযীব প্রতিষ্ঠা

ওই যুগে সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা অন্তত উলামা মহলে নতুন বিষয় ছিল। এমনকি সাধারণ শিক্ষিতদের মাঝেও এর খুব একটা প্রচলন ছিল না। কিন্তু মাওলানা 'আঞ্জুমানে তাহযীব' নামে একটি সাস্কৃতিক সংগঠন কানপুরে ওই যুগে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, উলামা সমাজ ও আধুনিক শিক্ষিতদের মাঝে বিলুপ্ত ইসলামী চেতনার প্রচার-প্রসার এবং তাঁদের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন তৈরি করা। অনেকে বলেছিল, এই জাতীয় সংগঠন কানপুরে অসম্ভব। কিন্তু মাওলানা কারো কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি। সম্ভবত উক্ত সংগঠনের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম সনাতনধারায় উলামা ও আধুনিক শিক্ষিত উকিল ও নেতৃত্বস্থানীয় লোকজন একসাথে কাজ করেন। প্রথম দিকে খুব জোরেশোরেই কাজ চলছিল। মাওলানা উক্ত সংগঠনের কোনো পদ গ্রহণ করেননি। পদে ছিলেন অন্যান্য ব্যক্তি। মাওলানা তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দিতেন। কিন্তু তাঁর অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে সংগঠনের কার্যক্রম বেশি দিন চলেনি। কাজের গতি অনেকটাই শিথিল হয়ে যায়। [কামালত-গ্রন্থের লেখক সংগঠনটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। অন্য উৎসগুলোতে এর উল্লেখ নেই বললেই চলে।]

জিকির-আযকার ও তাসাউফের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ থাকার পাশাপাশি এ জাতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা মাওলানার দূরদর্শিতা ও যুগ চাহিদার সঠিক মূল্যায়নেরই প্রমাণ বহন করে। অবশেষে যার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে নদওয়াতুল উলামা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। মাওলানা এহেন প্রাজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ও চিন্তার পরিপক্বতা চোখ ধাঁধিয়ে সামনে চলে আসে।

ইলমী যওক ও তাহকীকের জযবা

মাওলানার ইলমী যওক ও তাহকীকের জযবা তাঁর ছাত্র ও শিক্ষকতার যামানা উভয়টাতেই সমুজ্জ্বল। ছাত্র যামানাতে তিনি মাওলানা সাইয়িদ হুসাইন শাহ রহ. যিনি ফয়েযে আম মাদরাসায় তাঁর উস্তাদ ও সুদক্ষ আলেম ছিলেন- এর সাথে কোনো কোনো বিষয়ে তিন-চার দিন পর্যন্ত আলোচনা করতেন। অনেক সময় মাসআলা তাহকীকের উদ্দেশ্যে লাখনৌ চলে যেতেন। সেখানে কয়েক দিন

অবস্থান করে ইলমের পিপাসা মিটাতেন। এ মর্মে তিনি মাওলানা সাহুল মুহাম্মাদের কাছে এক চিঠিতে লেখেন–

আমার জীবনের অধিকাংশ সময় ইলমের খেদমতে অতিবাহিত হয়েছে। আল্লাহর ফযলে ছাত্র-যামানা থেকে তাহকীক-তানক্বীহের প্রতি আগ্রহ ছিল। ছাত্র যামানা শেষ হওয়ার পর ফিকহী মাসআলার তাহকীকের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হল। ওই সময় কিতাবাদি সহজলভ্য ছিল না। শুধু তাহকীকের উদ্দ্যেশে লাখনৌ যেতাম। সেখানে দশ পনের দিন অবস্থান করে আবদুল হাই লাখনবী রহ.–এর কিতাবগুলো দেখতাম। তারপর তাঁর সাথে পঠিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতাম। [মাকালা, পৃষ্ঠা- ১৩]

এভাবে মাওলানা লুৎফুল্লাহ রহ.-এর সাথেও বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে ইলমী-আলোচনার অবতারণা হত। সমাধানের আগ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকত।

একবার তিনি কিছু কিতাবের জন্য পাটনা গিয়েছিলেন। সেখানে খোদাবখ্স খান ও ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরীতে বসে মুতালাআ করতেন।

ফিকাহশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ

ফিকাহর প্রতি তার আগ্রহের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তার এ আগ্রহ প্রমাণ করার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, তিনি বিভিন্ন মাসআলার তাহকীকের উদ্দেশ্যে প্রায়ই লাখনৌ সফর করতেন। এই আগ্রহ ও ঝোঁকের ফল এই হয় যে, এই শাখায় তার দৃষ্টি ছিল গভীর ও প্রশস্ত। খৃস্টবাদ মোকাবিলার পাশাপাশি উক্ত কার্যক্রম তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন। এরই মাঝখানে কোনো কোনো বড় আলেমের সাথে তার মতপার্থক্য হয়। অবশ্য পরে তা মিটে যায়। হাজী ইমদাদুল্লাহ রহ. মক্কা থেকে মাওলানার নামে এক চিঠিতে এদিকে ইঙ্গিত করে লিখেন–

'স্মর্তব্য যে, স্নেহের রশিদ আহমদ মুহাদ্দিসে-গাঙ্গুহীর সাথে আপনার মনোমালিন্যের কোনো কারণ নেই। হ্যাঁ, কিছু মাসআলাগত মতপার্থক্যের কারণে দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। আগের মত চিঠিপত্র ও আসা-যাওয়া শুরু করলে তা পুরোপুরি মিটে যাবে। মাসআলার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম, মুজতাহিদ ইমামগণ ও মুহাক্কিক আলেমগণের মাঝেও মতপার্থক্য ছিল। কিন্তু এই কারণে বিন্দু পরিমাণও তিক্ততা হয়নি।' [মাকালা, আল জামিআর বরাতে, পৃ. ২৩]

মাওলানার উক্ত ফিকহী বয়ানসমূহের একটি পাণ্ডুলিপিও তৈরি হয়ে যায়। 'কিতাবুল মাসআলা' নামে এটি খানকাহে রাহমানীতে প্রসিদ্ধ ছিল।

মীলাদ-বিষয়ে একবার মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর সাথে আলোচনা হয়। মাওলানা বললেন, মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেব যে রকম মীলাদ পড়েন, সে রকম মীলাদের বিরোধী আমি নই। [প্রাগুক্ত]

মাওলানার কুতুবখানা

সাহারানপুর থেকে আসার পর তিনি কিতাব সংগ্রহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। ধীরে ধীরে বিশাল কুতুবখানা হয়ে যায়। মাওলানা রাহমানী উক্ত কুতুবখানার আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন- বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখযোগ্য প্রায় সকল আরবি কিতাব উক্ত কুতুবখানায় আছে। ফারসী ভাষার কিতাবাদির বেলায়ও একই কথা। যে-সব প্রতিষ্ঠিত আলেম উক্ত কুতুবখানা থেকে উপকৃত হয়েছেন, তাঁদের মতে, বিশাল-বিশাল ইসলামী গবেষণা কুতুবখানাটিতে বসে সম্পন্ন করা সম্ভব। বর্তমানেও আলেমরা আসেন এবং এটি থেকে উপকৃত হন, নিজেদের ইলমের পিপাসা মিটান। কুতুবখানাটি সম্পর্কে একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, অন্ততঃ হিন্দুস্তানের পূর্বাংশে লাখনৌ থেকে নিয়ে বাংলার শেষ সীমানা পর্যন্ত খোদাবখ্স খান লাইব্রেরী পাটনা ও নদওয়াতুল উলামার কুতুবখানা ছাড়া এত বিশাল কুতুবখানা দ্বিতীয়টি নেই, যেখানে ইলম পিপাসুরা নিজেদের পিপাসা মিটাতে সক্ষম হবে। [মাকালা, পৃ. ১৪]

মাওলানা ইদ্রিস নিগরামী মাওলানা মুহাম্মদ আলীরই ইঙ্গিতে 'তাযকিরায়ে উলামায়ে হাল' (সমকালীন আলেমদের জীবনী) নামক একটি গ্রন্থ রচনাবদ্ধ করেছিলেন।

এ বিষয়ে তিনি তাকে সবসময় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দিতেন। এক চিঠিতে তাকে লেখেন-

'আপনি অসুস্থ, তাই আমি গভীরভাবে শোকাহত। আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন। আমীন। জীবনীগ্রন্থে মাওলানা লুৎফুল্লাহর (আলীগড়ের বাসিন্দা) জীবনী এসেছে কিনা। এমন প্রসিদ্ধজনদের জীবনকথা না থাকলে অপূর্ণতা রয়ে যাবে। সুতরাং এমন মনীষীদের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেয়া উচিত। যেমন ফিরিঙ্গী মহলে গিয়ে মৌলভী নাসীম সাহেব সম্পর্কে জানুন। মৌলভী আব্দুল হক খায়রাবাদী সম্পর্কেও জেনে নিন। মোটকথা এদের জীবনকথা সামনে আসা খুবই দরকার।' [আল-জামেয়া রজব ১৩৫০ হিজরী]

উক্ত চিঠি দ্বারা চমৎকারভাবে জানা যায় যে, এ জাতীয় ইলমী কার্যক্রমের প্রতি মাওলানার কী পরিমাণ গুরুত্ব ছিল! তাঁর মেধা এসব বিষয়ে কত সুন্দর কাজ করত!

ইলমের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ জীবনের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত ছিল। শেষ বয়সে কিতাবাদি সংগ্রহের আগ্রহ তীব্র হয়ে গিয়েছিল। তিনি হিন্দুস্তানের প্রসিদ্ধ ইলমী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং নতুন প্রকাশিত কিতাবের খোঁজখবর রাখার চেষ্টা করতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

খৃস্টবাদ প্রতিরোধ

মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. খৃস্টবাদ প্রতিরোধে বিশাল খেদমত আঞ্জাম দেন। তাঁর সেই খেদমত পর্যালোচনার আগে ওই অবস্থার একটু বিবরণ পেশ করা দরকার যে প্রেক্ষাপটে তাকে এই মহান খেদমত আঞ্জাম দিতে হয়েছিল।

হিন্দুস্তানে খৃস্টান মিশনারি কার্যক্রমের সূচনা

হিন্দুস্তানে খৃস্টান মিশনারি কার্যক্রমের সূচনা ১৮১৩ সালে। সে সময় বৃটিশ এমপি উইলবার ফোর্সের চেষ্টায় হাউজ অব কমন্সে এ মর্মে একটি বিল পাস হয়, হিন্দুস্তানে খৃস্টধর্ম প্রচারের জন্য কেউ যেতে চাইলে তার অনুমতি আছে। এই বিল পাসের পর ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে খৃস্টান সংস্থা ও সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে দলে দলে পাদ্রী আসতে থাকলো হিন্দুস্তানে।

খৃস্টবাদ সম্প্রসারণের ফলে এই আনাগোনা শুধু বাড়তেই থাকলো। এই ধারাবাহিকতায় ১৯০০ সালের পূর্বে প্রায় ৪২টি মিশন স্থাপিত হয় হিন্দুস্তানে। প্রতিটি মিশন এক একটি ব্যাপক প্রতিষ্ঠান ছিল। এই পাদ্রীরা অত্যন্ত কৌশল ও সতর্কতার সঙ্গে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। তাদের জন্য সবধরনের সুযোগ-সুবিধা ছিল অবরিত। এটাকে তৎকালীন সরকার নিজেদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব বলে গণ্য করতো। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে তাদের এই মিশনারি কার্যক্রম কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়। তবে খৃস্টান সম্প্রদায়গুলোর পারস্পরিক বৈরিতা ও প্রতিযোগিতার কারণে পাদ্রীদের আনাগোনা বাড়তে থাকে। তাছাড়া তারা সঙ্ঘাত এড়াতে পুরো দেশকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। ফলে কাজ করতে গিয়ে তাদের পারস্পরিক কোনো বিভেদ দেখা যায়নি।

১৩১৩ হিজরীর শাওয়াল মাসে বেরেলিতে নদওয়ার একটি সম্মেলনে একজন এ বিষয়ে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পেশ করেন। মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ. এটি খুব পছন্দ করেন। ওই প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'ওই সময় খৃস্টান সম্প্রদায়গুলো পারস্পরিক সমঝোতায় গোটা হিন্দুস্তানকে ভাগ করে কাজ করতে থাকে। তাদের প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র ও এলাকা ভাগ করা ছিল। উদাহরণ

হিসেবে বলা যায়, পাঞ্জাবে স্কটল্যান্ডের এক পাদ্রী এবং রাজপূতসহ হিন্দু অধ্যুষিত প্রদেশগুলোতে আয়ারল্যান্ডের পাদ্রীরা কাজ করতো।'

ওই প্রবন্ধের আরেক জায়গায় লিখেছেন, 'পাদ্রীদের মিশনারি কার্যক্রম হিন্দুস্তানের প্রায় ২০ লাখ বর্গমাইলে বিস্তৃত ছিল। হিন্দুস্তানের এমন কোনো প্রদেশ ও জেলা বাদ ছিল না যেখানে মিশনারি কার্যক্রম ছিল না। প্রত্যেক মিশনের সঙ্গে ছিল গির্জা, হাসপাতাল, ছাপাখানা, মিল, কলকারখানা এবং খৃস্টবাদে দীক্ষাদানের স্কুল।'

ওই প্রবন্ধে বলা হয়েছে, ২৫০টি মিশন হিন্দুস্তানের বিভিন্ন শহরে কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। প্রবন্ধে কোন শহরে কতটি মিশনারি কার্যক্রম ছিল এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

খৃস্টানদের কর্মপদ্ধতি

খৃস্টানদের একেকটি মিশন ছিল তাদের দুর্গ। একদিকে সেখানে শেখানো হতো ধর্মীয় শিক্ষা। অন্যদিকে অর্থের বিনিময়ে খৃস্টবাদে দীক্ষিত করার সব ধরনের কৌশল কার্যকর ছিল। যারা খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করতো তাদের আর কোনো বিষয়ে ভাবতে হতো না। দারিদ্র্যের সুযোগে তারা লোকদেরকে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করতো। বিশেষ করে ইয়াতিম ও গরিব-দুস্থদের ছেলেমেয়েরা ছিল তাদের টার্গেটে। তাদের সব দায়-দায়িত্ব তারা নিতো। স্যার সাইয়িদ আহমদ খান 'বাগাওয়াতে হিন্দ' নামক গ্রন্থে ১৮৩৭ সালের দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, '১৮৩৭ সালের দুর্ভিক্ষের সময় যেসব ছেলেকে খৃস্টবাদে দীক্ষিত করা হয়েছে তাদের সব দায়িত্ব নিতো বৃটিশ সরকার। আর এভাবে দারিদ্র্য ও অনটনের ফাঁদে ফেলে তারা গোটা হিন্দুস্তানকে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।'

বৃটিশ সরকার মিশনারিগুলো পরিচালনা করতো। এতে কোনো কিছুর সংকট ছিল না। এই সহযোগিতার কারণে পাদ্রীদের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। তারা নির্বিঘ্নে ভারতীয়দের বিশেষ করে মুসলমানদের তাদের ধর্মে দীক্ষিত করার মিশন চালিয়ে যেতে থাকে। সরকার মিশনারিগুলোকে সহযোগিতা করার জন্য এমন কিছু আইন করেছিল যা মিশনারি কার্যক্রমের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৫৮ সালে প্রণীত একটি অ্যাক্ট অনুযায়ী কেউ ধর্মচ্যুত হলেও সে উত্তরাধিকার পেতো। কিন্তু পাদ্রীরা চিঠি দিয়ে জানালো, এখন গোটা হিন্দুস্তানে অভিন্ন প্রশাসন চলছে, টেলিগ্রাফের কল্যাণে সব জায়গায় একই খবর পৌছে। সুতরাং এখন সবার ধর্মও একটি হওয়া উচিত; আর তা হলো খৃস্ট ধর্ম।

মোটকথা, চার দিকে খৃস্টবাদের জয়জয়কার। গোটা দেশ তাদের গ্রাসে পরিণত হচ্ছিল। স্যার চার্লস ট্রিভিলিয়ন আইসিএইচ যিনি কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে গভর্নরও হয়েছিলেন; এক জায়গায় তিনি অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'আমার বিশ্বাস, আমাদের পূর্বসূরিরা যেভাবে একসঙ্গে সবাই খৃস্টান হয়ে গিয়েছিলেন এমনিভাবে এখনও সবাই একসঙ্গে খৃস্টবাদে দীক্ষিত হয়ে যাবে। দেশব্যাপী খৃস্টবাদের শিক্ষা পাদ্রী ও বইপত্র দ্বারা ছড়িয়ে পড়বে। এমনকি খৃস্টবাদি শিক্ষা সব সমাজে প্রভাব বিস্তার করবে। এতে হাজার হাজার লোক খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত হবে।'

পয়গামে মুহাম্মদীতে 'নুরুল আনওয়ার' নামক পত্রিকার ১৮৯০ সালের ২৩ আগস্ট সংখ্যার উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হয়েছে, 'দেশি পাদ্রীদের কোনো গোনায় ধরা হতো না। শুধু বিলেতের নয়শ পাদ্রী ছিল। তারা পুরোদমে খৃস্টধর্মের প্রচার-প্রসারে নিয়োজিত ছিল। এছাড়াও ৮০ জন সদস্যের একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ছিল যারা পাদ্রীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করতো।'

ওই সময়ে খৃস্টানরা যতটা তৎপর, কৌশলী ও সতর্ক ছিল; এর বিপরীতে মুসলমানরা ততটাই নির্জীব, অচেতন ও উদাসীন ছিল। তাদের দেখে মনে হতো, কোনো প্রভাবশালী দা'য়ী না এলে এবং খৃস্টবাদের খপ্পর থেকে মুসলমানদের বাঁচানোর চেষ্টা না করলে তাদের দীনের ওপর বেশিদিন টিকে থাকা সম্ভব হবে না।

মিশনারি সোসাইটি যারা দেশের সবখানে বিস্তৃত ছিল তারা এই প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, হিন্দুস্তানের সব হিন্দু ও মুসলমানকে খৃস্টবাদে দীক্ষিত করতে হবে। তারা হিন্দুদের জন্য এক পাদ্রী আর মুসলমানের জন্য ভিন্ন পাদ্রী নির্ধারণ করেছিল। পাদ্রীদের স্টাফে স্থানীয় খৃস্টানদের অবশ্যই যুক্ত করা হতো। তাদের কাজের ধরন ছিল এই যে, যাদের তারা টার্গেট করতো তাদের দুর্বল দিকটা আগে চিহ্নিত করতো। পরে সুযোগ বুঝে তাতে আঘাত হানতো।

এছাড়া তাদের আরেকটি কৌশলও ছিল। তারা হিন্দুদের অন্তরে মুসলমান বাদশাহদের সম্পর্কে এমন বিরূপ ধারণা জন্মাতো যে, তারা মুসলমানদেরকে চিরশত্রু মনে করতো। অন্যদিকে মুসলমানদের অন্তরে তাদের পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা জন্মিয়ে তথাকথিত গণতন্ত্রের মুখরোচক শ্লোগান পেশ করতো।

খৃস্টানদের প্রচার-প্রসারমূলক কাজে দুটি দিকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হতো। একটি হলো, রাসূলুল্লাহ সা. সম্পর্কে যুবকদের অন্তরে বিরূপ ধারণা ঢুকিয়ে

দেয়ার চেষ্টা করা হতো। এমনকি তাঁর নবুওয়াতের প্রতি (নাউযুবিল্লাহ) সন্দেহের বীজ বপন করে দেয়া হতো। দ্বিতীয় হলো, মুসলিম শাসকদের সম্পর্কে যাবতীয় বিষোদগার করে তাদেরকে গাদ্দার হিসেবে চিহ্নিত করতো। তাদের এই কূটচালের ফাঁদে পড়ে মুসলমানরাও সহজেই বিভ্রান্ত হতো এবং তাদের শাসকদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করতো। তারা এই অপপ্রচার এত দ্রুত ও শাণিতভাবে চালাচ্ছিল যে, যেসব স্কুল-কলেজে এসব বিষয় পড়ানো হতো সেখানে ধর্মীয় বিভ্রান্তি ও বিভাজন অবশ্যই সৃষ্টি হতো। এজন্য আল্লামা শিবলী নোমানী রহ. প্রণীত 'আওরঙ্গজেব' গ্রন্থটি যখন বের হলো তখন মুসলমানদের চেহারায় আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। তারা মনে করলেন, খৃস্টবাদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে একটি বড় হাতিয়ার মিলে গেছে।

কুতুবখানায়ে ইস্কান্দ্রিয়া সম্পর্কে প্রাচ্যবিদ ও পাদ্রীদের অভিযোগ ছিল, মুসলমানেরা তাদের ইলমি শত্রুতা এবং ধর্মীয় উন্মাদনার কারণে এত বড় একটি জ্ঞানভাণ্ডারকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আল্লামা শিবলী নোমানী রহ. তাঁর কিতাবে এই অভিযোগের জবাব অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও দালিলিক আঙ্গিকে দেন। এতে মুসলমানদের চোখ খুলে যায়। তাদের মনে হলো যেন চেহারার ওপর থেকে একটি অপবাদের খোলস দূর হয়ে গেছে। জিযিয়া করের ব্যাপারে তাদের অভিযোগ ছিল এটা ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের ওপর এক ধরনের অত্যাচার। আল্লামা শিবলী নোমানী রহ. তাঁর কিতাবে এ কথা প্রমাণ করেছেন জিযিয়া মূলত বিধর্মীরা ইসলামী রাষ্ট্রের যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে এর বিনিময়। এটা মোটেও তাদের ওপর জুলুম নয়। এগুলো হলো মিশনারি অপপ্রচারের কিছু চিত্র। তাদের অপপ্রচার ও প্রোপাগাণ্ডার মাত্রা আরো ব্যাপক বিস্তৃত ছিল।

মুনশি সফদর আলী ও এমাদুদ্দীন

ওই সময় মুনশী সফদর আলী ও পাদ্রী এমাদুদ্দীনের কিতাবাদি ও পুস্তিকা ব্যাপক হারে চলতো। তৎকালীন সংবাদপত্রেও তাদের লেখা গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হতো। তাদের একটি শ্লোগান ছিল, যতদিন পর্যন্ত কুরআন মজীদ বিদ্যমান, থাকবে ততদিন মুসলমানদের ওপর বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য তারা দুজন নবুওয়াতে মুহাম্মদী ও কুরআন মজীদকে তাদের প্রধান টার্গেট হিসেবে গ্রহণ করে। ১২৮৯ হিজরী এবং এর পরবর্তী বছরগুলোতে পাদ্রীদের বেশ সফলতা অর্জন হয়। অনেক মুসলমান তাদের শিকারে পরিণত হয়। মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানভী রহ. (ইন্তেকাল : ১৩০৯ হিজরী) এর পর এমন কোনো ব্যক্তি আসেননি যিনি এই ফেতনা নির্মূলে ময়দানে কাজ করবেন। এমন কেউ ছিল না যিনি ইলমী ও আমলী যোগ্যতা দ্বারা খৃস্টবাদের অসারতা প্রমাণ করবেন। তবে এই

সৌভাগ্যও নসিব হয় মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ.-এর। তিনি অত্যন্ত সার্থকভাবে পাদ্রীদের সব অভিযোগ ও অপপ্রচারের যথোপযুক্ত জবাব দিয়েছেন। এর দ্বারা দুর্বল ঈমানের মুসলমানদের অন্তর থেকে সব সন্দেহের অবসান হয়।

খৃস্টবাদ প্রতিরোধে মাওলানার সংগ্রামের সূচনা

খৃস্টবাদ প্রতিরোধে মাওলানা রহ.-এর বিশেষ মনোযোগের পেছনে একটি ঘটনা আছে। আলীগড়ে তিনি মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেবের তত্ত্বাবধানে ইলম হাসিল করছিলেন। এ সময় তিনি কয়েকজন ছাত্রকে পড়াতেন। ওই সময়ই তিনি একটি স্বপ্ন দেখলেন, রাসূল সা. তাকে বলছেন, 'এটা তো বসে থাকার সময় নয়, জিহাদ কর।'

'কামালাত' গ্রন্থের লেখক লিখেছেন, 'ওই স্বপ্নের পরই এই ঘটনা ঘটলো। একবার আলীগড় মাদরাসার এক তালিবুল ইলম যে মুখতাসারুল মাআনী কিতাব পড়তো, সে পাদ্রী এমাদুদ্দীন ও খৃস্টানদের বইপত্র দেখলো। এতে পবিত্র ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে তার অন্তরে কিছু বিভ্রান্তি ও সন্দেহের সৃষ্টি হলো। একদিন সে জামে মসজিদে বসে সঙ্গী ছাত্রদের কাছে কিছু প্রশ্নের জবাব চাইলো। এ সময় দুজন ছাত্র যারা মাদরাসায় খুব ভালো মানের ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিল তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। তারা কুরআনে কারীমের অলঙ্কার ও সাহিত্যপূর্ণতার আঙ্গিকে কথা বলতে থাকলো। পাদ্রী এমাদুদ্দীন লিখেছেন, হযরত আলী অনেক বড় বাগ্মী ছিলেন। তার লিখনী কুরআনে কারীমের মতো (নাউযুবিল্লাহ)। মাকামাতে হারিরী নামক কিতাবের ভাষাও কুরআনে কারীমের চেয়ে উন্নত (নাউযুবিল্লাহ)। এসব বিষয়ে ওই দুই ছাত্র বিতর্ক করছিল। কিন্তু তারা কোনো সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলো না।

এক পর্যায়ে ওই দুই শিক্ষার্থী বললো, কুরআনে কারীম আরবি ভাষার গ্রন্থ। আমরা এবং তোমার এমাদুদ্দীন কেউ আরবি সাহিত্যিক নই। এক্ষেত্রে এমন কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্য দরকার যিনি আরবি সাহিত্যিক। পরে তারা দ্বারস্থ হলো মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ.-এর। তিনি ছুটির দিনে বসে ৯/১০টি দলীল লিখে দিলেন। এতে ওই ছাত্র তার জবাব পেয়ে সন্তুষ্ট হলো এবং ঈমানের ওপর টিকে থাকলো।

মনশুরে মুহাম্মদী

উপরোল্লিখিত ঘটনার দ্বারা মাওলানা রহ.-এর খৃস্টান প্রতিরোধ কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। পরে এক্ষেত্রে তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন। ১২৮৯ হিজরীতে এই উদ্দেশে তিনি ভারতের কানপুরে 'মনশুরে মুহাম্মদী' নামে একটি

পত্রিকা প্রকাশ করেন। এতে দলীল-প্রমাণ সহকারে খৃস্টবাদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করেন। কিন্তু পাদ্রীরা এর কোনো একটি বিষয়েও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার দুঃসাহস দেখায়নি। ওই পত্রিকার কথা উল্লেখ করে মাওলানা রহ. তাঁর কিতাব 'আয়নায়ে ইসলাম' এর মধ্যে লিখেছেন, 'মনশুরে মুহাম্মদী পত্রিকায় অধিকাংশ প্রবন্ধ খৃস্টবাদ প্রতিরোধে। প্রায় দশ বছর হয়ে গেল। এখনও মুনশী সফদর আলী বা কোনো খ্রিস্টান পাদ্রী এর সন্তোষজনক কোনো জবাব দিতে পারেনি।'

এই পত্রিকাটি ৪/৫ বছর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে খেদমত আঞ্জাম দেয়ার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। এটা ওই সময় ছিল যখন মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ. ওই সময়ের বিখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী রহ.-এর কাছে তাকমিলে হাদিসের জন্য গিয়েছিলেন। এজন্য এই পত্রিকাটির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আর সম্ভব হয়নি। তবে এই পত্রিকাটি দ্বারা যে কী উপকার হয়েছে তা বলে শেষ করার মতো নয়। এই পত্রিকার মাধ্যমে মুনশী সফদর আলী ও এমাদুদ্দীন উভয়কে বিতর্কের জন্য চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারা প্রতিবারই চুপ থেকেছে। একবারও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বিতর্কে আসার মতো দুঃসাহস দেখায়নি। এর বিরাট প্রভাব পড়ে তৎকালীন মুসলমানদের অন্তরে। যেসব মুসলমান সন্দেহ ও সংশয়ে নিপতিত ছিলেন তাদের ঈমানে দৃঢ়তা আসে। মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ. এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য অনেককে তৈরি করেছেন। তাদের কেউ কেউ পরবর্তী সময়ে খৃস্টবাদের প্রতিরোধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন।

একটি বিস্ময়কর বিষয় হলো, যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানভী রহ.-এর সহযোগিতার জন্য ডা. উজির খানকে পাঠিয়েছিলেন, তিনি পাদ্রী ফান্ডিসকে তার বক্তব্য ও লিখনি দ্বারা শায়েস্তা করেছেন। এমনিভাবে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ.-এর জন্য আল্লাহ তাআলা শেখ মাওলানা বখশকে দাঁড় করিয়ে দেন। তিনি তৎকালীন পাদ্রীর সঙ্গে মোকাবেলা করেন। শেখ মাওলানা বখশের ইলমী গভীরতা এবং জানাশোনার বিস্তৃতির কথা কিছুটা আঁচ করা যায় 'মুরাসালাতে মাজহাবী' কিতাবের দুটি খণ্ড দ্বারা; যাতে তাঁর সঙ্গে পাদ্রীর বাহাছের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

ওই কিতাবে শেখ মাওলানা বখশ একটি বিষয় অকপটে স্বীকার করেছেন যে, তার সব ফয়েজ ও বরকতের উসিলা হলেন মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ.। তিনি লিখেছেন, 'মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানভী রহ.-এর পরে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ. ছাড়া আর কাউকে এ বিষয়ে জোরালো পদক্ষেপ নিতে দেখিনি। খৃস্টবাদ প্রতিরোধে মাওলানা মুঙ্গেরী রহ.-এর লিখনি খুবই

বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তিনি প্রতিটি বিষয়ে এমন দালিলিক ও পূর্ণাঙ্গ আলোকপাত করেছেন যা যে কেউ পড়লে আশ্বস্ত হতে বাধ্য।'

কানপুরে ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠা

খৃস্টান মিশনারীদের দ্বিতীয় কৌশল ছিল ইয়াতিম ও গরিব-দুস্থ শিশুদের টার্গেট করা। এক্ষেত্রে তাদের টার্গেট মিস হতো না। খুবই সহজেই কাউকে খৃস্টবাদে দীক্ষা দেয়া যেতো। ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠা করে শিশুদের দিব্যি খৃস্টবাদে দীক্ষিত করছিল পাদ্রীরা। এজন্য এর বিপরীতে এ ধরনের ইয়াতিমখানা ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ার কোনো বিকল্প ছিল না। এজন্য মাওলানা মুঙ্গেরী রহ. তাঁর কর্মস্থল কানপুরে একটি ইসলামি ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এতে মুসলমান শিশুদের শিক্ষাদীক্ষার পাশাপাশি তাদের আর্থিক প্রয়োজনাদিও পূরণ করা হতো। তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে কতটুকু গুরুত্ব দিতেন তা কিছুটা আঁচ করা যায় ওই সময় মাওলানা হাবিবুর রহমান খান শেরওয়ানীকে লেখা তাঁর একটি পত্র থেকে।

কুরআনে কারীমের ওপর খৃস্টানদের একটি প্রশ্নের জবাব

পাদ্রীরা কুরআনে কারীমের ওপর এই অভিযোগ আরোপ করতো যে, হযরত ওসমান রা.-এর আগে কুরআনে কারীমের বিশেষ কোনো বিন্যাস ছিল না। এর কোনো বিশ্বাসযোগ্য পাণ্ডুলিপি বা নুসখাও সংরক্ষিত ছিল না। পরবর্তী সময়ে এটি বিন্যাস করা হয়। তা সত্ত্বেও এটা বলা কিভাবে সঠিক হবে যে, এই কুরআনে কারীমের প্রতিটি হরফ ও বিন্দু সংরক্ষিত, তাতে কোনো বিকৃতি আসেনি। পশ্চিমা চিন্তাধারায় প্রভাবিত অনেক মুসলমানও এ ধরনের মত প্রকাশ করে। পাদ্রীদের অভিযোগকে তারা খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। এসব বিষয় সামনে রেখে মাওলানা মুঙ্গেরী রহ. একটি গবেষণাধর্মী পুস্তিকা রচনা করেন। যার নাম দেন 'আল বুরহান লিহিফাজাতিল কুরআন'। এই পুস্তকটি তোহফায়ে মুহাম্মদী নামক প্রেস থেকে ছাপা হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, সেখান থেকে এর মূল পাণ্ডুলিপিটি উধাও হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ক বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা রহ. একটি বিস্তারিত কিতাব রচনা করেন। এটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেক তত্ত্ববহুল ও গ্রহণযোগ্য একটি কিতাব। কুরআনে কারীম বিষয়ে পড়াশোনায় প্রত্যেকের উচিত কিতাবটি থেকে উপকৃত হওয়া। ওই কিতাবের একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে, যা 'মাসহাফে সিদ্দিক' নামে অধ্যায় ভাগ করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, শুধু ওসমানী যুগেই নয় বরং সিদ্দিকে আকবর রা. ও হুজুর সা.-এর যুগেও কুরআনে কারীম অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সিনা ও লিখিত উভয়ভাবে সংরক্ষিত ছিল। এর

প্রতিটি আয়াত লিখিত ছিল এবং বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের কাছে আলাদাভাবে সংরক্ষিত ছিল। হযরত আবু বকর রা. লিখিত অংশ নিজের কাছে সংরক্ষণ করেন। বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের সংরক্ষিত অংশগুলোও তিনি প্রত্যয়ন করেন। মাওলানা রহ. এ প্রসঙ্গে ওই কিতাবে লিখেছেন,

'এর প্রমাণ অনেক দালিলিকভাবে হাদিস ও ইতিহাসের কিতাবাদিতে রক্ষিত আছে। রাসূল সা.-এর ওহী লেখার জন্য যাঁরা নির্দিষ্ট ছিলেন তাদের সংখ্যা ১৫/২০ জনের কম নয়। আর এটাও প্রমাণিত যে, শেষ দিকে হযরত জায়েদ বিন সাবেত রা. বেশি লিখতেন। জায়েদ রা.-এর ছেলে খারেজা রা. বলেন, কয়েকজন লোক আব্বা সম্পর্কে জানতে এলেন। আমার আব্বা জবাবে বলেন, আমার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি হলো আমি রাসূল সা.-এর প্রতিবেশী ছিলাম। এছাড়া আমি রাসূল সা. কর্তৃক নির্ধারিত ছিলাম, যখনই তাঁর কাছে ওহী আসতো আমাকে ডেকে পাঠাতেন। আমি এসে লিখে দিতাম। আর এটাও মনে রাখতে হবে, কখনও এমনটা হয়নি যে, এতে কোনো ভুলের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কেননা কাতেব ওহী লেখার পর তা রাসূল সা.কে শোনাতেন, যাতে রাসূল সা. শুনে শব্দে শব্দে ঠিক করে দিতে পারেন। পাশাপাশি এর মর্মার্থও যেন ভালোভাবে বোঝা যায়। কুরআনে কারীমের লিখিত এই সব টুকরো সাহাবায়ে কেরাম নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করতেন।

মোটকথা, এভাবে সমস্ত কুরআনে কারীম রাসূল সা. লিখিয়ে নিতেন। রাসূল সা.-এর যুগে কুরআনে কারীম লিখিত ও সংরক্ষিত হওয়ার কথা অনেক হাদিস ও ইতিহাস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এমনকি খোদ আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে এ বিষয়ে বলেছেন। রাসূল সা.-এর গুণের কথা বলতে গিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে–

يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً.

'ওই রাসূল যিনি তোমাদের ওপর পবিত্র সহীফা পাঠ করেন।' সহীফা ওই কাগজ বা এ জাতীয় বস্তুকে বলা হয় যাতে লেখা হয়। 'পবিত্র' শব্দ দ্বারা এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, ওই সহীফা সব অপবিত্রতা থেকে মুক্ত। এর দ্বারা এ কথা স্পষ্ট যে, এই লিখিত রূপ ওই পবিত্র সত্তার কালাম যাঁর কোনো দোষ-ত্রুটি নেই। ওই পবিত্র সহীফা কিসের ওপর লেখা হয়েছিল এর বিস্তারিত বিবরণ আল ইতকান ও ফাতহুল বারীতে উল্লেখ আছে। বিভিন্ন বস্তুর ওপর কুরআন লেখা হয়েছে। ওই সময় পর্যন্ত কাগজের প্রচলন পুরোপুরি শুরু হয়নি।

যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে লেখাতেন, তা ছাড়াও সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা লিখতে পারতেন তাঁরাও লিখতেন। বেশির ভাগই রাসূল সা.-এর যবান মুবারক হতে শুনে হুবহু তাই-ই লিখে ফেলতেন। এমনও হয়েছে যে, কেউ তার স্মরণ শক্তির ওপর ভিত্তি করেও লিখেছেন। কেউ কেউ তো রাসূল সা.-এর লেখানো বিষয়কে নকল করেছেন।

তবে এসব লিখনী-ই বিক্ষিপ্ত এবং অবিন্যস্ত ছিল। যে সকল সাহাবা সরাসরি রাসূল সা. থেকে কুরআন শিখেছিলেন তারা সুবিন্যস্তভাবেই ইয়াদ করেছিলেন। কিন্তু রাসূল সা.-এর ইন্তেকালের পরে সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন কারণে এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। এমন কি হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সা.-এর ইন্তেকালের পরে যখন তিনি মানুষের মাঝে বিভিন্ন ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখতে পেলেন, তখন তিনি কসম করে বসলেন যে, পূর্ণ কুরআনুল কারীম না লেখা পর্যন্ত আমি আমার পিঠ হতে চাদর উঠাব না। তিনি ঘরে গিয়ে বসে গেলেন এবং নিজের ইয়াদ অনুসারে পূর্ণ কুরআন লিখে ফেললেন। আবুল হাসান বাগদাদী বলেন, এই কুরআন শরীফ হযরত জাফর রা.-এর বংশধরদের মধ্যে ছিল। তিনি আরো বলেন, হযরত আলী রা.-এর হাতে লিখিত একটি কুরআন আমি আমার যুগেও দেখেছি। যার প্রথম দিকের কিছু পৃষ্ঠা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এটা হযরত হাসান রা.-এর বংশধরদের মধ্যে উত্তরাধিকারে সম্পদ হিসেবে গণ্য হত। আবুল হাসান ৩৩৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতেও হযরত আলী রা.-এর লিখিত কুরআন বিদ্যমান ছিল।

এছাড়াও হযরত আলী রা.-এর খাদেম খালেদ ইবনে হাইয়াজ একজন ভালো লিপিকার হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনিও কুরআনুল কারীম লিখতেন। আল্লামা ইবনে নাদীম চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্ধে লিখেছেন যে, আমি মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন বাগদাদীর গ্রন্থাগারে খালেদ ইবনে হাইয়াজের লিখিত কুরআন দেখেছি। খালেদ যেহেতু হযরত আলী রা.-এর খাদেম ও নিত্য সঙ্গী ছিলেন সুতরাং বুঝা যায় যে, তার কুরআন হযরত আলী রা.-এর কুরআনের অনুরূপ ছিল।

তেমনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. প্রমুখ কুরআন লিখতেন এবং তাদের কপি নকল করা হত।

আল্লামা ইবনে নাদীম লিখেছেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কপি হতে নকলকৃত একটি কপি স্বচক্ষে দেখেছি এবং এটা দ্বিতীয় শতাব্দীতে লেখা হয়েছিল।

উক্ত আল্লামা এও লিখেছেন যে, ফযল ইবনে শাযান বলেন, আমার একজন নির্ভরযোগ্য এবং প্রাজ্ঞ বন্ধু বলেন, 'বসরার একটি গ্রামে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল মালেক আনসারীর নিকট একটি কুরআন মজীদ ছিল। তিনি আমাকে তা নিয়ে এসে দেখালেন যে, সেটা হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা.–এর লিখিত ছিল। এই সব কপি প্রত্যক্ষকারীরা বিদ্যমান কুরআন মজীদের সাথে সূরাগুলোর বিন্যাসে ছাড়া অন্য কোন পার্থক্য বর্ণনা করেন না।

মোটকথা, হাজারো বছর ধরে বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের লিখিত কুরআনে কারীমের অস্তিত্বের কথা প্রমাণিত। তবে ওই পাণ্ডুলিপি সাহাবায়ে কেরাম ব্যক্তিগত স্মৃতিশক্তির আলোকে প্রস্তুত করেছিলেন। হযরত আবু বকর রা. তাঁর খেলাফতকালে এর চেয়েও উত্তম পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তিনি নির্দেশ দিলেন নানা জায়গায় ছড়ানো-ছিটানো কুরআনে কারীমের অংশবিশেষ একত্র করতে। যেসব সাহাবায়ে কেরামের সিনায় কুরআনে কারীম রক্ষিত ছিল অথবা যাদের স্মরণশক্তির প্রসিদ্ধি ছিল তাদের কাছ থেকে কুরআনকে একত্র করেন। তাদের মধ্যে প্রথমসারির সাহাবায়ে কেরাম হলেন-হযরত জায়েদ বিন সাবেত, উবাই বিন কা'ব, উসমান, আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন ওমর, আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, আব্দুল্লাহ বিন আস-সায়েব, খালেদ বিন ওলিদ, তালহা, সা'দ, হুযাইফা, সালেম, আবু হুরায়রা, আবু দারদা, আবু মূসা আল আশআরী, আমর ইবনুল আস প্রমুখ রাযিয়াল্লাহু আনহুম। তাঁরা সবাই ওমর রা.-এর কাছে গিয়ে একত্রিত হন। জায়েদ বিন সাবেত রা.কে তাদের সভাপতি গণ্য করা হয়। সেখানে আলোচনা হয় কুরআনে কারীম কিভাবে জমা করা যায় এ বিষয়ে। সিদ্ধান্ত হয় যে, মসজিদে নববীতে ঘোষণা করে দেয়া হবে এবং যাদের কাছে লিখিত যতটুকু রক্ষিত আছে তা জমা দেবে। মসজিদে নববীতে হযরত ওমর রা. এ ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, যার কাছে কুরআনে কারীমের কোনো অংশ, কোনো সূরা অথবা কোনো আয়াত লিখিত আছে তারা যেন এটা জমা দেন। মদিনার বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো হয় হযরত বেলাল রা.কে। তিনি গিয়ে সব সাহাবায়ে কেরামকে জানিয়ে দেন, যার কাছে কুরআনে কারীমের যে অংশ রক্ষিত আছে তা যেন জমা দেন। এই সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যেকেই ছিলেন পুরো কুরআনে কারীমের হাফেজ। তা সত্ত্বেও এত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, কোনো একটি দলের কথাতেও নির্ভর করা হয়নি; বরং মুখস্থ ও লিখিত দুটির সমন্বয়ে কুরআনে কারীম সংরক্ষণ করা হয়। হযরত জায়েদ রা. ওই জামাতে কিছুটা স্বতন্ত্র ছিলেন। মুখস্থশক্তি, কাতেবে ওহী হওয়া এবং সুন্দর লিখনির জন্য তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ। এজন্য সিদ্দিকে আকবর রা. তাঁকে নির্দেশ

দিলেন তুমি লেখ। এছাড়া সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা ভাষাবিদ ও বিচক্ষণ ছিলেন তাদেরকেও এ কাজে যুক্ত করা হয়। সহীহ বুখারী শরীফে এ ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ নেই। এজন্য বর্ণনাকারী সংক্ষেপে জায়েদকে নির্দেশ দেয়া এবং তা একত্র করার বিষটি উল্লেখ করেছেন।

খৃস্টবাদ প্রতিরোধে মাওলানার লিখনী

খৃস্টবাদ মোকাবেলায় সম্ভবত মাওলানা মুঙ্গেরী রহ.-এর প্রথম লিখনি 'মিরয়াতুল ইয়াকীন'। মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানভী রহ.-এর কিতাব 'এজাজে ঈসভী' এর মোকাবেলায় 'হেদায়াতুল মুসলিমীন' লিখেছিলেন পাদ্রী এমাদুদ্দীন। সেখানে অর্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশ অভিযোগের জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছেন। 'এজাজে ঈসভী' যখন লেখা হয় তখন প্রসিদ্ধ পাদ্রী ফেনডার জীবিত ছিলেন। কিন্তু তিনি এর জবাব দিতে পারেননি। এরপর প্রায় ১৪ বছর পর্যন্ত কোনো পাদ্রী এ বিষয়ে কলম ধরার সাহস পাননি। ১৮৬৮ সালে পাদ্রী এমাদুদ্দীন এর জবাব লেখেন। এরপর বিভিন্নজন বিভিন্ন সময় বিচ্ছিন্নভাবে এর বিরুদ্ধে লিখেছেন। তবে কেউই তার বইয়ের পুরোপুরি জবাব দেননি। হয়ত উলামায়ে কেরাম এটাকে খুব গুরুত্বের সাথে নেননি। মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ.ই প্রথম পূর্ণাঙ্গরূপে প্রমাণ করেছেন যে, খৃস্টান বিজ্ঞরা নিজেরাই এ কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, ইঞ্জিলের বিকৃতি ঘটেছে। আর মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানভী রহ. যা কিছু লিখেছেন তা একদম সঠিক।

খৃস্টবাদের ইতিহাস অধ্যয়ন

খৃস্টবাদ সম্পর্কে মাওলানা মুঙ্গেরী রহ. অনেক পড়াশোনা করেছেন। অনেক বিষয় যা পাদ্রীদেরও অজানা তাও তিনি জানতেন। অনেক ক্ষেত্রে খৃস্টবাদ সম্পর্কে তার জানাশোনা খৃস্টান পাদ্রীদের জানাশোনার চেয়ে বেশি ছিল। এমাদুদ্দীন তার কিতাবের এক জায়গায় লিখেছিলেন, 'গ্রোটেস কোনো প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ছিলেন না। বরং কেউ এটাও জানতো না যে, তিনি কে ছিলেন।'

মাওলানা মুঙ্গেরী রহ. এর উত্তরে লিখেছেন, 'গ্রোটেস ওই ব্যক্তি যার জীবনী কয়েকজন ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করেছেন। চার্লস হোল বায়োগ্রাফিক্যাল ডিকশনারিতে লেখা হয়েছে, গ্রোটেসের জীবনীর ওপর গুটেন বার্গ ১৬৫২ সালে একটি বই লেখেন। আর বার্গনি ১৭৫৪ সালে এবং মার্গিয়া ১৬৫৪ সালে বই লেখেন। এখানে বিবেচনার বিষয় হলো, গ্রোটেস কত প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। অনেকেই তার জীবনের ওপর কলম ধরেছেন। অথচ পাদ্রীর অজ্ঞতা দেখুন, তিনি বলছেন গ্রোটেস কোনো প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বা জ্ঞানী ছিলেন না।'

এটি মাত্র একটি উদাহরণ। এছাড়াও মাওলানা রহ.-এর অন্য লেখনিগুলোও এ রকম তথ্যভিত্তিক। প্রতিটি স্থানে তিনি ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপর আলোচনা করেছেন।

আয়নায়ে ইসলাম

মাওলানা রহ.-এর দ্বিতীয় লিখনি হলো 'আয়নায়ে ইসলাম'। তিনি হায়দারাবাদে থাকতে ১২৯৭ হিজরীতে এই কিতাবটি রচনা করেন। এটি মূলত মুনশী সফদর আলীর কিতাব 'নিয়াজনামা' এর জবাবে লেখা। মুনশী সফদর আলী অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এটাও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, শরীয়ত দুই ধরনের। একটি হলো আখলাকি, আরেকটি হলো পরম্পরা যুক্ত। পরম্পরায় প্রাপ্ত শরীয়তের চেয়ে আখলাকি শরীয়ত উত্তম। যে কাজ নিজেই ভালো বা মন্দ এটাকে বলে শরীয়তে আখলাকি। আর যে কাজ ভালো বা মন্দ নয় বরং আল্লাহ তাআলা এটাকে ভালো বা মন্দ এবং হালাল ও হারাম হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, তা হলো পরম্পরা বা প্রথাগত শরীয়ত।

এরপর তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, হযরত মূসা আ.কে দেয়া হয়েছিল প্রথাগত শরীয়ত। এজন্য ওই সময়ের লোকজন শরীয়তে আখলাকির ধারক ছিলেন না। যখন মানুষেরা এ স্তরে পৌঁছে গেল এবং এর যোগ্যতা অর্জন করলো তখন হযরত মাসীহ আ.কে শরীয়তে আখলাকি দেয়া হলো। সুতরাং এখন এর কী কারণ আছে যে, কুরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে সেই প্রথাগত শরীয়তের দাওয়াত দেয়া হচ্ছে যা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।

মাওলানা মুঙ্গেরী রহ. এর দালিলিক জবাব দিয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'এই অভিযোগগুলো কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলোর প্রমাণ না হবে ততক্ষণ এই অভিযোগ উত্থাপন করা অজ্ঞতার শামিল। প্রথম বিষয় হলো, মসীহ আ. শরীয়তে মূসাকে রহিত করে দিয়েছেন। অন্যথায় এটা কিভাবে প্রমাণ হবে যে, শরীয়তে আখলাকির কোনো প্রয়োজন নেই। তা আপনার কথা বা আপনার কোনো নেতার কথার দ্বারা শরীয়তের নির্দেশ রহিত হয় না। দ্বিতীয় বিষয় হলো, হযরত মাসীহ আ.কে যে শরীয়তে আখলাকি দান করা হয়েছে তা হযরত মূসা বা অন্য কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। অন্যথায় এটার কী অর্থ যে, লোকেরা তা বহন করেনি আর মসীহ আ. আখলাকি শরীয়ত বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় বিষয় হলো, শরীয়তে আখলাকি বলতে কুরআন হাদিসে কিছু নেই। চতুর্থ বিষয় হলো, এটা প্রমাণ করতে হবে যে, হাজারো বছর পর্যন্ত

দুনিয়ার সমস্ত লোক অযোগ্য ছিল এবং তারা শরীয়তে আখলাকি ধারণ করতে পারেনি। একমাত্র মসীহ আ.-এর যুগের লোকেরাই তা ধারণের যোগ্য হয়।'

মাওলানার লিখনপদ্ধতি

মাওলানা মুঙ্গেরী রহ.-এর লিখনির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, খৃস্টবাদের ইতিহাস ও তাদের দলিলাদি দ্বারা এসবের খণ্ডন করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর পড়াশোনার পরিধি অনেক বিস্তৃত ছিল। পাশাপাশি তাঁর চেষ্টা ছিল, শুধু খৃস্টবাদকে ঘায়েল করাই নয় বরং ইসলামকেও প্রভাবক আঙ্গিকে তাদের সামনে তুলে ধরা। এর মাধ্যমে ইতিবাচক প্রভাব পড়তো।

কুরআন ও হাদিসের ব্যাপারে খৃস্টানদের একটি বিশেষ অভিযোগ হলো, এর শিক্ষা খৃস্ট ধর্ম থেকে আহরণ করা হয়েছে। মাওলানা মুঙ্গেরী রহ. এ ব্যাপারে একজন খৃস্টান আলেম মুরিদাতের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তিনি ২০ বছর পর্যন্ত খৃস্টধর্মের বলিষ্ঠ প্রচারক ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি এ ধর্ম ত্যাগ করেন। ১৮৬৪ সালে একটি বই লেখেন যাতে তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, ইঞ্জিলের বিষয়বস্তু মূর্তিপূজার ওপর রচিত গ্রন্থ থেকে নির্গত। এ কথা লেখার পর মাওলানা মুঙ্গেরী রহ. বলেন, ধর্মত্যাগীর এই দৃষ্টিভঙ্গি যদি ভুল হয় (আর এটা ভুল হওয়া নিশ্চিত) তাহলে রাসূল সা.-এর সম্পর্কে এ কথা কিভাবে মেনে নেয়া যাবে যে, তিনি তওরাত ও ইঞ্জিল থেকে উপকৃত হয়েছেন। কারণ রাসূল সা. তো ছিলেন নিরক্ষর; আর মাসীহ আ. ছিলেন শিক্ষিত। তিনি তো কিতাবাদি পড়তে পারতেন।

মাওলানা রহ.-এর লিখনির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, খৃস্টবাদ খণ্ডনের পাশাপাশি তিনি ইসলামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও পেশ করতেন। সামান্য আনুসঙ্গিকতা থাকলে তিনি ইসলামী ব্যবস্থার উপকারের কথা স্পষ্ট করতেন। এই কিতাবের এক জায়গায় মুনশী সফদর আলীর এই অভিযোগের জবাব দিয়েছেন যে, শরীয়তে মাসীহে ইবাদত ছিল দুআর সমার্থক। আর ইসলাম প্রথাগত ধরণগুলো অবলম্বন করেছে। এজন্য ঈসা মসীহের শরীয়ত আখলাকি আর ইসলামী শরীয়ত হলো প্রথাগত। এর জবাব মাওলানা রহ. ওপরে দিয়েছেন। কিন্তু এই প্রকাশ্য আমল এবং দৈহিক কর্মকাণ্ডের কথা ব্যাখ্যা করে এগুলোর প্রকৃতি ও কারণগুলোর ওপর আলোকপাত করেন। এর গূঢ়ার্থ ও তাৎপর্যের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'আমালে জাহেরি ও আমালে জিসমানী মশকের দ্বারা রূহের ওপর এর প্রভাব পড়ে। যেমনিভাবে হাত-পা দ্বারা মানুষ কাজ করে এমনিভাবে এর একটি প্রভাব অন্তরের পড়ে। উদাহরণস্বরূপ কাউকে কোনো সম্পদ বণ্টন বা কোনো আরাম

দেয়ার খেদমত সোপর্দ করা হলো। সে কোনো রাখঢাক ছাড়াই খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করলো তখন অবশ্যই তার অন্তরে একটি প্রভাব পড়বে। এর কারণে তার অন্তরের উন্নতি হবে। এমনিভাবে কোনো ব্যক্তিকে যদি মারধরের দায়িত্ব দেয়া হয় তাহলে অবশ্যই এর একটি প্রভাব তথা কঠোরতা তার অন্তরে জায়গা করে নেবে।'

এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করার পর তিনি লিখেছেন, 'কোনো ব্যক্তি বাহ্যিক অনুশীলনের প্রভাবের কথা অস্বীকার করতে পারেন না। তা সত্ত্বেও ইবাদত ও শারীরিক কসরতের কথাকে নিষ্ফল বলাটা কি সঠিক হলো? অথচ এর একটি উদ্দেশ্য আছে এবং এর প্রভাব অন্তরে বিস্তৃত হয়।'

তারানায়ে হেজাজী ও দফয়ে তালবিসাত

মাওলানা মুঙ্গেরী রহ.-এর একটি কিতাব 'তারানায়ে হেজাজী' যা তিনি এমাদুদ্দীনের কিতাবের জবাবে লিখেন। এটি প্রকাশিত হয় ১২৯৫ হিজরীতে। পাদ্রী এমাদুদ্দীন ও লক্ষ্ণৌর মুজতাহিদ সাহেবের মধ্যে ১৮৭১ সালে একটি লিখিত বিতর্ক হয়েছিল। এটাকে এক খৃস্টান 'নাগমায়ে তনবুরি' নামে প্রকাশ করে। পাশাপাশি এতে কিছু প্রশ্নও জুড়ে দেয়া হয়। ওই কিতাবের জবাবে রচনা করা হয় তারানায়ে হেজাজী। এতে মাওলানা রহ. জিহাদের ব্যাপারে ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি, এর বিপরীতে খৃস্টানদের উত্থাপিত অভিযোগের জবাব, নবুওয়াতে মুহাম্মদের প্রামাণিকতা, ইসমতে আম্বিয়া, কুরআন মাজিদের তাওরাত ও ইঞ্জিল থেকে নির্গত না হওয়া এ ধরনের বিভিন্ন বিষয়ে দালিলিক আলোচনা করেন।

মাওলানা রহ.-এর আরেকটি কিতাব হলো দফয়ে তালবিসাত। এটা ছিল ওই পাদ্রীর লেখা 'তাকলিয়াত' এর জবাব। এতে মুহাম্মদী নবুওয়াতের প্রামাণিকতা এবং ইঞ্জিলের বিকৃতির ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। ১৩০২ সালে কিতাবটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ. তার লেখা দুটি কিতাবের ব্যাপারেই পাদ্রী এমাদুদ্দীনের কাছ থেকে জবাব চান। এমনকি সংবাদপত্রে এই ঘোষণা দিয়ে দেন যে, যারা এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন তাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে। কিন্তু কেউই জবাব দিতে সাহস করলো না।

এরপর মাওলানা রহ. 'সাতেউল বুরহান', 'বারাহিনে কাতিয়া' লেখেন। এতে ধারাবাহিকভাবে কুরআনে কারীমের কালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার প্রমাণ এবং খৃস্টানদের আকায়েদের বিভ্রান্তির কথা তুলে ধরেন।

পয়গামে মুহাম্মদী

খৃস্টবাদ প্রতিরোধে মাওলানা মুঙ্গেরী রহ.-এর সবচেয়ে বড় কীর্তি যাকে মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানভী রহ.-এর 'ইজহারে হক' অথবা 'এজাজে ঈসভী' এর সঙ্গে তুলনা করা চলে; সেটি হলো 'পয়গামে মুহাম্মদী'। কিতাবখানা তিনি সফদর আলীর নিয়াযনামা ও পাদ্রী ঠাকুরদাসের 'আদমে জরুরতে কুরআন'–এর জবাবে লিখেছিলেন। প্রথম কিতাবটির ব্যাপারে হিন্দুস্তানের খৃস্টানরা গর্বিত ছিল। উলামায়ে কেরামের মধ্যে অনেকেই এর জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাদের কারো কাজ পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছেনি। এর কারণে মুসলমানদের মধ্যে একটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছিল। এমনকি সাধারণ মুসলমানরা উলামায়ে কেরামের কাছে গিয়ে এর ওপর কলম ধরতে অনুরোধ জানাতেন।

মাওলানা রহমতুল্লাহ ও ডা. ওজির খান ওই সময় মক্কা মুয়াজ্জমায় ছিলেন। তখন মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল এই উদ্দেশ্যে মক্কায় গেলেন যাতে মাওলানা কিরনভী রহ.-এর কাছ থেকে বড় কোনো সহযোগিতা পাওয়া যায়। কিন্তু এতেও তেমন কোনো সুফল আসেনি। পেশোয়ারের একজন প্রসিদ্ধ আলেম এ ব্যাপারে ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনিও এই খেদমত আঞ্জাম দিতে পারেননি। কিছুসংখ্যক উলামায়ে কেরাম সেইসব অভিযোগের জবাব দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন, যেগুলো তৈরি করেছে ইউরোপের প্রাচ্যবিদরা। তখন হিন্দুস্তানে খৃস্টধর্মের প্রচার-প্রসার তুঙ্গে। এর মোকাবেলার বিশেষ প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা এদিকে মনোযোগ দেননি।

মাওলানা মুঙ্গেরী রহ. এ ব্যাপারে আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন, 'ইসলামের এই অপমানের জবাব দেয়া কি উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ছিল না? অবশ্যই ছিল। কারণ এটাই তো তাদের কাজ। কিন্তু কেন তারা এই দায়িত্ব পালন করেননি এবং কেন দুর্বলদের পাশে দাঁড়াননি। এজন্য আলেমদের উচিত এক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দেয়া। যেমনিভাবে অন্যান্য দীনী বিষয়াদি পড়ানো হয় তেমনি এই খৃস্টধর্ম সম্পর্কেও পড়ানো দরকার। আগের যুগে ইলমে কালাম পড়ানো হতো, সে সময় এর প্রয়োজন থাকলেও এখন আর তেমন প্রয়োজন নেই। এই মুহূর্তে এমন বিষয় পড়ানো উচিত যা এখন কাজে লাগে।'

পয়গামে মুহাম্মদী দুই খণ্ডে। প্রথম খণ্ডটি ৩২৩ পৃষ্ঠার। কিতাবের শুরুতে একটি বিস্তারিত ভূমিকা আছে। এতে সামগ্রিকভাবে 'নেয়াযনামা' গ্রন্থের সব অভিযোগের জবাব আছে। ইঞ্জিল কিতাব যে বিকৃত হয়ে গেছে এর পক্ষে এক খৃস্টান আলেমের উক্তি তিনি পেশ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি লিখেছেন, 'এই

ইঞ্জিলের ব্যাপারে প্রথম মতপার্থক্য হলো তা কোন ভাষায় লিখিত ছিল। খৃস্টানদের বেশির ভাগ আলেমের মতে তা ছিল ইবরানি ভাষায়। কিন্তু দুনিয়া থেকে এর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে– এর একটি অনুবাদ আছে গ্রিক ভাষায়। পরে গবেষণার দ্বারা এটা জানা যায়নি যে, এর অনুবাদ কে করেছেন এবং কখন করেছেন। কেউ কেউ বলেন গ্রিক ভাষায় লেখা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন গ্রিক এবং ইবরানি দুই ভাষাতেই লেখা হয়েছিল। কিন্তু এর পক্ষে কারো কোনো প্রমাণ নেই, নিছক ধারণার ওপর নির্ভর করে বলা হচ্ছে। দ্বিতীয় মতপার্থক্য হলো এটি কখন রচিত হয়। হার্ন সাহেব তার তাফসিরের চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন, 'প্রাচীন ঐতিহাসিকরা যেমনটা বলে থাকেন গির্জা থেকে ইঞ্জিল রচিত এর কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। আগেকার ঐতিহাসিকরা কল্পকাহিনীকে ইতিহাস হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন। পরবর্তী লোকেরা সাহিত্য হিসেবে তাদের রচনাকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। আর এই রচনা পরম্পরায় পরবর্তীদের কাছে পৌঁছেছে। অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ায় তা যাঁচাই করে দেখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।'

এসব আলোচনা দ্বারা মাওলানা মুঙ্গেরী রহ. ইতিহাস ও খৃস্টান আলেমদের উক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, এখনকার ইঞ্জিল একটি বিকৃত কিতাব। আর লিখেছেন, বাইবেলে পার্থক্যের সংখ্যা ১০ লাখ। এছাড়াও ত্রিত্ববাদের অসারতা, কুরআন-হাদিসের প্রামাণিকতা এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

মুনশী সফদর আলীর সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল, কুরআনে কারীম যখন নিজেই আসমানি কিতাবগুলোর সমর্থন করছে তখন মুসলমানদের এগুলো মানার ক্ষেত্রে বাধা কোথায়। মাওলানা রহ. এটা প্রমাণ করেছেন যে, কুরআন যে তাওরাতের সত্যায়ন করেছে তা এখন কে নিরূপণ করতে পারবে। কুরআনে কারীমের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ আছে, আমি মূসা আ.কে কিতাব দিয়েছি। অন্যত্র একটু স্পষ্ট করে ফলকের কথা উল্লেখ আছে, যাতে দশটি আহকাম লেখা ছিল।

এরপর মাওলানা রহ. বলেন, কুরআনে কারীমের এক জায়গায় হযরত মূসা আ.কে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যেন তাঁর জাতিকে বলেন তারা যেন তাঁর ভালো কথাগুলোর ওপর আমল করে। ফলে লিখিত যেসব আহকাম ছিল এতে এমন কোনো বিষয় ছিল না যাতে আমল করা জরুরি নয়। সুতরাং এই সম্ভাবনা থেকে যায় কিতাবে এমন বিষয়ও সংযুক্ত হয়েছে যার ওপর আমল করা জরুরি নয়। উদাহরণস্বরূপ, ইবরাহিম আ. ও নূহ আ.–এর শরিয়তের এমন বিষয়ও তাওরাতে উল্লেখ ছিল যা মূসা আ.-এর শরিয়তে ছিল না। এসব বিষয়

বিবেচনা করে এটা কিভাবে বলা সম্ভব যে, কুরআনে কারীম পাঁচটি কিতাবেরই সমর্থন করেছে।

এভাবে প্রতিটি বিষয় মাওলানা মুঙ্গেরী রহ. বিশদভাবে, দলিল-প্রমাণ সহকারে আলোচনা করেছেন। 'পয়গামে মুহাম্মদী' এর একটি ইংরেজি অনুবাদও তাঁর প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়েছে এবং হিন্দুস্তানের বাইরেও মিশনারিগুলোতে পৌঁছে গেছে। এই কিতাবের বাংলা অনুবাদও বের হয়েছে।

তাঁর এই কিতাবের প্রভাব মুনশী সফদর আলী ও অন্য পাদ্রীদের ওপর এতটাই পড়েছে যে, মুনাযারা তো দূরের কথা মাওলানা মুঙ্গেরী রহ.–এর সামনে আসতেও তারা ভয় পেতো। ঘটনাক্রমে এক মৌলবী সাহেব মুনশী সফদর আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। তার নামও ছিল মুহাম্মদ আলী। কিন্তু তিনি তাকেও সাক্ষাত দিতে অস্বীকৃতি জানালেন।

'তোহফায়ে মুহাম্মদীয়া'তে এ প্রসঙ্গে একটি মজার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

'মুহাম্মদ আলী নামে এক ব্যক্তি ভণ্ডারে আসেন (এটি সম্ভবতঃ মুনশী সফদর আলীর বাসস্থান ছিল।) এবং সাক্ষাতের খবর পাঠান। তিনি সাক্ষাত দিতে অস্বীকার করলেন। ভণ্ডারে থেকে ফিরে যাওয়ার সময় পাদ্রী সাহেবের সাথে মৌলবী সাহেবের দেখা হয়। মৌলবী সাহেব তার সাথে কথা বলতে চাইলেন। পাদ্রী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কানপুরের মৌলবী মুহাম্মাদ আলী? মৌলবী সাহেব বললেন– আমি কে তাতে কী? আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই। তখনো পাদ্রী অস্বীকার করেন। এরপর মৌলবী সাহেব পাদ্রীর বগিতে গেলেন এবং কথা বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু পাদ্রী কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন না।

মাওলানা মুঙ্গেরী রহ. লিখিত উল্লিখিত কিতাবাদির বেশির ভাগই অনেকবার সংস্করণ হয়েছে। এগুলোর জবাব দেয়ার সাহস কোনো পাদ্রীই করেনি। এসব কিতাবের প্রভাবে মিশনারি কার্যক্রম যা তুঙ্গে ছিল তা ম্রিয়মান হয়ে যায়। হিন্দুস্তানের অনেক জায়গায় মিশনারি কার্যক্রম একদম বন্ধ হয়ে যায়। খৃস্টবাদ প্রতিরোধে মাওলানা মুঙ্গেরী রহ.–এর অবদান চিরদিন স্মরণ রাখার মতো।

তৃতীয় অধ্যায়

নদওয়াতুল উলামা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

সমকালীন পরিবেশ

মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. যখন যুগ ও পরিবেশ সম্পর্কে সজাগ হন, তখন ছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ। তখন উদীয়মান প্রাণবন্ত পাশ্চাত্য এবং দুর্বল ও অসহায় প্রাচ্যের মধ্যে সজ্ঘাতে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। এই বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক সজ্ঘাতের ফলে প্রাকৃতিকভাবে অনেক ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়, যারা মুসলমানদের বিভিন্ন চিন্তাধারার প্রতিনিধি ছিলেন। বেশ কয়েকটি শিক্ষা ও সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয় এবং সেগুলো নিজ নিজ ও পরিসরে মুসলমানদের জন্য মূল্যবান ও অবিস্মরণীয় সেবা সম্পাদন করে।

পুরনো ধাঁচের আরবি মাদরাসাসমূহ

মাওলানা মুঙ্গেরী রহ.-এর সময়কাল পর্যবেক্ষণ করলে একদিকে পুরনো মাদরাসাসমূহকে স্বীয় মহিমা ও আপন আপন বিশেষত্বসহকারে দেখা যাবে। কুরআন ও সুন্নাহর ওপর অবিচলতা এবং পূর্বসূরীদের চিন্তাভাবনা ও শিক্ষা-পদ্ধতির অনুসরণ ছিল তাদের বিশেষত্ব। বস্তুতঃ নতুন পশ্চিমা সভ্যতা ভারতীয় সংস্কৃতির সজ্ঘাতে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা ও প্রশ্নসমূহের প্রতি তাদের দৃষ্টি ছিল না বললেই চলে। এসব মাদরাসার দায়িত্বশীল ও পরিচালকগণ (যাদের নিষ্ঠা ও ইখলাস ছিল সন্দেহের উর্ধ্বে) সম্ভবতঃ চিন্তা করতেন যে, অগ্রসর হয়ে শত্রুর ওপর আঘাত হানার চেয়ে দুর্গ বন্ধ করে আত্মরক্ষা করা অধিক ফলদায়ক এবং কেবল এই উপায়েই দীন ও ঈমানের হেফাজত সম্ভব।

এই চিন্তাধারার ছাপ শিক্ষা ব্যবস্থায়ও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। ইতোপূর্বের নেসাবসমূহে নিয়মিত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পক্ষান্তরে মৌলিক কোনো পরিবর্তন ব্যতিরেকে দরসে নেজামীকে প্রাচীন অবস্থায় অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। বস্তুতঃ এই পরিবর্তনের যুগে- যা বলতে গেলে সমসাময়িক মানবেতিহাসের সর্বাধিক পরিবর্তনশীল সময়কাল- এতে সবচেয়ে কম সংস্কার গ্রহণ করা হয়েছে।

সেই যুগে (নদওয়াতুল উলামা প্রতিষ্ঠার সময়ে) যে শিক্ষাব্যবস্থা কেন্দ্রীয় মাদরাসায় প্রচলিত ছিল তাতে পরিষ্কার হয়ে যায়, ছাত্রদের মূল্যবান সময়ের কত বড় অংশ বিনা প্রয়োজনে মাকুলাতের পিছনে ব্যয় করা হত। অথচ ধর্মীয় বিষয়াদি ও 'উপকারী' জ্ঞানশাস্ত্রের প্রতি মনোযোগ কতই না কম ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ৪০০ পৃষ্ঠার কিতাব 'শরহে মুল্লা জামী' আট মাসে খতম করা হত। ৩৪০ পৃষ্ঠার কিতাব, 'মুখতাসারুল মা'আনী' শেষ করা হত সাত মাসে। পক্ষান্তরে সহীহুল বুখারী, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১,১২৮ তার জন্যে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল সাড়ে ৬ মাস। [নদওয়াতুল উলামা রোয়েদাদ, ১ম বর্ষ, ১ম অংশ]

মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবী রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের জন্য যে নেসাব অনুমোদন করেছিলেন তাতে মায়বুজী ব্যতীত দর্শন শাস্ত্রের সকল কিতাব বাদ দেওয়া হয়েছিল। তার জন্যে বরাদ্দও রাখা হয়েছিল ছয় মাস। হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব রহ.ও দর্শনশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা ও গ্রিক দর্শনের বিরোধী ছিলেন এবং এসবকে হৃদয়পট কালিমালিপ্ত হওয়ার কারণ মনে করতেন। তিনি স্বয়ং মাওলানা মুহাম্মদ আলীকে এক চিঠিতে লেখেন–

'তাঁর (মাওলানা আহমদ হাসান কানপুরীর) মা'কুলাতের প্রতি লিপ্ততা ও আগ্রহ বেশি। উচিত ছিল 'ইলাহিয়্যাত'কে মাকুলাতের ওপর প্রাধান্য দেয়া। মা'কুলাতেরই শাখা হল দর্শন ও প্রকৃতিবিদ্যা। উলূমে দীনের চর্চার দ্বারা যেভাবে আম্বিয়া আ. ও আউলিয়ায়ে কেরামের কলবের নূর ও বরকত– যা তাতে নিহিত রয়েছে– অন্তরের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে, তেমনিভাবে যেসব জ্ঞানশাস্ত্র বিধর্মীদের থেকে আগত, তাতে যে অন্ধকার ও সংশয় নিহিত রয়েছে– তা চর্চার ফলে অন্তরে বিস্তার লাভ করে।' [কামালাতে মুহাম্মদিয়া : ৩৪-৩৫]

তেমনি মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ.–এর মতামতও এমন ছিল যে, সেসব কিতাব পড়ানোতে দীন ও সময় উভয়ই নষ্ট করা হয়। এক চিঠিতে নিজের এই মতামতকে প্রকাশ করে লেখেন : দারুল ফালসাফা কেবল একটি অকেজো বিষয়। এতে এতদ্ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোনো উপকার হাসিল হয় না যে, তার দুই-চারটি বছর নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ নির্বোধ এবং ধর্মীয় বিষয়াদি থেকে উদাসীন হয়ে যায়। বিবেক রুদ্ধ বক্র ও শরয়ী বিধি-বিধান অনুধাবনে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ে এবং কুফুরী কথাবার্তা জবান থেকে বের করার ফলে ফালসাফার কালিমা দ্বারা অন্তর কলুষিত হয়ে পড়ে। এছাড়া আর কোনো উপকার নেই। [সাওয়ানেহে কাসেমী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৯৪]

কিন্তু ভারতবর্ষের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবের ফলে এবং অন্যান্য আসাতিযায়ে কেরামের ইচ্ছা ও পীড়াপীড়িতে মাওলানা নানুতুবী রহ.–এর

ওফাতের পর ধীরে ধীরে ফালসাফা ও মানতেকের সকল কিতাব পাঠ্যভুক্ত করা হয়। এর সাথে সাথে শিক্ষার সময়কালও বাড়তে থাকে।

স্বয়ং মাওলানা নানুতুবী রহ. ফালসাফা বা দর্শনশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন না। যেমনটি তাঁর কিছু কথা থেকে অনুমতি হয়। ওই যুগে তিনি দীনের স্থায়িত্ব ও স্থিতির জন্যে মা'কুলাতকে জরুরি মনে করতেন। [দেখুন- সাওয়ানেহে কাসেমী ১৯৮-৯৯]

অবশ্য এই শাস্ত্রের প্রতি এমন প্রবণতা ও বাড়াবাড়ি তিনিও পছন্দ করতেন না, যেমনটি ধর্মীয় মাদরাসাসমূহের সিলেবাসে বরং বলা চলে দরসে নেজামীর সিলেবাসে ছিল।

মাওলানার অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। কেননা, পরিবর্তিত পৃথিবীর বিভিন্ন সমস্যা সে সময় এত খোলামেলা ও পরিষ্কারভাবে তাঁর সামনে আসেনি যতটুকু পরিষ্কার দ্রুত ও আগ্রাসীভাবে পরবর্তীতে সামনে এসেছে এবং ইসলামের যথার্থতা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে এসব বিষয়ের পাশাপাশি কোনো বিবেকবান ও সচেতন ব্যক্তি এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারবে না যে, দেওবন্দের ফারেগরা ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে নিখাদ দীনকে যেভাবে হেফাজত করেছেন এবং তাকে বেদআত, বিচ্যুতি ও বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেছেন, তার মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইসলামী জীবনধারার প্রতিষ্ঠা, স্থিতি ও দৃঢ়তার ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে সহযোগিতা পাওয়া গেছে এবং বর্তমানে যে বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, ধর্মীয় জ্ঞান-শাস্ত্র, দীনদারদের মর্যাদা ও সহীহ আধ্যাত্মিকতা উপমহাদেশে দৃষ্টিগোচর হয় তাতে নিঃসন্দেহে তাদের উল্লেখযোগ্য ও মৌলিক অবদান রয়েছে। যদিও যুগের পরিবর্তনশীলতা, নতুন নতুন সঙ্কট ও সমস্যা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলা, ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার প্রসার, অধিকন্তু জাতীয়তাবাদ, পাশ্চাত্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের জনপ্রিয়তা ও সমাদৃততার ফলে পাশ্চাত্যবাদ ও বস্তুবাদের ঝড় সাধারণ মুসলমানদের উপর দিয়ে অতিক্রম করে আজ সেসব কিল্লার দেওয়ালে গিয়েও আঘাত হানছে যেগুলোকে সুরক্ষিত ও এই নয়া তুফানের ছোঁয়াচ থেকে অনেক দূরবর্তী মনে করা হত।

স্যার সাইয়িদ আহমদের চিন্তাদর্শন

অপর পক্ষে ছিলেন স্যার সাইয়িদ ও তাঁর চিন্তাদর্শনের সমর্থকেরা। স্যার সাইয়িদ কী চাইতেন? তাকে সংক্ষিপ্ত শব্দে এভাবে ব্যক্ত করা যেতে পারে যে, নিজের আকীদা-বিশ্বাসকে সুদৃঢ় রাখ; তবে পশ্চিমা রঙে পুরো রঞ্জিত হয়ে যাও। আর

এই অগ্রসরমান ও বিজয়ী জাতির পুরো বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীরও ধারক হয়ে যাও– চাই তার সম্পর্ক সামাজিক আচার-আচরণের সাথে হোক কিংবা রাজনীতির সাথে, শিক্ষা-দীক্ষার সাথে হোক কিংবা জাতীয় কর্মকাণ্ডের সাথে, ব্যক্তিগত জীবনের সাথে হোক কিংবা সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সাথে। অর্থাৎ, তার উদ্দেশ্য ছিল আকীদা-বিশ্বাস তোমরা হেজাজ থেকে নাও কিন্তু আমল নাও পশ্চিমাদের থেকে। ঈমান তোমরা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীস থেকে নাও। চিন্তা-দর্শন, জীবন-যাপন পদ্ধতি নাও ইউরোপের দর্শন থেকে। কিন্তু সম্ভবতঃ স্যার সাইয়েদের ধারণা ছিল না যে, এই কর্মপদ্ধতির সাথে আকীদা-বিশ্বাসও বেশি দিন বিশুদ্ধ অবস্থায় টিকে থাকতে পারে না। অতএব, তার প্রথম প্রভাব পড়ে তার ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাদর্শনের ওপর। যার যথার্থ ধারণা পাওয়ার যায় তার তাফসীর, রিসালায়ে তাহযীবুল আখলাকের প্রতিটি পৃষ্ঠা এবং তার ফেকাহ সংক্রান্ত বিশ্লেষণসমূহ থেকে।

(তার অত্যন্ত গুণগ্রাহী মাওলানা হালী স্পষ্টভাষায় স্যার সাইয়িদ আহমদের এই বিষয়টির সমালোচনা করে লিখেছেন, তার তাফসীরের অনেক জায়গা এমন রয়েছে, যা দেখে আশ্চর্য হই এমন উন্নত মেধাবী ব্যক্তি এমন অসার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হলেন কিভাবে এবং এমন নির্জলা ভুল তার কলম দিয়ে কিভাবে বের হলো। হায়াতে শিবলী ২১৫ টীকা।)

সারকথা, একদিকে প্রাচীন মাদরাসাসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দুর্গ বন্ধ করে নিজেদেরকে নতুন নতুন ফেতনা ও সমস্যা-সঙ্কট থেকে সুরক্ষিত করে নাও। অন্যদিকে স্যার সাইয়েদের মত ছিল সংস্কৃতি-সভ্যতায়, সামাজিকতা ও চিন্তা চেতনায় পাশ্চাত্যের অনুসরণ কর এবং তাদের ছাঁচে নিজেদেরকে ঢেলে নাও। কিন্তু এই দুই রাস্তা ছাড়া কি কোনো তৃতীয় রাস্তা ছিল না?

সাইয়িদ আমীর আলী ও মৌলভী চেরাগ আলী

সাইয়িদ আমীর আলী ও মৌলভী চেরাগ আলী স্যার সাইয়িদ থেকে আরো অগ্রসর হয়ে ইসলামকে সুরক্ষা ও পশ্চিমা চিন্তাবিদ ও লেখকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং তাতে একপ্রকার সফলতাও লাভ করেন। বিশেষতঃ সাইয়িদ আমীর আলীর বই Spirit of Islam পশ্চিমা জ্ঞানী সমাজের প্রশংসা লাভ করে এবং ভারতবর্ষের উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণির ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উভয়ের চিন্তা পদ্ধতি ও বর্ণনাধারা ছিল কৈফিয়তমূলক (Apologetic) ও প্রতিরক্ষাধর্মী। তারা বোঝাতে চাইতেন যে, সে

সকল বিষয়ে ইসলামের নিয়মনীতি তা–ই, যা পশ্চিমা চিন্তাবিদদের রয়েছে এবং ইসলাম পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনোভাবেই বিরোধী নয়।

তাদের মৌলিক ভুল ছিল, তারা প্রাকৃতিক ও সামাজিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। তারা বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক শাস্ত্রসমূহের ক্ষেত্রে যে পন্থা অবলম্বন করেছেন। সামাজিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সেই একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। অথচ এই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ মূলতঃ মানুষের সামগ্রিক প্রয়াসের ফসল, যার ওপর কোনো ধর্ম, প্রজন্ম কিংবা দেশের কর্তৃত্ব নেই। সেসব জ্ঞানের সম্পর্ক মানুষের বুদ্ধি, প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতার সাথে। সেগুলোকে না ইসলামী বলা যায়; না অনৈসলামী। ভূগোল, প্রকৌশল, প্রযুক্তি, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি এমন বিজ্ঞান যেগুলোর সম্পর্ক মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাথে। যদি সেসবের কিছু কিছু অংশ ইসলামী নিয়ম-নীতির সাথে সাংঘর্ষিক হয় ইসলামকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অবশ্য জীবন-যাপন পদ্ধতি, সমাজব্যবস্থা ও জীবনের উদ্দেশ্য ও চিন্তা পদ্ধতি, যার উপর মানব জীবনের ভিত্তি এবং তার দিক ও লক্ষ্য নির্ধারিত হয়, সে সম্পর্কে ইসলামের পৃথক ও স্বাধীন ব্যবস্থা রয়েছে। তাতে সংযোজন-বিয়োজন কিংবা পরিমার্জন-কর্তনের কোনো সুযোগ নেই। তার সাথে অনেক বিষয় এমন রয়েছে যার জন্যে ইসলাম কেবল মূলনীতি ও নির্দেশনা প্রদান করেই ক্ষান্ত হয়েছে। তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং মানব জীবনে প্রয়োগ মানুষের বিবেক ও যুগের পরিবর্তিত অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়েছে। যেমন : গৃহ নির্মাণ, ঋতু ও প্রয়োজন অনুসারে পোশাকের পরিবর্তন, দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যম, শিক্ষা পদ্ধতি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি। এসব বিষয় এমন যাতে অবস্থা ও চাহিদা, আপন আপন রুচি-অভিরুচি, প্রয়োজন ও সুবিধা অনুসারে (শরীয়তের গণ্ডিতে থেকে) এসব পরিবর্তন ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ এবং মানব দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনও বটে। শর্ত হল তার প্রকৃতি ইসলামের চাহিদাকে পূর্ণ করবে এবং ইসলামী নীতির আলোকে তার রুচি-অভিরুচিকে সামনে রেখে অবলম্বন করাতে হবে।

দুর্ভোগ্যের বিষয়, মুসলিম বিশ্বে এখনও এমন লোক রয়েছে যারা কুরআনকে বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টায় রত এবং তার আয়াতসমূহের এমন সব ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যস্ত যার ফলে উভয়ের মধ্যে কোনো ধরনের সজ্ঘাত ও বৈপরিত্য না থাকে। অথচ এই বৈপরিত্য কেবল তাদের বিকৃত মস্তিষ্কের ফসল। মূলতঃ তার কোনো বাস্তবতা নেই। ইসলামের উদ্দেশ্য এবং কুরআন মজীদের আলোচ্য বিষয় হল মানুষের হেদায়েত; তাদের বস্তুগত উন্নতি নয়। তাহলে ইসলামকে

কিভাবে সেই বিজ্ঞানের অনুগামী করা সম্ভব যা অভিজ্ঞতা ও মাধ্যমসমূহের উন্নতির সাথে সাথে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকে।

(এসব মনীষীর অবস্থানের এক ব্যাখ্যা এই করা যায় যে, বিজ্ঞানের অনির্ভরযোগ্যতা ও পরিবর্তনশীলতা এই যুগে যেভাবে স্পষ্ট হয়েছে, তখন সেভাবে হয়নি। আইনস্টাইন ও তার সমকালীন বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের আকাশ পাতাল বদলে দিয়েছেন এবং বিজ্ঞানের অনির্ভরযোগ্যতা ও আধিভৌতিক সত্তা ও শক্তির সাথে তার সম্পর্ক মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।)

সাইয়িদ আমীর আলী যদিও মতাদর্শী হিসেবে শিয়া ছিলেন, কিন্তু তিনি তার সেই মতাদর্শের গোড়ামী ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে উঠে শিক্ষা ও সংস্কার চেষ্টা-সাধনা অব্যাহত রাখেন।

সাইয়িদ আমীর আলী পাশ্চাত্যকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ লাভ করেন এবং সেই ভূখণ্ড ও তার পরিবেশে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করার কারণে পশ্চিমা জীবনদর্শন, ইতিহাস ও খৃস্টবাদের ওপর তার জানাশোনা স্যার সাইয়িদ আহমদ খান ও মৌলভী চেরাগ আলী থেকেও আরো গভীর ছিল। তিনি ইউরোপের নেতিবাচক দিকগুলো ও তাঁর অন্ধকারজগত সম্পর্কেও ভালোভাবে অবহিত ছিলেন। এজন্যে তিনি আরো ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি ও সুদৃঢ় প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং পশ্চিমা লেখকদের প্রতি পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। কিন্তু তিনি অধিক জোর দেন ইসলামের সুরক্ষা ও স্বচ্ছতা ফুটিয়ে তোলার প্রতি। তিনি ইংরেজিতে উঁচুমানের সাহিত্যিক ও লেখক ছিলেন। শেক্সপীয়ার, মিল্টন, বায়রন, কীটস প্রমুখ লেখকদের সাহিত্যকর্ম তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। আর বলতে গেলে শেলীর তো তিনি হাফেজই ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের ওপর তার পরিপূর্ণ পাণ্ডিত্ব ও দখল থাকার কারণে তার লেখাগুলো অনেক শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত ছিল। বস্তুতঃ এর ফলে তার লেখার মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি ইতিহাস, আইনশাস্ত্র ও ইসলামী ফেকাহশাস্ত্রের ওপর প্রচুর কিতাব লেখেন। কিন্তু তিনি ও মৌলভী চেরাগ আলীর জ্ঞান-গরিমা, সংস্কারের অনুরাগ ও চেতনা স্বীকার করার পাশাপাশি একথা বলতে হয় যে, এসব কিতাব পশ্চিমা জীবনদর্শন ও চিন্তাধারার মৌলিক সমালোচনা থেকে শূন্য। বস্তুতঃ তাতে পশ্চিমা সংস্কৃতি সভ্যতার ওপর আগ বেড়ে আক্রমণ করার পন্থা একেবারেই অনুসৃত করা হয়নি। এজন্যে তার সকল যুক্তিপ্রমাণ ও জ্ঞান গরিমার পাশাপাশি উচ্চ সাহিত্যমান ও রচনাশৈলী সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও এই শূন্যতা সত্যিই বিদ্যমান রয়েছে এবং পশ্চিমা মানস ও মস্তিষ্ক তার প্রভাব তেমন অনুভব করেনি।

সেসব কিতাবের ব্যাপারে আগ বেড়ে বেশি থেকে বেশি যে কথা বলা যেতে পারে তা হল– তিনি ইসলামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ ভালোভাবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু পশ্চিমা দর্শন, পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থা এবং পশ্চিমা সংস্কৃতি মানুষের মনন-মস্তিষ্কে যে ছাপ ফেলেছে তা দূর করার জন্যে কোনো চেষ্টা করেননি। ফলে এই নতুন অনুভূতি ও নতুন ছাপ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি এবং পশ্চিমা চিন্তাধারা আগের মতই শক্ত ও স্থিতিশীল থাকে।

আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ও খানকাসমূহ

এসব চিন্তা নিকেতন, শিক্ষাকেন্দ্র ও আন্দোলন্দের পাশাপাশি অন্য একটি শক্তিও ছিল, যার প্রভাব থেকে মুসলিম ভারতের কোনো অংশই মুক্ত ছিল না। এগুলো ছিল আধ্যাত্মিক খানকাহ ও তাসাওউফের সিলসিলার। এগুলোর অনুগ্রহের ভারী বোঝা থেকে মুসলিম মিল্লাত কখনও দায়মুক্ত হতে পারে না। এসব কেন্দ্র ঈমান ও ইয়াকীনের, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক দীক্ষার এবং আত্মার পরিশুদ্ধির এমন ঝরণাধারা ছিল, যেখানে সকল আহলে ঈমান ও আহলে তলব পরিতৃপ্ত হতেন এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণ করতেন। যে ব্যক্তির বিশুদ্ধ ইসলামী গুণাবলী, ঈমানী স্তরসমূহ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসা থাকত, তিনি এসব কেন্দ্রে এসে হারানো সম্পদ ফিরে পেতেন, জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারতেন এবং আল্লাহ তাআলার মারেফাত ও মহব্বতের স্বাদের সাথে পরিচিত হতেন।

এক্ষেত্রে যাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে তন্মধ্যে খাজা মুহাম্মদ সুলায়মান তিউনিসী রহ. (মৃ. ১৮৪১ ঈ.), মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ. (মৃত্যু ১৮৯৫ ঈ.), হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব মুহাজেরে মক্কী রহ. (মৃত্যু ১৩১৭ হিজরী) এবং মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. (মৃত্যু ১৩২৩ হিজরী) এর নাম শীর্ষস্থানীয়। এসব বুজুর্গের মজলিসসমূহ ভারতবর্ষের অস্থির ও পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে রুশদ ও হেদায়েতের এমন কেন্দ্র ছিল যেখানে এসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ হৃদয়ের মলম ও অন্তরের প্রশান্তি লাভ করেন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের দীক্ষার মাধ্যমে সৌভাগ্যবান হন এবং এই পয়গাম ও দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।

এসব বুযুর্গ ছাড়াও আরো মাশায়েখ ছিলেন যাদের তারবিয়াত ও ইসলাহের মাধ্যমে হাজার হাজার, বরং লাখো আল্লাহর বান্দা উপকৃত হন এবং আবার নিজেরাও দূর-দূরান্তের অঞ্চলসমূহে তার কল্যাণের ধারা পৌঁছে দেন। এই দেশে

দীনী পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে এসব মহাপুরুষ যে অবদান রেখেছেন তাদের উল্লেখ ব্যতিরেকে ইসলামী ভারতের ধর্মীয়, সামাজিক ও শিক্ষার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

শিক্ষা-ব্যবস্থা ও মাদরাসার সাধারণ পর্যালোচনা

সাধারণ আরবি মাদরাসাসমূহের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির দ্বারা দেয়া যেতে পারে যার সম্পর্কের সূত্র তার সভ্যতা-সংস্কৃতির স্থায়ী ও অবিনশ্বর শক্তি থেকে সম্পূর্ণ দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং নতুন নতুন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি তার শরীরে মাথা ঢোকাতে পারছে না। তার ফলাফল এই ছিল যে, সেসব মাদরাসার সম্পূর্ণ শক্তি ও যোগ্যতা পারস্পরিক বিতর্ক, দার্শনিক আলোচনা, মানতিক শাস্ত্রের খুঁটিনাটি বিষয় ও ফেকহী মতবিরোধে উৎসর্গ হচ্ছিল। আর যে সময় পশ্চিমা সংস্কৃতি তার সকল কমনীয়তা ও ফেতনার সরঞ্জাম নিয়ে ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজের ওপর ছায়া বিস্তার করে চলছিল এবং এই সংঘাতের ফলে মেধাবী ও সূক্ষ্মদর্শী শ্রেণির মধ্যে এক মানসিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল, সেসময় সুল্লাম–এর তাকরার ও হিফজ করার ধারা যথানিয়মে অব্যাহত ছিল এবং সেই অভিলাষে কোনো ধরনের পার্থক্য আসেনি। দেখার বিষয় হল ১১১৯ হিজরীর পূর্বে লিখিত কিতাব এ পরিমাণ নিয়মতান্ত্রিকতা ও গুরুত্বের সাথে তখনো পড়ানো হচ্ছিল যে, দুই শতাব্দীরও বেশি সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার পরও মাদরাসাসমূহে তার গুরুত্ব ও প্রয়োজন তেমনই স্বীকৃত যেমনটি ছিল তার সময়কালে।

প্রথম শ্রেণির আলেমদের শিক্ষার মূলধন ছিল সাধারণভাবে মতনের শরাহ, শরাহের হাশিয়া ও হাশিয়ার ওপর মন্তব্য।

শেষ সময়ে এসে দরসের নেসাবে যে সংযোজন করা হয়েছে তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, মাদরাসাসমূহ তখন কী পরিমাণ মানসিক ও শিক্ষার অধঃপতনের শিকার হয়েছিল। মোল্লা নেজামুদ্দীনের চালু করা পাঠ্যক্রমে প্রথমত বহুদিন পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। আর যখন পরিবর্তন করা হয়, তখন তা হয় কোনো ধরনের চিন্তাভাবনা ব্যতীত। অতঃপর বিস্ময়ের ব্যাপার হল যেসব নতুন কিতাব মোল্লা নেজামুদ্দীনের নেসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেগুলো সেসব কিতাবেরই শরাহ ও হাশিয়ার (ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও পাদ টীকার) অন্তর্গত। একটি কিতাবও স্বাধীনভাবে রচিত নয়। আর না কোনো কিতাবে নতুন কোনো দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন–

০১. হাশিয়ায়ে গোলাম ইয়াহইয়া আলা মীর জাহেদ, ০২. শরহে সুল্লাম লিল-কাজী মুবারক আলাত-তাসাওউরাত। ০৩. শরহে মুহাম্মাদুল্লাহ আলাত-

তাসদীকাত এবং ০৪. শরহে মোল্লা হাসান আলাত তাসদীকাত। কোনো কোনো মাদরাসায় আরও সংযোজন করা হয়– ০৫. শরহে সুল্লাম লিবাহরিল উলূম এবং শরহে সুল্লাম মোল্লা মুবীন। ০৭. হাশিয়ায়ে বাহরুল উলূম আলা মীর জাহেদ ০৮. হাশিয়ায়ে মোল্লা মুবীন আলা মীর জাহেদ।

الثقافة الإسلامية في الهند (ভারতবর্ষে ইসলামী সভ্যতা)–এর লেখক বিভিন্ন জ্ঞানশাস্ত্রের ওপর ভারতবর্ষের আলেম সমাজের রচনা ও লিখিত কিতাবসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত ও বিশদ আলোচনা করেছেন। এই শিরোনামের অধীনে তিনি কেবল মানতিক শাস্ত্রের শরাহ হিসেবে লিখিত কিতাবসমূহের বিবরণ লিখেছেন তার সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৭। যাতে ৩৭টি কিতাব কেবল আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বিহারী রহ.–এর প্রশিদ্ধ কিতাব 'সুল্লাম'–এর শরাহ। বাকিগুলো অন্যান্য কিতাবের শরাহ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ। মাওলানা মানাযের আহসান গিলানী রহ. মীর যাহেদের কিতাবসমূহ উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন–

'সেসব কিতাবের সাথে মৌলভীদের লিপ্ততা ও আগ্রহের অবস্থা এমন ছিল যে, সেই তিন কিতাব কিংবা তন্মধ্যে থেকে কোনো একটি কিতাবের উপর নিজস্ব বিশেষ হাশিয়া বা পাদটিকা না লিখলে তাকে নির্ভরযোগ্য ও যোগ্যতাসম্পন্ন মৌলভী হিসাবে গণ্য করা হত না। 'সুল্লাম' ও তার শরাহসমূহের অবস্থাও ছিল এমন।'

বিস্ময়ের ব্যাপার হল, কিছু কিতাব কেবল পরামর্শ ও চিন্তাভাবনা ব্যতিরেকেই নয় বরং কোনো ধরনের উদ্দেশ্য ব্যতীতই নেসাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।'

মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই রহ. লিখেছেন, 'এই সংযোজনের ইতিহাসও অনেক আকর্ষণীয়। মৌলভী মুহাম্মাদ ফারুক চিরয়াকুটি স্বীয় উস্তাদ মুফতি মুহাম্মদ ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তার বাল্যকালে সুল্লামের শরাহ সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল না। বরং কাজী মোবারকের শাগরিদ মৌলভী সুদন প্রমুখ নিজের ছাত্রদের সুল্লামের সাথে সুল্লামের শরাহ 'কাজী মুবারক'ও পড়াতেন। মোল্লা হাসানের শাগরিদরা সুল্লামের শরাহ মোল্লা হাসান পড়াতেন। আর বাহরুল উলূমের খানদানের মধ্যে 'সুল্লাম' এর শরাহ বাহরুল উলূম প্রচলিত ছিল। তেমনি হামদুল্লাহর শিষ্যগণ নিজেদের উস্তাদের শরাহ পড়াতেন। পড়ানোর সময় একজন অন্য জনের ছিদ্রান্বেষণ এবং ভুলত্রুটিও ধরার চেষ্টা করতেন। এজন্যে অপরজনের কিতাব দেখার প্রয়োজন দেখা দিত। ফল এই দাঁড়াল যে, ধীরে ধীরে এসব কিতাব দরসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যাকে আমরা

যদি কিছু বলতে চাই তবে নাখান্দা মেহমান বা অপ্রত্যাশিত অতিথি বলে অভিহিত করতে পারি।

এ হল মানতিকশাস্ত্রের আলোচনা। পাঠ্যব্যবস্থার সমন্বিত ও বিস্তারিত পর্যালোচনা আমাদেরকে কতিপয় বেদনাদায়ক দুর্বলতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সেসব মৌলিক বিচ্যুতি সামনে আসে যা এই নেসাবকে না কেবল অনুপকারী বরং সম্ভবতঃ একথা বলা যথার্থ হবে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষতিকর করেছে। তার মাধ্যমে না ছাত্রদের মধ্যে তাফসীর ও হাদীসের যথার্থ আগ্রহ ও যোগ্যতা তৈরি হয়, না ইলমী স্বাদের ক্ষেত্রে কোনো উন্নতি সাধিত হয়। তা বোঝার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, সেই নেসাবে মানতিকশাস্ত্রের ১৫টি কিতাব ছিল। তাফসীরের দুইটি– বায়যাবী ও জালালাইন। বালাগাত ও আরবি সাহিত্যের হিস্যা না থাকারই মত। মাওলানা আব্দুল হাই রহ.–এর কথা অনুসারে,

সেই নেসাবের মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে কোনো শাস্ত্রের ওপর পাণ্ডিত্ব তো অর্জন হত না; অবশ্য প্রশংসা ও স্তুতি স্পৃহার অভ্যাস হয়ে যেত। বাকী থাকল হাদীসের কথা। এই শাস্ত্রের কিতাব প্রত্যেক মাদরাসায় পড়ানো হত না। কিছু কিছু আগ্রহী ব্যক্তি তার জন্য সফর করতেন এবং যেখানে এই মূল্যবান সম্পদ পাওয়া যেত তা অর্জন করতেন। কিন্তু সাধারণভাবে সব ছাত্রদের জন্য তা অর্জন করা যে কষ্টকর ছিল তা বলাই বাহুল্য।

ইসলামের ইতিহাস, ভূগোল, ইলমে ই'জাজুল কুরআন, ইলমে কালামে জাদীদ, পাশাপাশি সেসব জ্ঞানশাস্ত্র ও আলোচ্য বিষয়সমূহ যার সম্পর্ক বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর উত্থান-পতন, সভ্যতা ও সমাজের দর্শন, চিন্তাধারা ও জ্ঞান-গবেষণার সাথে সেসব নজরে পড়ে না।

আরবি ভাষার সাথে সেই মৃত ভাষার মত আচরণ ছিল যা ঐতিহাসিক জীর্ণশীর্ণ উপাখ্যান ও কিতাবসমূহে সংরক্ষিত ছিল, যা খুব কষ্টের মাধ্যমেই সম্পূর্ণ পড়া ও অনুধাবন করা যায়। অথচ এটি এমন এক সজীব, প্রাণবন্ত ও সার্বজনীন ভাষা, যা কিতাব ও সুন্নাহর চাবিকাঠি এবং ইসলামের সুমহান কুতুবখানায় প্রবেশের পূর্বশর্ত। যাতে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যতীত কবিতা ও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও তাসাওউফের মূল্যবান ভাণ্ডার এবং মানুষের প্রজ্ঞার অবিনশ্বর ও স্মরণীয় নিদর্শন সুপ্ত রয়েছে।

আরবি সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে যেসব কিতাব বাছাই করা হয়েছে তন্মধ্যে 'মাকামাতে হারীরী' শীর্ষস্থানীয়। তা এই মাদরাসাগুলোতে অনেক প্রিয় ও

পছন্দনীয় কিতাব হিসেবে বিবেচিত। এই কিতাব– যা ছন্দবদ্ধ বর্ণনাশৈলী, জটিল ও দুরূহ বাক্য, কঠিন ও গুরুগম্ভীর শব্দের জন্য প্রসিদ্ধ। শিক্ষক ও ছাত্রদের আরবি ভাষার সরল পথ থেকে সরানোর ক্ষেত্রে তা বড় ভূমিকা পালন করেছে। ফলে তাদের অধিকাংশই বিশুদ্ধ আরবি ভাষারীতি সম্পর্কে অপরিচিত থেকেছে। 'নফহাতুল ইয়ামান' সাহিত্য ও চরিত্র উভয় বিবেচনায় কোনো উঁচু নমুনা নয়। বিশেষতঃ বাল্যকালে তা পড়া ও পড়ানো অশোভন ও অসঙ্গত।

'মাকামাতে হারীরি' ব্যতীত নেসাবে যেসব কিতাব অন্তর্ভুক্ত ছিল সেগুলোর অধিকাংশই ছিল কাব্যসাহিত্য। দেওয়ানে হামাছা, দেওয়ানে মুতানাব্বী, সাবআ মুআল্লাকা, কছীদায়ে বানাত সুআদ, কছীদায়ে বুরদা লিলবুছিরী ইত্যাদি সর্বদা নেসাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বস্তুতঃ দৃষ্টিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা জানেন যে, সাহিত্যের যোগ্যতা সৃষ্টি, লেখা ও বক্তৃতা চর্চার জন্যে কবিতার আবেদন সর্বযুগে ও সব ভাষাতেই কম ছিল। রচনা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্যে সর্বদা গদ্যকেই উপকারী মনে করা হয়েছে।

মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এই বিষয়টির সমালোচনা করে লিখেছেন : 'লেখনি ও বক্তৃতার চর্চা এবং আরবি ভাষায় তরজমা ও মনোভাব ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে যে বিষয় উপকারী তা হল গদ্য সাহিত্য, কাব্য সাহিত্য নয়। কবিতা ছন্দ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে থাকে, যদিও আমাদের এখানে গদ্য সাহিত্যও কবিতার চেয়ে কম নয়। কেননা, তাতে যে অন্তমিল, শিল্প ও বাগাড়ম্বরতা অনুপ্রবেশ করেছে তা সাহিত্যকেও উদ্ভাবিত জ্ঞান বিজ্ঞানের মত করে ছেড়েছে, যা পড়ানো যায়, জীবনে কাজে লাগানো যায় না।

এই নেসাবে তালিম (আদবের নেসাবসহ)–এর একটি প্রভাব এও পড়েছে যে, কুরআন মজীদের যথার্থ মর্ম অনুধাবন, যার জন্যে বিশুদ্ধ আরবি ভাবাবেগ ও যোগ্যতার প্রয়োজন, ছাত্রদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে গেছে। সেসব কিতাব এবং সেগুলোর পাঠ দান পদ্ধতি তাদের মন-মস্তিষ্ককে এমনভাবে গড়ে তুলেছে যে, তারা কুরআন মজীদের শব্দ ও ইবারতের সরল-সোজা ও অনুধাবনযোগ্য অর্থকে ছেড়ে দিয়ে বিনা প্রয়োজনে ঘুরানো পথ অবলম্বনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণে আসক্ত হয়ে পড়েছে।

এই পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায় যে, সেই শতাব্দীসমূহে এমন কোনো উঁচু স্তরের ব্যক্তি সৃষ্টি হয়নি, যিনি স্বীয় যুগের স্তর থেকে সমুন্নত ও সংস্কারধর্মী চিন্তা-চেতনার ধারক। ওয়ালিউল্লাহ খান্দান এক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং তারা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে যে সুমহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা কে না

জানে? হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. মোল্লা নেজামুদ্দীনের সমসাময়িক ছিলেন। হেজাজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি নেসাবে তালীমের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আশানুরূপ সফলতা আসেনি। তার কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই রহ. লিখেছেন–

শাহ সাহেব রহ. নিজের মত করে একটি নতুন নেসাব তৈরি করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু সে যুগে ইলমের ভরকেন্দ্র দিল্লি থেকে লাখনৌতে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল এবং সকল দরসগাহে মানতিক ও হিকমাতের সালসার সাথে মানুষের কাজ ও ভাষা পরিচিত হচ্ছিল, তাই সেই নেসাব গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি। বস্তুতঃ আমি বুঝতে পেরেছি যে, তার খ্যাতিমান সন্তানরাও যুগের রীতি-নীতিতে বাধ্য হয়ে তা চালু করার চেষ্টাও করেননি।

তাদের পূর্বে শায়খ মুহাম্মদ তাহের পাট্টনী রহ. (মৃত ৯৮৬ হিজরী) শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ. (মৃত ১০৫২ হিজরী) মুজাদ্দেদে আলফে সানী শায়খ আহমদ সেরহিন্দী রহ. (মৃত ১০৩৪ হিজরী)–এর মত ব্যক্তিগণ যুগের সাধারণ স্তর থেকে অনেক উঁচু ও শ্রেষ্ঠ প্রতীয়মান হন। তাদের মধ্যে থেকে যদি কেবল মুজাদ্দেদ রহ.–এর সংস্কারধর্মী কার্যক্রম এবং গবেষণাধর্মী চিন্তা-ভাবনাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয় তবে তার জন্যে আলাদা কিতাবই নয় বরং পুরো কুতুবখানা প্রয়োজন।

ইসলামের প্রাথমিক উৎসের সাথে অধিক থেকে অধিকতর নৈকট্য ও সংযোগ, জিহাদ ও ইজতিহাদের পুনরুজ্জীবন এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে সাইয়িদ আহমদ শহীদ রহ. (মৃত ১২৪৬ হিজরী) এবং মাওলানা ইসমাইল শহীদ রহ. (মৃত্যু ১২৪৬ হিজরী) মুসলিম ভারতের মর্যাদাকে সমুন্নত এবং তার সৌন্দর্যকে সমুজ্জ্বল করেছেন। কিন্তু সেসব সুবাসিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তির কুরবানি সত্ত্বেও ভারতবর্ষের দরসগাহসমূহের এবং পাঠদানের সাধারণ পরিবেশ বেহাল ও নিশ্চল ছিল এবং তাতে কোনো পরিবর্তন, পরিমার্জন কিংবা কোনো ধরনের চঞ্চলতা ও অস্থিরতা দৃষ্টিগোচর হত না। এমন মনে হত যে, সম্ভবতঃ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক পরিবর্তনের ঢেউ তার সাথে ঠোকর খেয়ে খেয়ে অতিক্রম করছিল।

সেসব নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম সমাজের জন্যে কঠিন মানসিক সঙ্ঘাত ও অস্থিরতার কারণ ছিল, তা মাদরাসাগুলোর ওপর

একেবারেই প্রভাব ফেলত না। কিংবা তারা নিজেদের চোখকে বন্ধ করে নিজেদের সুরক্ষিত মনে করতেন।

جو راز میکدہ میں ہے اک اک زبان پر

افسوس مدرسہ میں ہے بالکل نہاں ہنوز

'শুঁড়িখানায় যে কথাটি সবার মুখে মুখে

হায়! মাদরাসায় তা এখনো পুরোই গুপ্ত।'

কুফরীর ফিতনা ও পারস্পরিক সঙ্ঘাত

মানুষকে আল্লাহ তাআলা মহাযোগ্যতা দান করেছেন। প্রতিটি সময় ও মুহূর্তে তা কোনো ময়দানের অনুসন্ধানে থাকে। এই যোগ্যতাসমূহ যদি সঠিক ও যথার্থ অভিমুখে পরিচালিত না হয়, তাহলে অনিবার্যভাবে ধ্বংসাত্মক ময়দানের দিকে ধাবিত হয়। তার বিলুপ্তি সম্ভব নয়, দিক পরিবর্তন সম্ভব। আরবি মাদরাসাসমূহের জন্য এই সমস্যা হয়েছে যে, এই নেসাবে দরস এবং শিক্ষা পদ্ধতির কারণে তাদের সামনে এমন গঠনমূলক ও বিপ্লবাত্মক ময়দান বা ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকেনি যেখানে সেই যোগ্যতা ও শক্তিসমূহের বিকাশ ও প্রয়োগ হতে পারে। এই শিক্ষাব্যবস্থা বিভিন্ন বিশেষ উপকারের ধারক হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম মিল্লাতের তরুণ সমাজের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনে নিয়োজিতদের অন্তরের প্রসারতা, দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতি, চিন্তা-ভাবনার যোগ্যতা এবং গবেষণাধর্মী চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত অক্ষম ছিল। ফল এই দাঁড়াল যে, তাদের যেই যোগ্যতা যথার্থ নির্দেশনা ও তারবিয়াতের মাধ্যমে এবং যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সেই বড় উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিতান্ত উপকারী প্রমাণিত হতে পারত, তা একে অপরকে কাফের ও ফাসেক ফতওয়া প্রদান, আনুষঙ্গিক মতবিরোধ, দলীয় গোঁড়ামী ও ইলমী মতভেদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে থাকে। আর প্রচুর পরিমাণে এমনসব দৃশ্য ও ঘটনা ঘটে, যা ভারতবর্ষের ইসলামী ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে দেয়।

হিন্দুস্তানের খ্যাতনামা আলেম ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বগণকে কাফের ফতোয়া দেওয়া হয়। মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ.-কে অপবাদ দেয়া হয় যে, তিনি খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করেন। মাওলানা গাঙ্গুহী রহ. কে 'এমকানে কিযবে বারী তাআলা' (আল্লাহ তাআলা মিথ্যা বলতে পারেন)-এর অভিমতকারী হওয়ার অপবাদ দেয়া হয়। মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহ. সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি শয়তানকে হুজুর সা. থেকেও বেশি জ্ঞানী সাব্যস্ত করেছেন। মাওলানা

থানভী রহ.কে এই অপবাদ দেয়া হয় যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সা.–এর ইলমকে যায়দ, বকর বরং চতুষ্পদ জন্তুদের জ্ঞানের সমপর্যায়ের মনে করতেন। পরিশেষে মাওলানা মুহাম্মদ আলী রহ. ও মাওলানা শিবলী নোমানী রহ.–এর উপরও কাফের হওয়ার ফতওয়া প্রকাশ করা হয়।

পুরো উম্মত মুকাল্লিদ ও গায়রে মুকাল্লিদ এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। আহলে হাদীস ও আহলে ফেকাহ এর দুটি ভিন্ন ভিন্ন দল সৃষ্টি হয় এবং তারা একে অপরের প্রতি এমন আক্রমাণাত্মক হয়ে পড়ে যেন তারা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনুসারী। সকল সামর্থ্য উচ্চস্বরে 'আমীন' বলা, সূরা ফাতেহা পড়া এবং হাত উঠানোর পক্ষে ও বিপক্ষে ব্যয় করা হয়। ফেকাহ্ শাস্ত্রের আনুষঙ্গিক বিষয় ও মতভেদপূর্ণ মাসআলাসমূহ যার উপর ইসলামের অস্থিত্ব ও উন্নতি সীমাবদ্ধ ছিল না– বড় বড় কিতাব এসবের উপর আক্রমণাত্মক ঢঙে তৈরি হতে থাকে। বিতর্কসভা হয়। পরস্পর বাদানুবাদ ও আক্রমণ পাল্টা আক্রমণের এক অনিঃশেষ ধারা শুরু হয়ে যায়। আর তাতে খুব কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি হতে থাকে।

ফল এই দাঁড়াল যে, এতে সময়ের যুগের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, যার উপর ইসলামের অস্তিত্ব, পুনর্জীবন ও মুসলমানদের ভবিষ্যৎ সংশ্লিষ্ট, সেসবের ওপর চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ ও সুযোগ অবশিষ্ট থাকেনি। সে যুগে যে ধরনের কিতাবসমূহ প্রকাশিত হচ্ছিল এবং তাতে যে ধরনের মানসিকতা কাজ করছিল– তার ধারণা সেগুলোর নাম থেকে অনুমান করা যায় :

فیؤس الکملة علی رؤس الجهلة.

লেখক মাওলানা হাকীম ইলাহী বখশ (প্রকাশকাল ১৩০০ হিজরী)

ظفر مبین علی جمع الشیطین.

লেখক মাওলানা মুহাম্মদ আলী বিছরানবী (প্রকাশকাল ১২৯০ হিজরী)

منوط الرحمن علی حاسد اللنعمان.

লেখক মাওলানা হাকীম ইলাহী বখশ খান সাহেব (প্রকাশকাল ১৩০৬ হিজরী)

سبحن السبوح عن عیب کذب مقبوح.

লেখক মাওলানা আহমদ রেজাখান ব্রেলভী

এসব কিতাবের নাম সেই দীর্ঘ তালিকা থেকে নেওয়া হয়েছে যা সে যুগে বহুল পরিমাণে প্রকাশ ও প্রচার হত এবং অনেক আন্তরিকতার সাথে পড়া হত। ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় এবং নাম করা আলেমদেরকেও কোনো কোনো গোঁড়া ব্যক্তি এই চাপাচাপি ও বিদ্বেষ থেকে সুরক্ষিত থাকতে দেয়নি। তারা নিজেদের নিষ্ঠা ও জ্ঞান গভীরতা সত্ত্বেও এ ধরনের মাসআলার ওপর নিজেদের সময় ও মেধার একটি বিশেষ অংশ ব্যয় করেন। যখন মাওলানা আবুল হাসনাত আব্দুল হাই ফিরিঙ্গি মহল্লী রহ. (মৃত্যু ১৩০৪ হিজরী) নবাব সাইয়িদ সিদ্দীক হাসান সাহেবের কোনো কোনো কিতাবের সমালোচনা করেন, তখন মাওলানা আব্দুন নাছীব সাহওয়ানী তার উত্তরে شفاء العى عما اورده الشيخ عبد الحى (প্রকাশকাল ১২৯৪ হিজরী) নামক ১১২ পৃষ্ঠার একটি কিতাব লেখেন এবং অনেক কঠোর ও রুক্ষ ভাষায় মাওলানার সমালোচনার জবাব দেন। তার উত্তরে মাওলানা আব্দুল হাই রহ. ابراز الغى الواقع فى شفاء العى নামে ৬৪ পৃষ্ঠার আরো একটি পুস্তিকা লিখেন এবং তার সমালোচনার সমর্থন করেন এবং কুদরতীভাবে নিজের স্বীয় জ্ঞানগত স্তর ও জালালতে শানের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। কিন্তু এর ধারা তাতেই শেষ হয়ে যায়নি। মাওলানার এই পুস্তিকার জবাবে মওলভী আবু মুহাম্মদ টুংকী الحز الدواء الكى নামক ২০৮ পৃষ্ঠার একটি কিতাব লেখেন এবং তাতে তিনি যে নীতি অনুসরণ করেন তা প্রকাশযোগ্য ছিল না। যেসব বিষয়ে তিনি সমালোচনা করেছেন তা এতই হাস্য উদ্দীপক, বালসুলভ ও অগভীর ছিল যে, তাতে বিস্মিত হতে হয়। সেই কিতাবের মাধ্যমে সে যুগের চিন্তাধারা ও মানসিক দৈন্যের পুরো চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিতাবের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন,

'যখন কিতাবের প্রচ্ছদের এই অবস্থা তখন বুঝে নাও পুরো কিতাবের বিবরণীতে কী পুঁজি থাকবে। 'বিসমিল্লাহ'-ই শুদ্ধ নয়। কিতাবটিকে দুটি চরণের মাধ্যমে শুরু করেছেন এই ধারণায় যে, তাতে 'বিসমিল্লাহ'তেই এসে গেছে। যদি এসে থাকে তবে দ্বিতীয় 'বিসমিল্লাহ'র কী প্রয়োজন ছিল। তার উপর اعوذ بالله من الشيطان الرجيم লেখার কি প্রয়োজন ছিল। শায়খ হাই (অর্থাৎ মাওলানা আব্দুল হাই ফিরিঙ্গি রহ.)–এর মতে যেন এটি একটি কুরআন। যার জন্যে اعوذ بالله এর প্রয়োজন হয়েছে। কুরআন মজীদের আয়াত ان هذه تذكرة الخ। তার নিদর্শন (অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যেমন কুরআনকে تذكرة বলেছেন, অনুরূপ তিনিও তার কিতাবকে تذكرة হিসেবে উল্লেখ করেছেন। نعوذ بالله من الكفر কিংবা সেই تعوذ

উদ্দেশ্য হবে যে, শ্রোতা استعاذه এর উপযুক্ত। অতঃপর যদি শ্রোতা থেকে استعاذة উদ্দেশ্য হবে তবে শুরু থেকেই কিছু تذكرة একত্রিক করা প্রয়োজন ছিল।

তোমরা যদি নিজের কিতাবকে اعوذ بالله এর মাধ্যমে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর তবে অন্যজনও بسم الله এর পূর্বে একথা লিখতে পারে

اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن همزه و نفخه ونفثه পুরো কিতাবটাই এই ধরনের বক্রাঘাতমূলক বাক্য ও বর্ণনায় ভরপুর এবং তা যুগের দুঃখজনক দৃশ্যপটকে উপস্থাপন করে। সে যুগে যে সকল বিষয়ে উলামায়ে কেরামের শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় হচ্ছিল তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মাটির নিচে নবীদের বিদ্যমান থাকা, আরশের উপর আল্লাহ তাআলার সমাসীন হওয়া, এমকানে কিযব (আল্লাহ তাআলার মিথ্যা বলার সম্ভাব্যতা) এমকানে নযীর, নক্ষত্রের বিদারণ ও সম্মেলন, মুসাফাহা-মুআনাকার বৈধতা ও অবৈধতা, ইয়াযীদকে লানতকরা বৈধ হওয়া কিংবা হারাম হওয়া, শারীরিক মিরাজ অস্বীকারকারীদের কাফের সাব্যস্ত করা–এর মত বিষয়াদি ছিল। আর এসব বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে উভয় দলের পক্ষ থেকে পুস্তিকা ও কিতাবাদি প্রকাশ করার ধারা জোরে শোরে অব্যাহত ছিল।

দ্বিতীয় বড় ক্ষেত্র যেখানে এই ঠাণ্ডা লড়াই চলছিল তা ছিল মাওলানা আহমদ রেযা খান ব্রেলভীর। তার কাছেও যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তন্মধ্যে 'ইমকানে কিযব কিংবা মীলাদ ইত্যাদির মাসআলাসমূহ প্রথম সারির গুরুত্ব বহন করত এবং এসবের উপর কলমী যুদ্ধ সর্বদা অব্যাহত ছিল।

মাওলানা আহমদ রেযা খান ১৩০৭ হিজরীতে 'ইমকানে কিযব' বিষয়ে

السبوح عن عيب كذب مقبوح سجن নামক ১০৪ পৃষ্ঠার একটি কিতাব লেখেন, যাকে তিনি تازيانه بر فرق جهول زمانه (যুগের মুর্খ সম্প্রদায়ের উপর চাবুক) অভিধায় আখ্যায়িত করেন এবং براهين قاطعة নামক কিতাবের খণ্ডন করেন। আর তিনি এই দাবি করেন যে, তিনি এজন্যে দুইশত দলীল পেশ করছেন। কিতাবটিতে স্থানে স্থানে মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.কে মোল্লা গাঙ্গুহী নামে সম্বোধন করা হয়েছে। কিতাবের নামকরণ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

'এই সংক্ষিপ্ত সমুজ্জ্বল অকাট্য পুস্তিকা নতুনত্বের দাবিদারদের বিরুদ্ধে দুইশত চাবুকের পূর্ণ কষাঘাত كذلك العذاب ولعذاب الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون.

আমি যেভাবে এই পুস্তিকার ঐতিহাসিক নাম سبحن سبوح عن عيب كذب مقبوح রেখেছি তেমনি সেসব চাবুকের সংখ্যা কামনা করে যে, তার ঐতিহাসিক 'লকব' دوسو تازيانه بر فرق جهول زمانه রাখব। মোটকথা, সূর্যের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, একদল উলামায়ে দীন-ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই এক-দুইটি কুফর নয়, বরং হাজারো কুফরের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে।

وفى ذلك اقول فكفر فوق كفر فوق كفر

كان الكفر من كثر ووفر.

মুকাল্লিদ ও গায়রে মুকাল্লিদদের সঙ্ঘাত

মুকাল্লিদ ও গায়রে মুকাল্লিদদের মধ্যে মতভেদ ও বিদ্বেষের কিছু ধারণা সেসব বিজ্ঞাপন ও হ্যাণ্ডবিল থেকে পাওয়া যায় যা আমাদের ইতিহাস শিক্ষাগ্রহণের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছে। মাওলানা সাইয়িদ নযীর হুসাইন মুহাদ্দিসের অনুসারী ও তার বিরোধীদের মধ্যে যে সঙ্ঘাত চলছিল, সব আহলে ইলম সে ব্যাপারে অবহিত রয়েছেন।

১৩০০ হিজরীতে যখন মাওলানা হজ্বের জন্য তাশরীফ নিয়ে যান তখন বিরোধীরা সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে 'পাশা' কে মাওলানার প্রতি বিরূপ করার জন্যে পুরোপুরি চেষ্টা করে। তাকে মুতাজিলা ও পথভ্রষ্ট হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং ভারতবর্ষে এই সংবাদ প্রসিদ্ধ করে দেয় যে, পাশা মাওলানা নাযীর হুসাইনকে তদন্ত অনুসন্ধানের পর গ্রেফতার করেছেন এবং তওবানামা লেখার পর তাকে মুক্তি দান করেছেন। এমনকি প্রচার করা হয় যে, তাকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। ১৩০১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে যখন মাওলানা হজ্ব থেকে পত্যাবর্তন করেন তখন তার অনুসারীদের ভর্ৎসনার খুব সুযোগ আসে এবং উভয় পক্ষ থেকে হ্যান্ডবিল ছাপানো শুরু হয়ে যায়। তাতে যে ভাষা ব্যবহার করা হত তা নিতান্ত নীচু স্তরের ও সাধারণ মানের। একটি বিজ্ঞাপন যা সেই 'তওবানামা'র জবাবে গায়রে মুকাল্লিদদের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়েছিল তা আমার সামনে রয়েছে এবং মাওলানা আবুল কাশেম হাঁসুবী রহ. কর্তৃক সংকলিত বিরল সংকলন 'মাকাতীবে কলমী'তে সংরক্ষিত রয়েছে। মাওলানা সাইয়িদ আবুল কাসেম হাঁসুরী রহ. স্বীয় যুগের একজন সাহেবে নিসবত বুযুর্গ ও আরিফ মাওলানা শাহ সাইয়িদ আব্দুস সালাম সাহেব হাঁসুবীর রহ.–এর (মৃত্যু ১২৯৯ হিজরী) ভাতিজা এবং হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ.–এর খলীফা ছিলেন। আলেমেদীন হওয়ার

পাশাপাশি ইলমী ও ঐতিহাসিক বিষয়ের প্রতি তার ভরপুর আগ্রহ ছিল। নিজের যুগের সকল আকাবেরের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতেন। প্রসিদ্ধ আলেম, সুফী ও মাশায়েখদের মূল্যবান চিঠির দুটি বিরল সংকলন রিসালায়ে নূরুল আইন এবং 'বরকাতে আহমদিয়া' তার স্মারক বহন করে আছে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ধারা এভাবে শুরু হয়েছে যে, মনে হয় যেন কোনো বড় কিল্লা বিজয় করেছে এবং কাফের ও নাস্তিকদের শোচনীয় পরাজয় হয়েছে। বাস্তবতা হল এসব ব্যক্তি সেসব ফেকহী মতভেদ ও ইখতিলাফকে– যা সর্বদা ছিল এবং সর্বদা থাকবে–কুফর ও ইসলামের সজ্ঘাত বানিয়ে ফেলেছিল এবং তাতে এমন কঠোরতা অবলম্বন করেছিল যা একজন মুসলমান কেবল অন্য কোনো মুরতাদ বা কাফেরের বিরুদ্ধে করতে পারে। সেই বিজ্ঞাপনের উপরিভাগে এসব শব্দ দেখা যায়–

صدق الله وعده ونصرعبده وهزم الاحزاب وحده.

তাতেও প্রশান্তি আসেনি। তাই عبد এর নিচে ব্যাখ্যাস্বরূপ 'মিঞা সাহেব' লিখেন এবং احزاب এর নিচে লিখেন مقلدين متعصبين এতেও অন্তর ভরে নাই। তাই তার নিচে এক লাল ঘোষণা اعلان دافع طغيان। অতঃপর তার নিচে বিদ্বেষে ভরপুর একটি شعر লেখেন।

এই ইস্তেহার ও অনুরূপ অন্যান্য ইস্তেহার দেখে এমন মনে হয় যে, যেন ইসলামের সকল জয় ও পরাজয় এই এক ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট মনে করা হত। আর সেই বাদানুবাদ ও বিতর্ককে খোদ ইসলাম মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু এই অবস্থা ও প্রেক্ষাপটকে অনুধাবন করার জন্যে তার চেয়েও অধিক মূল্যবান দলীল ও চিঠি রয়েছে যা মাওলানা আবুল কাসেম হাঁসুবী রহ. সেই বাদানুবাদের ঝড়ে অস্থির হয়ে মাওলানা নযীর হুসাইন সাহেবকে লিখেছিলেন। এই চিঠি সেই ব্যথাতুর, উদারমনা ও সুন্দর আন্তরাত্মার অধিকারী শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে যারা প্রবল প্রতিকূল বাতাসের মধ্যেও স্বীয় মোমের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন এবং দুঃসহ পরিবেশে নিরবতার সাথে লড়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বড়ই মনোবেদনা ও ভগ্ন হৃদয়ের সাথে এক জায়গায় লিখেছেন : 'আনুষাঙ্গিক বিষয়ে এই পরিমাণ হাঁ ও না, বঙ্গানুবাদ, নিন্দা ও ভর্ৎসনা প্রবল রূপ ধারণ করেছে যার কোনো মানে নেই। যেন তা 'ফিমা বায়না শিআরিল ইসলাম' তথা ইসলামের নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে যুদ্ধ বিগ্রহের রূপ পরিগ্রহ করেছে। ঈমানী মূলনীতিসমূহের মাসআলা যার উপর ঈমানের ভিত্তি ও ইসলামের অস্তিত্ব নির্ভরশীল তার কোনো আলোচনা নেই।

একটি সময় ছিল যখন মুসলমানরা কাফের ও মুশরিকদরে সাথে লড়াই করত এবং লক্ষ্যবস্তু কাফের ও মুশরিকরা হত। এখন এমন যুগ এসেছে যে, মুসলমানরাই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। মুসলমানরা নিজেদের ধর্ম ও মতাদর্শ এবং ইসলামের ভিত্তিসমূহ সম্পর্কেও অপরিচিত। অথচ একে অপরকে এমন নিন্দা-ভর্ৎসনা করে চলেছে যে, যা কিছু আলো তার রয়েছে তাও যেন অন্ধকার হয়ে যায়। অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার হচ্ছে। মানুষেরা বুযুর্গদের বদনাম করছে। যারাই হকের কথা বলছে তাদের পাকড়াও করা হচ্ছে।

সামনে অগ্রসর হয়ে আরো লিখেছেন–

'সেই তওবানামা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন যা মক্কা মুআজ্জামায় ছাপা হয়েছে এবং তার অনুলিপি কানপুরের নেজামী ছাপাখানা থেকে যমীমায়ে নুরুল আনওয়ার জানুয়ারী ১৮৮৪ ঈসায়ীতে ছাপা হয়েছে তা সঠিক কিনা? আসলে তার ব্যাপারটি কী– জবাব এই চিঠির পশ্চাতে যেন জানানো হয়। (মজমুআয়ে খুতুত কলমী)

সেই ঠিচির পেছনে মাওলানা সাইয়িদ নযীর হুসাইন সাহেব জবাব লেখেন, যাতে তিনি এসব প্রোপাগাণ্ডা ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণার খণ্ডন করেন।

এই এক ঘটনার মাধ্যমে সেই পুরো পরিবেশ পরিস্থিতির চিত্র পাওয়ার যায়– যা নদওয়াতুল উলামা প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারতবর্ষে বিরাজ করছিল। সেটি এমন পরিবেশ ছিল যাতে মধ্যপন্থা অবলম্বনের দাওয়াতকেও অপরাধ বিবেচনা করা হত এবং এমন দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে চলা তেমনই দুষ্কর ছিল যেমনটি স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটতে গিয়ে হয়ে থাকে। যেসব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সে পথে চলতে অস্বীকার করতেন এবং হক পথ অবলম্বন করতেন, তাদের আওয়াজ প্রবৃত্তিপুজা গোড়ামীর সেই শোরগোলে কেউ শুনত না। কওমের চিন্তা-চেতনা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল এবং উলামায়ে কেরামের এক বড় সংখ্যা নিজেদের কিস্তিকে সেই খরস্রোতের সোপর্দ করে দিয়েছিলেন।

হানাফীদের সাথে আহলে হাদীসের বিদ্বেষ ও শত্রুতা এ পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল যে, তা নৈতিক ও মানবিক সীমারেখাকেও অতিক্রম করে গিয়েছিল।

মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই রহ. আজ থেকে ৬৫ বছর পূর্বে দিল্লি ও তার আশে পাশে সফর করেছিলেন। তার সফরনামায় তিনি একটি শিক্ষণীয় ঘটনা উল্লেখ করেন, যা পড়ে নৈতিক অধঃপতন, মতাদর্শের সঙ্ঘাত, চেতনা ও লজ্জা শরমের অনুপস্থিতির চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মুসলমানদের দুরবস্থা এবং উলামায়ে কেরামের দলাদলি দেখে কখনও হাসি আসে কখনও কান্না। একটি উদীয়মান বিজয়ী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা যা উন্নতির দিকে ছিল;

পক্ষান্তরে আর এক পরাজিত, দুরবস্থার শিকার, ভগ্ন মনোরথ, অনুভূতিহীন সম্প্রদায় যারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল–এই দুই জাতির মাঝে এমন এক সজ্ঞাত ছিল যার হার-জিতের ফায়সালা বহু বছর পূর্বে বালাকোটের ময়দানে হয়েছিল। মাওলানা এই ব্যাপারটিকে এমনভাবে বর্ণনা করেন–

'মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব বর্ণনা বলেন, শজিমুণ্ডী এখান থেকে অনেক নিকটে। এই মহল্লায় একজন মাওলানা সাহেব অবস্থান করতেন। তিনি গায়রে মুকাল্লিদ ছিলেন। মিঞা সাহেব (মাওলানা সাইয়িদ নযীর হুসাইন সাহেব) মাদরাসায় অবস্থান করতেন। সেখানে বাড়ী ভাড়া করা হয়েছিল। তাতে একজন বিবি সাহেবাও থাকতেন। সেই মহল্লায় একজন বয়োবৃদ্ধ মিঞাজী সাহেব থাকতেন। তিনি সময়ের পাবন্দী করতেন। মহল্লার লোকেরা তাকে সম্মান করত। একদিন একবৃদ্ধ তাকে এসে বললেন, মাওলানা সাহেবের বিবি আপনাকে ডেকেছেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার কথা শুনবেন। মিঞাজী সাহেব গেলে বিবি সাহেব পর্দার কাছে এসে বললেন, আপনি একজন আল্লাহ ওয়ালা মানুষ, আমাকে এই জালেমের কবল থেকে উদ্ধার করুন। তিনি বললেন, আচ্ছা, ভালো। তিনি বললেন, ভালো কোথায়, মন্দ। তিনি আমার পীর। আমি তার মুরীদ। আমার স্বামী জীবিত। ধোঁকা দিয়ে আমাকে বের করে নিয়ে এসেছেন। মিঞাজী সাহেব শুনে খুবই বিস্মিত হলেন। বাস্তবিকই বিস্ময়ের কথা। আমি যখন এ পর্যন্ত ঘটনা শুনলাম তখন আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। মাওলানা সাহেব বলতে লাগলেন। মিঞাজী সাহেব তাকে সান্ত্বনা দিলেন। অতঃপর চলে আসলেন। তবে সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন। একদিন মাওলানা সাহেব নির্জনে বললেন, আপনাকে চুপিসারে আমার একটি গোপন কথা বলতে হয়, শর্ত হল তা কারো কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না, আপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তিনি বললেন, বলেন মৌলভী সাহেব বলেন, আমিও আপনাদের একই মতাদর্শের অনুসারী। কিন্তু হযরত কী বলব, এই মহল্লার লোকেরা এতই পাষাণ, আপনি জানেন যে, এসব লোক মানুষকে হত্যা করে ফেলে অথচ কেউ টেরও পায় না। যদি আমি প্রকাশ করি তবে আল্লাহ জানেন আমার কী অবস্থা হবে? মাওলানা সাহেব বললেন, আচ্ছা! এটি অনেক সঙ্গত। আপনি আপনার উদ্দেশ্য বলুন। তিনি বলেন, আসল কথা হল, এই মহল্লায় একজন মহিলার সাথে আমার পূর্ণ মাত্রায় ভালোবাসা রয়েছে। কিন্তু তার স্বামী বেঁচে আছে। আমি চাচ্ছি যে কোনো এমন কৌশল অবলম্বন করতে যাতে সে আমার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং শরীয়তেও তা বৈধ হবে। তিনি বললেন, এটি কোনো কঠিন বিষয় নয়। এসব

লোক অর্থাৎ হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা 'মুতাহিল্লুদদম' (অর্থাৎ তাদের হত্যা করা বৈধ) তাদের সম্পদ হল গণীমতের মাল। তাদের বিবিগণ আমাদের জন্য বৈধ। আপনি যদি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারেন তবে আগ্রহের সাথে নিয়ে আসেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে। আমার এতটুকুরই দরকার ছিল এবং সেখান থেকে চলে গেলেন। অন্য সময় মহল্লার গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে এই ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং এই শর্ত আরোপ করলেন যে, তাকে যেন প্রাণে মারা না হয়। তারা সেই মহিলার স্বামীকে ডেকে পাঠাল। যখন মাওলানা সাহেব নামাজের উদ্দেশ্যে সামনে অগ্রসর হলেন তখন এক ব্যক্তি নিতান্ত রুক্ষতার সাথে তার হাত ধরে টান দেয় এবং খুব শায়েস্তা করে। আর স্বামী নিজের স্ত্রীকে নিয়ে চলে যায়। এই ঘটনা সাম্প্রতিক কালের। তা শোনার পর সেই মহিলাকে বের করে নিয়ে আসার ব্যাপারটি আমার কাছে ততটুক আশ্চর্যজনক মনে হয়নি যতটুকু আশ্চর্য লেগেছে হানাফীদের 'মুস্তাহিল্লুদদম' মনে করাকে– যদিও তাদের কোনো অপরাধ না থাকে। ভূপালের অন্ধ আব্দুল্লাহ বলত যে, ভারতবর্ষে কেবল আড়াই জন মুসলমান রয়েছেন। মাওলানা মুহাম্মাদ বশীর সাহেব হানাফীদের কাফের মনে করেন। [দিল্লি আওর উসকে আতরাফ, ৫৯/৬০]

মসজিদগুলো কাফের ও ফাসেক ঘোষণা দেওয়ার আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। তাকে মুকাল্লেদীন ও গায়রে মুকাল্লেদীন পরস্পর পরস্পরকে নীচু দেখানোর জন্যে ব্যবহার করত। মসজিদের মধ্যে হানাফী ও গায়রে হানাফী লেখা হতে থাকে। এক পক্ষ অন্য পক্ষের মসজিদের মধ্যে ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপের ঘটনা বহুল পরিমাণে ঘটতে থাকে। বিশেষ করে মুকাল্লিদদের মসজিদে বাসি গোশতের টুকরা ও অন্যান্য নাপাক বস্তু রাতের বেলা নিক্ষেপ করা হত। সেই সফরনামায় দিল্লির জামে মসজিদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা লিখেছেন, 'সাহরীতে খানা খেয়ে জামে মসজিদে নামাজের জন্য গমন করি। নামাজের পর স্থানে স্থানে ওয়াজ নসীহত চলতে থাকে। মিম্বারে মাওলানা মুহাম্মদ আকবার ওয়াজ করছিলেন। এই বুযুর্গ হানাফীদের খুব বদনাম করে থাকেন। অন্তর খুলে ঘৃণা করে থাকেন এবং এজন্যে অহংকার করে থাকেন যে, হেদায়া পড়ানো থেকে তওবা করেছেন। তিনি বলতেন, আজ কে আছে যিনি হেদায়া পড়ানো থেকে তওবা করে কুরআন মজীদ পড়ানো শুরু করেছেন? সবাই জাহান্নামে যাবে। প্রত্যেক বিষয়ে স্বীয় বড়ত্ব বর্ণনা করতেন। প্রত্যেক আয়াতকে নিজের ও দিল্লিবাসীদের উপর অবতরণ করছিলেন। দিল্লিবাসীদের জালেম ও মুশরিকদের সাথে মিলাচ্ছিলেন এবং নিজের বংশ রাসূলুল্লাহ সা.–এর সাথে معاذ الله ।

অন্যজন আজানখানার পাশে বসেও অনুরূপ হানাফীদের নিয়ে হাস্যরস করছিল। কিন্তু জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যজন আরেক পাশে মুহাদ্দিস ও তার অনুসারী সবার খবর নিচ্ছিলেন। মাথা ঝুঁকানো ও কিয়ামে তাজিমী নিষেধ করার ব্যাপারে শক্ত মন্দ বলছিলেন। চতুর্থ জন হাউজের পাশে বসে কিছু নাত গজল ও মুনাজাতের মাধ্যমে লোকদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছিলেন। মোটকথা, এক পাগলামী ও বিদ্বেষের জোয়ার চলছিল। এই বিদ্বেষের আয়োজন থেকে নিতান্ত দুঃখবোধ হল। আল্লাহর মর্জিতে কারও দখল নেই। যখন মুসলিম রাজত্বের অবসান হল তখন যার মনে যা চায় করুক।

ফৌজদারী ও মামলাবাজী

'ড্রেপার' স্বীয় গ্রন্থ 'মাযহাব ও বিজ্ঞান' –এর মধ্যে এক জায়গায় লিখেন : 'ইসলামের ক্রমবর্ধমান বিজয়কে চার্লস মার্শালের তরবারী প্রতিহত করেনি। বরং তাদের পারস্পরিক অভ্যন্তরীণ সঙ্ঘাতের কারণে ইউরোপ তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়।'

বাস্তবতা হল, মুসলিম মিল্লাতের ঐক্যে ফাটল ধরানো, শক্তিকে দুর্বল করে দেয়া এবং দুশমনকে ভেতরে প্রবেশের সুযোগ যেসব আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ যতটুকু করে দিয়েছে, বাইরের আক্রমণ ততটুকু দেয়নি। মাযহাবী গোঁড়ামী ও দলাদলী এই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, তার দৃষ্টান্ত সম্ভবত ভারতবর্ষের ইতিহাসে না বিগত শতাব্দীগুলোতে দেখা গেছে, না পরবর্তী সময়কালে। মুনাজারা, কাফের ও ফাসেক ঘোষণা, বদনাম ও মিথ্যারোপের সীমা থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে মামলা-মোকদ্দমা অমুসলিম বিচারকদের কাছে পেশ করা হতে থাকে। যার ফলে অমুসলিমদের হাসার সুযোগ তৈরি হচ্ছিল।

ফলে কেউ ইংরেজ ও হিন্দুদের নয়, স্বয়ং মুসলমানদেরও নিজের দীন ও সংস্কৃতি নিয়ে এক ধরনের খারাপ ধারণা সৃষ্টি হচ্ছিল। তাদের সামনে একদিকে ইংরেজদের ঐক্য, ঈসায়ীদের সহমর্মিতা এবং কর্মতৎপরতা ছিল। অন্যদিক দলীয় গোঁড়ামীর এমন দুঃখজনক প্রদর্শনী ছিল যে, যা কল্পনা করলে একজন মুসলমানদের মাথা লজ্জায় নত হয়ে যায়। মির্জা হায়রাত দেহলভী দুই সহোদর ভাইয়ের দুঃখজনক লড়াই ও চাক্ষুস ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন, যা পড়ে মুসলমানদের দুরাবস্থার চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

'আমি এই রক্তক্ষয়ী দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করেছি। আমি সহোদর ভাইদ্বয়ের লড়াই স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছি। জবানীতে এই হৃদয়বিদারক ঘটনা শুনেছি যখন তিনি আপন সহোদর ছোট ভাইয়ের হাত ভেঙ্গে দিয়েছেন।

দুঃখের বিষয়! আমরা যদি মুসলমানই না হতাম তবে এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটত না। যখন ছোট ভাই ধরাশায়ী হয় এবং এক বিকট চিৎকার দেয় তখন বড় ভাইয়ের অন্তরে তা আঘাত হানে এবং ভ্রাতৃত্বের রক্তের টান জোরে জোরে তার শিরা-উপরিশায় প্রবাহিত হতে থাকে। হাত থেকে লাঠি ফেলে দেন। দৌড়ে এসে আপন ভাইকে জড়িয়ে ধরেন এবং উল্লিখিত কথা বলে বলে সেসব মৌলভীকে উদ্দেশ করে বেয়াদবীপূর্ণ বচন আওড়াতে থাকে যারা পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি মারামারিতে প্রবৃত্ত করে এবং এ পর্যন্ত পৌছার ব্যবস্থা করে দেয়। এই ঘটনার মধ্যে কেবল পাঞ্জাবীরা ছিল (পাঞ্জাবের অধিবাসী উদ্দেশ্য নয়, বরং সেসব লোক উদ্দেশ্য যারা দিল্লিতে প্রসিদ্ধ ছিল। [মাকাসেদে নদওয়াতুল উলামা, পৃষ্ঠা : ১৪]

এই পাঞ্জাবীদের সম্পর্কে মির্জা হায়াত লিখেছেন : 'তারা হলেন সেসব লোক যারা ইয়াতীমখানা ও মাদরাসা নির্মাণের ক্ষেত্রে সামনে সামনে থাকতেন এবং প্রত্যেক সামাজিক ও উপকারী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আগ বেড়ে অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্যে তৈরি থাকতেন। আর ইসলামের নামে বড় বড় কাজ ও কুরবানি করার জন্যে সবার সামনে তাদের দেখা যেত।

কিন্তু সেসব লোকের যেই যোগ্যতা ও সামর্থ্যের জন্য যে ময়দান উলামায়ে কেরাম তাদের জন্য পছন্দ করেন তার উল্লেখ ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ফলে এই কওম দেখতে দেখতে بأسهم بينهم شديد এর জীবন্ত নমুনায় পরিণত হয়। যাদের বিভিন্ন গুণাবলী ও যোগ্যতা একই সুতোয় গাঁথা ছিল তাদের পরস্পর হাতাহাতি ও অন্যের রক্তপিপাসু হিসেবে নজরে আসতে থাকে। আর তারা দীন ও মাযহাব এবং ভদ্রতা ও মানবতার কাছাকাছিও বাকি থাকে নি।

মির্জা হায়াত দেহলভীর পুস্তিকা 'মাকাসেদে নদওয়াতুল উলামা থেকে জানা যায়, দিল্লিতে কোটলাওয়ালী মসজিদে কেবল আমীন বিল যেহর এর উপর ঝগড়া এ পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যে, দুইটি ভিন্ন দল তৈরি হয়ে যায়। একদল চাচ্ছিল যে, আমীন জোরে জোরে বলা হবে, অন্যদল চুপে চুপে। এতে কঠিন বিবাদ হয়। অনেক লোক আহত হয়। অতঃপর মামলা হয় এবং এতে হাজারো টাকা নষ্ট হয়। তবে ফল এই দাঁড়াল যে, উভয় দলের মধ্যে সবসময়ের জন্য বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং এখনও পর্যন্ত তা শেষ হয়নি।

অনুরূপভাবে মীরাঠে মুকাল্লিদীন ও গায়রে মুকাল্লিদীনের সংঘাত এত বেড়ে গিয়েছিল যে, হাইকোর্ট পর্যন্ত মামলা গড়ায়। মির্জা হায়রাত তা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন :

'চীফ জাস্টিস এখনও মাহমূদকে (যখন তিনি চীফ জাস্টিস এর সিদ্ধান্তের ওপর সমালোচনা করেন) মামলার ফায়সালা করার জন্যে অনুমতি দেন। জবাব মাহমূদ সাহেব যে সিদ্ধান্ত ও ফায়সালা দিয়েছিলেন তা এতই সুসংহত ছিল যে, যদি উভয় পক্ষ তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যেত তবে সামনে আর কোনো ঝগড়া থাকত না। কিন্তু না। নতুন নতুন মুকাদ্দমা দায়ের হতে থাকে। আর এমন নতুন নতুন শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি হয় যে, পরস্পর বিরোধিতার ভিত্তি কায়েম হয়ে যায়, যার ধারা এখনও পর্যন্ত শেষ হয়নি।'

তাছাড়া আলীগড়ের প্রসিদ্ধ বিষ খাওয়ানোর মামলা এই আক্ষেপ ও দুঃখজনক ঘটনার আরও একটি দৃষ্টান্ত। মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেবকে বিষ প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি কষ্ট পাওয়ার পরও বেঁচে যান। লাঠালাঠি হয়। মামলা দায়ের চলে এবং এমন সব কাজ হয় যা মুসলমানদের মাথা লজ্জায় হেট করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্যে একটি কলংকের ছাপ। মির্জা হায়াত–এর ভাষ্যমতে,

'যদি এই সকল অবস্থা বিস্তারিত লেখা হয় এবং পৃথক কিতাবের আকারে সেই মর্মবিদারক ঘটনাসমূহ সন্নিবেশ করা হয় তবে তা এমন ইতিহাস হবে যা শত শত বছর পর্যন্ত আমাদের আগামী শিষ্ট প্রজন্মকে বিশেষভাবে এবং অন্য ধর্মের লোকদের সাধারণভাবে আমাদের ও বর্তমান ইসলামের উপর হাসি ঠাট্টা করার সুযোগ করে দেবে।' [মাকাসেদে নদওয়াতুল উলামা]

কদীম ও জাদীদের সমস্যা

পাশাপাশি পায়ে পায়ে নতুন ও পুরাতনের সঙ্ঘাত চলছিল। একদিকে সেই শ্রেণি ছিল যারা প্রত্যেক জায়েজকে নাজায়েজ মনে করত। অন্যদিকে ছিল যারা প্রত্যেক নাজায়েজকে জায়েজ করে রেখেছিল। আকবর ইলাহাবাদীর ভাষায়–

ادھر یہ ضد ہے کہ لیمنڈ بھی چھو نہیں سکتے

ادھر یہ ہٹ ہی کہ ساقی صراحی سے لا

'একদিকে এই কড়াকড়ি ছোঁয়া যাবে না লেবুর শরবত।

অন্যদিকে এই হঠকারিতা চেয়ে নেয় পানীয় মদ।'

পরিবর্তিত পৃথিবী এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবে প্রভাবিত হয়ে অনেক বড় একটি শ্রেণি এ সকল পরিবর্তনের খুঁটিনাটি সাদরে বরণ করে নেয়াকে সবচেয়ে উপকারী ও দীনের খেদমত মনে করতে থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণি, যারা

সম্ভবতঃ এদের থেকেও বড় ছিল, এসব বিষয় পাশ কাটিয়ে যাওয়া এবং দেখেও না দেখার ভান করার উপর তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত ছিল। না তাদের ভবিষ্যতের ভয়ানক শংকার পূর্ণ অনুভূতি ছিল, না তা প্রতিহত করার জন্যে যথেষ্ট পুঁজি ও সরঞ্জাম।

উম্মত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক শ্রেণি ছিলেন তারা যাদের পুরনো দর্শনের অর্থহীন ও বিভ্রান্তিকর নিছক অনুমানসমূহ এজন্যে মনঃপূত ছিল যে, তাতে পুরনত্বের ছাপ রয়েছে। বস্তুত অনেক উপযোগী ও উপকারী জ্ঞান-বিজ্ঞান কেবল এ জন্যেই অগ্রহণযোগ্য ছিল যে, তার উপর নতুনত্বের অপবাদ ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণি ছিলেন তারা যারা কুরআন-হাদীস, ফেকাহ- তাফসীর ও ইসলামী ইতিহাসকেও মানতিক, ফালসালা ও হায়য়েয়াত হানদাসার মত প্রাচীন গল্পকাহিনী মনে করেছিল। নতুন ও পুরাতনের এই ব্যাপক ও সাধারণ ভ্রান্তি দেশের সর্বত্র বিরাজমান ছিল এবং সাধারণ বিশেষ নির্বিশেষে সকলে এতে লিপ্ত ছিল। কারও এই হুঁশ ছিল না যে, তারা এই বিষয়টিকে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে চিন্তাভাবনা করবে এবং তার কোনো সমাধান পেশ করবে।

একজন নতুন ও সমন্বিত গুণের অধিকারী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা

ঊনবিংশ শতাব্দীর এই ভারতবর্ষ যার চিত্র বিগত পৃষ্ঠাসমূহে অঙ্কিত হয়েছে এমন এক ব্যক্তিত্বের অপেক্ষায় ছিল যার দৃষ্টি নতুন ও পুরাতনের এই অদ্ভুত ও ভিত্তিহীন সীমারেখা থেকে ঊর্ধ্বে হবে। যার ভালো-মন্দ ও উত্তম-অনুত্তমের মানদণ্ড ইতিহাস ও জামানা হবে না, বরং ইতিহাস ও জামানা স্বয়ং তার অনুগামী হবে। ইসলাম এজন্য উত্তম ও শ্রেষ্ঠ নয় যে, তা আজ থেকে ১৪০০ (চৌদ্দশত) বছরের পুরনো ধর্ম, বরং তার শ্রেষ্ঠত্ব এজন্য যে, তা আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ দীন। প্রশংসাযোগ্য নয় এজন্য যে, তা বিংশ শতাব্দীর শিল্প ও উন্নতির যুগে উদ্ভাবিত হয়েছে। বরং এজন্যে যে, তা মানুষের জন্য উপকারী এবং তা সৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই পরিবর্তনের যুগে এমন এক ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল যার মধ্যে না মাদরাসাসমূহের প্রত্যেক পুরনোকে মহব্বত এবং নতুনের প্রতি বিদ্বেষ থাকবে আর না আধুনিক শ্রেণির মত পশ্চিমাদের মানসিক গোলামে পরিণত হয়ে অন্ধ অনুসরণের শিকার হবে। আর না তার মধ্যে আনুষাঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের প্রতি বাড়াবাড়ি থাকবে। আর না দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ ও প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গের ক্ষেত্রে নমনীয়তা ও উদাসীনতা থাকবে। তিনি একদিকে যুগের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন, দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক পরিবর্তন এবং নতুন প্রজন্মের মানসিক ঝোঁক সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হবেন।

অন্যদিকে ঈমান ও ইয়াকীনের ধারক ও দায়ী, মারেফাতে ইলাহীর ভেদসমূহ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল, রুশদ ও হেদায়েত এবং ইসলাহ ও তারবিয়াতের কাফেলার সেনাপতি; আকায়েদ ও মৌলিক বিধানের ক্ষেত্রে ইস্পাতসম কঠিন এবং ইজতেহাদী মাসায়েল ও আনুষঙ্গিক মতভেদের ক্ষেত্রে রেশমতুল্য নমনীয়। তার মধ্যে কল্যাণকর চিন্তাভাবনা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা ও সামর্থ থাকবে এবং তিনি কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার আলোকে, অধিকন্তু স্বীয় জ্ঞান-গবেষণা ও দূরদৃষ্টি, ঈমানী অন্তর্দৃষ্টি, ইলম ও অধ্যয়ন এবং ধীশক্তি ও ভাবনা চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে সেসব চিন্তা, পরিকল্পনা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে পরিমার্জন ও সংযোজন করতে সক্ষম হবেন এবং সেগুলোকে স্বীয় নিয়ম-নীতির অনুগামী এবং পরিবেশের সাথে সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে সক্ষম হবেন।

মোটকথা, একজন এমন ব্যক্তি প্রয়োজন ছিল যিনি ঈমান, ইয়াকীন ও আধুনিক জ্ঞান, আত্মিক শক্তি ও আধুনিক যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও ভালোবাসা, জ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতি, চলনসই পুরনো উত্তরাধিকার, নতুন জ্ঞান ও তথ্যের (যা অধিকাংশ লোকই পরস্পর বিপরীত মনে করে থাকে) মধ্যে সম্মিলন ঘটাতে পারবেন এবং তাতে যথার্থ ও মর্যাদা ভেদের স্তর যথাযথ রাখতে সক্ষম হবেন যা সমকালের মৌলিক প্রয়োজন ছিল।

এই ব্যক্তিত্ব ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ.–এর মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। যার আলোচনা এই কাগজসমূহের সৌন্দর্য এবং লেখকের জন্যে সৌভাগ্যের বিষয়।

মাওলানার ব্যক্তিত্বের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

মাওলানার স্বভাব চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে, তন্মধ্যে তিনটি বিষয় খুবই উল্লেখযোগ্য, যার মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিত্ব চেনা সহজ হবে।

মাওলানার জীবনী এবং তাঁর ধর্মীয় ও সংস্কারধর্মী কাজ পর্যালোচনা করলে প্রথম এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, দরসে নেজামী এবং পারস্পরিক মতবিরোধের এই পরিবেশে যা পুরো দেশের সর্বক্ষেত্রে ছেয়ে গিয়েছিল এবং তর্ক-বিতর্ক ও বাদানুবাদের এই পরিবেশে যা থেকে কম বেশি কোনো ইলমী ও ধর্মীয় শ্রেণি সুরক্ষিত ছিল না। মাওলানা রহ. নিজেকে এসবের বিষাক্ত প্রভাব থেকে কিভাবে সুরক্ষিতই রাখলেন বরং ১৩১০ হিজরী সনে কিভাবে এই কালোত্তীর্ণ আন্দোলন ও বিপ্লব 'নদওয়াতুল উলামা' প্রতিষ্ঠা করেন, যা কেবল ভারতবর্ষেই নয়, বরং

পুরো মুসলিম বিশ্বে একটি স্বতন্ত্র ও সাহসী পদক্ষেপ ছিল। বস্তুতঃ যার বুনিয়াদই ছিল নতুন ও পুরাতনের মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করা এবং পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ দূরীভূত করা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল আধুনিক ধ্যান-ধারণা ও আধুনিক চাহিদা সম্পর্কে মাওলানার যে অবগতি ছিল এবং সময়ের পরিবর্তনের ও বিবর্তনের যে অনুভূতি মাওলানার মধ্যে বিদ্যমান ছিল তা কিভাবে সৃষ্টি হয়? আর তার উপায়-উপরকণই বা কী চিল?

তৃতীয়তঃ এই প্রশ্ন সামনে আসে যে, মাওলানা ইরশাদ ও সুলূক, আত্মশুদ্ধি ও তারবিয়াতের ক্ষেত্রে যে উঁচু মর্যাদা ও অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিলেন তার এই চেতনা ও অভিরুচি কিভাবে অর্জিত হয় এবং এসব ক্ষেত্রে এই সুন্দর ও প্রশাংসনীয় সংমিশ্রণ কীভাবে সৃষ্টি হয় যা তাকে সাধারণভাবে মুসলিম ভারতের জন্যে এবং বিশেষভাবে নদওয়াতুল উলামার সন্তানদের ও খাদেমদের জন্যে একটি আদর্শ নমুনা, নদওয়াতুল উলামার ধারণার ও চিন্তাচেতনার জীবন্ত মুখপত্র ও এক অনুসরণীয় আদর্শে পরিণত করেছিল।

প্রথম উপাদান

প্রথম প্রশ্নের ব্যাপারে একথা দৃঢ়তার সাথে বলা যেতে পারে যে, মাওলানার মেধা ও দৃষ্টির স্বচ্ছতা, সরলতা ও দলাদলির সংঘাত থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে তার পারিবারিক পরিবেশে ও সমাজের বড় ভূমিকা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে তিনি এমন কোনো দলের সাথে সম্পর্ক রাখতেন না যারা সেই স্নায়ু যুদ্ধের শিকার। তাঁর পিতা-মাতার, তার শিক্ষক ও তার সহপাঠীদের মধ্যে অধিকাংশই এমন ছিলেন যারা সেসব বিষয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না, আর না তার সেসব মতভেদপূর্ণ বিষয়ে অধিক আগ্রহ রাখত। তাঁর বাল্যকালের সাথী ও দোস্ত মাওলানা ইমাম আলী একজন মুত্তাকী ও নেককার ব্যক্তি ছিলেন। সেই ঝগড়া-বিবাদের সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। মুফতি এনায়েত আহমদ কাকুরী এবং মাওলানা লুৎফুল্লাহ আলীগড়ির ছাত্রজীবন ও শিক্ষকতাজীবনে দিবানিশির ব্যস্ততার কারণে এ সুযোগ ছিল না যে, সেসব বিষয়ে সময় নষ্ট করবেন। মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেব নিজের ইলমী মর্যাদা, সাধারণের উপকার সাধন এবং খ্যাতি সত্ত্বেও অনেক বিনয়ী ও শরীফ মনের মানুষ ছিলেন এবং অনেক ভারসাম্যপূর্ণ, সমন্বিত গুণের ধারক ও সম্প্রীতি পরায়ণ মানুষ ছিলেন। তিনি তার পুরো জীবনে কখনও কাউকে কাফের ঘোষণা করেননি। এই কারণেই নদওয়াতুল উলামা প্রতিষ্ঠার পর তিনি তাতে সবসময় শরীক ছিলেন এবং এর অনেক বার্ষিক জলসার সভাপতিত্ব

করেন। তা ছাড়া শুরুর দিকে মাওলানা শাহ্ কারামত আলী রহ. এবং তার পরে মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ.–এর মুরীদ ও বায়আত হওয়ার কারণে তার তাওয়াজ্জুহ সেসব বিষয়ের দিকে কমে যায়।

সেই সমাজ ও পরিবেশের কারণে তিনি না কেবল সেই পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকতে পেরেছিলেন বরং বাইরে থেকে তিনি এই সংঘাত ও মুসলিম সমাজের উপর এই ভ্রান্তিকর প্রভাবের পর্যালোচনা করেন। সেই পরিবেশ তো তাকে নিশ্চিতভাবে সুরক্ষিত করে দিয়েছিল, কিন্তু গণ্ডিবদ্ধ করে দেয়নি। অন্য আলেমদের সাথে তার সম্পর্ক সবসময় বজায় ছিল। এর ফলে এই উপকার হয় যে, একদিকে তিনি মধ্যপন্থা ও সংযমী মতাদর্শের ওপর দৃঢ়তার সাথে কায়েম থাকতে পেরেছেন। অন্যদিকে আলেমদের মানসিক অবস্থা ও তাদের মতভেদের স্বরূপ ভালোভাবে তাঁর কাছে প্রস্ফুটিত হয়। হাদীস ও ফেকাহশাস্ত্রের সাথে আসক্তি বাল্যকাল থেকেই ছিল এবং মানতিক ও ফালসাফার প্রতি মন বিরাগ ও বিরূপ ছিল। তাই তিনি এসব অহেতুক বিষয়ে মানুষের মেধা ও যোগ্যতাকে অযথা নষ্ট করা কোনোভাবে যথার্থ মনে করেননি।

যদি মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ. কোনো এমন দলের সাথে সম্পর্ক রাখতেন যারা এই সংঘাত ও বাদানুবাদের সাথে জড়িত ছিল, তবে ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি নিজের মন-মস্তিষ্ক, চিন্তা-চেতনা ও আবেগ-অনুভূতিকে তার প্রভাব থেকে কোনোভাবে মুক্ত রাখতে পারতেন না। তার ছায়া পড়া অনিবার্য ছিল। কিন্তু কুদরতে খোদাওয়ান্দী তাঁর জন্যে যে সরঞ্জাম তৈরি করেছিলেন তার কারণে তার সেই অবস্থা অনুধাবন করা, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তা অধ্যয়ন, উদারতা ও আন্তরিকতার সাথে চিন্তা করা এবং সমাধান অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বড় রকমের সহায়তা পাওয়া যায় এবং সেই সুযোগ থেকে তিনি পুরোপুরিভাবে উপকার লাভ করেন।

দ্বিতীয় উপাদান

আধুনিক চিন্তা-চেতনা ও আবেগ অনুভূতির সাথে মাওলানা যে পরিচিত হয়েছিলেন তার বড় অংশ এসেছে তার সেই কার্যক্রমের ফলে যা তিনি খৃস্টধর্মের ক্রমবর্ধমান সয়লাবকে প্রতিহত করার জন্যে আঞ্জাম দিয়েছিলেন। মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানবী রহ. এবং ডক্টর উজীর খাঁর পরে এই ফেতনার মূলোৎপাটনের জন্য যেই ব্যক্তিত্ব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কাজ আঞ্জাম দিতে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি ছিলেন মাওলানা রহ.–এরই ব্যক্তিত্ব। তিনি কলম ও জবানের মাধ্যমে খৃস্টান মিশনারিদের পূর্ণরূপে মুকাবেলা করেন। আর এভাবে

কুদরতী পন্থায় তিনি মিশনারিদের কর্মকৌশল, আধুনিক উপরকণ ও সরঞ্জাম ব্যবহার এবং তাদের কলাকৌশল বাস্তবিকভাবে তার সামনে আসে এবং তিনি দেখতে পান যে, এসব লোক কোন কোন ময়দানে কাজ করে এবং কী কী সরঞ্জাম ও উপায়-উপরকণ ব্যবহার করে। কানপুরে ইয়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা, যেখানে ইয়াতীম ও অভিভাবকহীন শিশুরা শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং খৃস্টান মিশনারিদের জালে না পড়ে যায় সেই অভিজ্ঞতাও মুকাবেলার ফসল ছিল।

দরসের গণ্ডি থেকে বের হয়ে সেসব মিশনারির মুকাবেলা করার ফলে নতুন কর্মপদ্ধতি ও আধুনিক মন-মানসিকতার এক নতুন জগত মাওলানার সামনে উন্মোচিত হয়। তিনি নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেন। পরিবর্তনশীল পৃথিবীর বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবগতি লাভ করেন। যেসব দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করা মিশনারিদের বিশেষ কৌশল ছিল তা তিনি অবগত হন এবং সেসব দুর্বলতাকে দূরীভূত করার দিকে মনোযোগী হন। মিশনারিদের পারস্পরিক ঐক্য, নম্র আচরণ, সম্প্রীতির মনোভাব এবং কৌশলী কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। তার মুকাবেলায় উলামায়ে কেরামের কঠোর মনোভাব এবং পারস্পরিক বাদানুবাদের দৃশ্যও সামনে আসে। সময়ের চাহিদা ও যুগের সমস্যা সম্পর্কে মিশনারিদের সচেতনতার বিপরীতে উলামায়ে কেরামের বিচ্ছিন্নপ্রিয়তা, পুরাতনের প্রতি আসক্তি এবং সময়ের চাহিদা ও যুগের সমস্যা সম্পর্কে অজ্ঞতা স্পষ্ট ছিল।

অবস্থাদৃষ্টে মাওলানার এই ধারণা হয় যে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বিপ্লবী পরিবর্তন দরকার এবং যতদিন এই পরিবর্তন সাধিত হবে না মাদরাসাসমূহের বর্তমান পরিবেশ ও অবস্থার উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসবে না।

তৃতীয় উপাদান

তাসাওউফ ও দাওয়াত, ছুলুক ও তারবিয়াতের সাথে সেই আবেগ অনুভূতি ও রুচি-অভিরুচি বেড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাবাদী রহ.-এর সাহচর্য ও তারবিয়াতের বড় ভূমিকা ছিল। সৌভাগ্য ও আল্লাহ তাআলার নিয়ামত বলা চলে যে, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ.-এর শায়খও এমন মোল্লা ছিলেন যার আঁচল ফালসাফা ও মানতিকের বাড়াবাড়ি থেকে সম্পূর্ণ পাক ছিল এবং যার মেধার প্রসারতা এবং অন্তরের উদারতার অবস্থা এই ছিল যে, তিনি স্যার সাইয়িদ আহমদ খান সাহেবের ব্যাপারেও প্রশংসাসূচক বাক্য উচ্চারণ করেছেন। অথচ তিনি সমকালীন উলামায়ে কেরামের নিকট সমালোচিত ছিলেন এবং হাজী ওয়ারেছ আলী সাহেব দিওভী যিনি আপন অবস্থা ও চাল-

চলন, দৃষ্টিভঙ্গি ও কিছু শরীয়ত পরিপন্থী কর্মকাণ্ডের কারণে উলামায়ে কেরামের নিকট প্রশ্নবিদ্ধ ছিলেন, তার নিন্দাবাদও তিনি তাঁর মজলিসে সহ্য করেননি।

মাওলানা ফযলে রহমান সাহেবের এই মন-মানসিকতার অনুমান একটি ঘটনা থেকে ভালোভাবে হতে পারে। যাতে তিনি একজন শিয়ার সাথে অসাধারণ আচরণ করেন এবং নিজের সদাচারের এক বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক প্রমাণ দেন।

মাওলানা শাহ্ তাজ্জাম্মুল হুসাইন বিহারী, যিনি মাওলানা রহ.–এর খলীফা ছিলেন, স্বীয় কিতাব কামালাতে রহমানিতে লিখেছেন :

'শিয়াদের শহর পূর্ণিয়ার জমিদার হাকীম সাহেব প্রসিদ্ধ ছিলেন। হযরত কেবলা রহ.–এর কাছে তাশরীফ নিয়ে আসেন। তথাকার কিছু মহিলা শোরগোল শুরু করে যে, একজন রাফেজী মসজিদে প্রবেশ করছে। হযরত কেবলা রহ. তাদের বললেন, তোমরা তোমাদের কামরার মধ্যে থাক এবং তিনি বললেন, সে হযরত আলী মুরতাজা রহ.–এর মেহমান। অনেক কথাবার্তার পর সেই শিয়া লোকটি বলেন, আপনার সম্পর্কে ভক্তি তো জন্মেছে, তবে আমি মুরিদ হব না এবং আমার মতাদর্শও ছাড়ব না। হযরত বললেন, মতাদর্শ ছেড়ে কাজ কী? হযরত আলী মুরতাজা রহ.–এর সাথে মহব্বত রাখ এবং বিবি ফাতেমা এবং ইমাম হুসাইন রা.– এর সাথেও মহব্বতও রাখ। তবে একটি কবিতার উপর আমল করবে। আর সে কবিতা হল :

نہ تھی عیب کی جب ہمیں اپنی خبر رہے

دیکھتے اوروں کے عیب وہنر

پڑی اپنی خطاؤں پر جب کہ نظر

تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا

'ছিল না যখন নিজের কাছে

আপন ত্রুটির খবর

পরের ভুলেরই ওপর কেবল

পড়ত নিজের নজর

স্বীয় ভ্রান্তিগুলো যবে

উঠল ভেসে আঁখি পরে

মন্দ কেউ রইল না আর

মম অন্তরে।'

তিনি যখন নিজের এলাকার ফিরে যান, তখন রাত দিন চলতে ফিরতে কেবল এই কবিতাই আওড়াতেন। তার জন্য কোনো কাজ ছিল না। (অবশেষে সেই লোক আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অনুসারী হয়ে যান) [কামালাতে রহমানী, পৃষ্ঠা : ২৬]

গায়রে মুকাল্লিদীনের সাথে তার কী মনোভাব ছিল তার ধারণা এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে। উপরোক্ত লেখক তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন :

'এক গায়রে মুকাল্লিদ মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম আরা সাহেব শেষ দিকে তাসাউফের রং ধারণ করেন। একদিন মুরাদাবাদের মসজিদে এসে উচ্চস্বরে তাকবির বলেন। লোকেরা এই বলে শোরগোল শুরু করে দেয় যে, একজন ফেতনাবাজ গায়রে মুকাল্লিদ কোথা থেকে এসে গেছে। হযরত কেবলা সবাইকে থামালেন এবং বললেন যে, হাদীসের সাথে বেয়াদবী করবে না। আবু দাউদ শরীফে এমন একটি বর্ণনাও এসেছে।' [কামালাতে রাহমানী]

মাওলানা ফযলে রহমান রহ.- মা'কুলাতের ঘোর বিরোধী ছিলেন। মাওলানা মুহাম্মাদ আলী নিজেই ইরশাদে রহমানীতে লিখেছেন, ছাত্র জীবনে যখন হযরত মাওলানা রহ.-এর সাথে আমার সাক্ষাত হয় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কী পড়ো? আমি বললাম, কাযী মোবারক। তিনি বললেন, আসতাগফিরুল্লাগ। নাউযুবিল্লাহ! কাযী মোবারক পড়ো? তাতে কী লাভ? আমরা মনে করি যে, মানতিক পড়ে কাযী মোবারকের মত হয়ে গেছি, তারপর কী? কাযী মোবারকের কবরে গিয়ে দেখ কী অবস্থা? আর একজন বে-ইলম-এর কবরে যাও যার সাথে আল্লাহ তাআলার সম্পর্ক ছিল তার উপর কেমন নূর ও বরকত রয়েছে? [ইরশাদে রাহমানী : ৪,৫]

কামালাতে রাহমানীর লেখক লিখেছেন-

'একবার মাওলানা আহমদ হাসান কানপুরী রহ. হযরত মাওলানা রহ.-এর কাছে তাশরীফ নিয়ে যান। তখন তিনি স্বভাবঅনুযায়ী জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কী পড়াও? তিনি সব শাস্ত্রের নাম বলেন। মাকুলাতের কথা বেশি বলেন। হযরত রহ. মাকুলাত পঠন-পাঠনের অনেক নিন্দা করেন এবং বলেন মানতিক বেশি পড়ানোর ফলে অন্তর কালো হয়ে যায়। হাদীস ও ফেকাহ বেশি পড়বে।'

এই কারণেই মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ.-এর সাথে সম্পর্কের কারণে তার সেই মন মানসিকতা এবং চিন্তাধারা আরও সমুজ্জ্বল হয়। এই সাহচর্য তাকে দুই প্রদীপের কাজ দেয় এবং তাকে দুই দিককে সমন্বিত করা এবং উভয় দিকের সীমারেখা অনুধাবনের ক্ষেত্রে বড় রকমের সহযোগিতা করে। তার ফলাফল দাঁড়াল এই যে, একদিকে তিনি একটি নতুন নেসাবে দরস এবং শিক্ষা পদ্ধতির পরিপূর্ণ নকশা পেশ করেন- যা সে যুগের জন্য সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ এবং মুসলিম মিল্লাতের নতুন নতুন সমস্যা ও প্রতিকূল অবস্থানসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পুরোপুরি যোগ্যতা রাখে। অন্যদিকে তিনি একজন আধ্যাত্মিক রাহবার এবং সংস্কারক ও মুরব্বী হিসেবে দুনিয়ার সামনে আত্মপ্রকাশ করেন- যার মাধ্যমে হাজারো লাখো আল্লাহর বান্দার সংশোধন ও আত্মশুদ্ধি ঘটে এবং তার ফয়জ ও প্রভাবে এক বড় সংখ্যক মানুষ উপকৃত হয়। বিবেক ও হৃদয়ের এই সুষম ও যথার্থ সম্মিলন, আত্মিক অবস্থা ও হালাত এবং নজরের প্রশস্ততা ও সমুচ্চতার এই সফল নমুনা সে যুগের একটি বিরল দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ এটি মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ.-এর সেই বিশেষত্ব যা তাকে ভারতবর্ষের ইসলামী ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র স্থান দান করে এবং তাঁর মর্যাদাকে দ্বিগুণ করে দেয়।

চতুর্থ অধ্যায়

নদওয়াতুল উলামা প্রতিষ্ঠা এবং মাওলানার পরিচালনা ও উন্নয়নকাল

প্রথম মৌলিক সম্মেলন

উলামায়ে কেরামের 'পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, ফিকহী মতভেদের প্রাবল্য, মৌলিক সমস্যাসমূহ উপেক্ষা, সাময়িক কিংবা কৃত্রিম সমস্যাবলী নিয়ে শক্তি পরীক্ষা, তর্ক-বিতর্কের বাড়াবাড়ি, পরস্পরকে কাফের ঘোষণার রীতি, নিত্য-নতুন ফেতনা সম্পর্কে উদাসীনতা, অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ নিয়ে অধিক ব্যস্ততা– এ ছিল এমন এক হতাশাব্যঞ্জক সময়কাল, যখন মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ. নদওয়াতুল উলামার ধারণা মুসলিম ভারতের সামনে পেশ করেন। ১৩১০ হিজরী মুতাবেক ১৮৯২ ঈসায়ী সালে মাদরাসা ফয়জে আম কানপুরের দস্তারবন্দী সম্মেলনে উলামায়ে কেরামের একটি পরামর্শ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, উলামায়ে কেরামের একটি পৃথক সংস্থা ও আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং পরবর্তী বছর দস্তারবন্দী সম্মেলনের সময়ে প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। আর তাতে ভারতবর্ষের নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কেরামকে অংশগ্রহণ করতে দাওয়াত দেওয়া হবে।

এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন আলেমের নাম নিম্নে তুলে ধরা হলো। তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি ছিলেন যারা সে সময় বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা মুসলিম ভারতের আকাশে চন্দ্র-সূর্য হয়ে আলো ছড়িয়েছেন এবং এর পরিবেশকে জ্ঞান-গরিমা ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুবাসিত করেছেন।

০১. শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান রহ. (দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক)

০২. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. (শিক্ষক, মাদরাসা জামেউল উলূম কানপুর)

০৩. মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহ. (দারুল উলূম দেওবন্দের সহকারী প্রধান শিক্ষক)

০৪. মাওলানা শাহ মুহাম্মদ হুসাইন ইলাহাবাদী রহ.

০৫. মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ.

০৬. মাওলানা লুৎফুল্লাহ আলীগড়ী রহ.

০৭. মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী রহ.

০৮. মাওলানা নূর মুহাম্মাদ পাঞ্জাবী রহ. (সদর মুদাররিস, মাদরাসায়ে ইসলামিয়া, ফতেহপুর)

০৯. মাওলানা আহমদ হাসান কানপুরী রহ.

১০. মাওলানা শাহ সুলাইমান ফলওয়ারবী রহ.

১১. মাওলানা সাইয়িদ জহুরুল ইসলাম ফতেহপুরী

১২. মাওলানা আব্দুল গনী খান মুরশিদাবাদী রহ.

১৩. মাওলানা হাকীম ফখরুল হাসান গাঙ্গুহী রহ.

১৪. মাওলানা শাহ তাজাম্মুল হুসাইন দেসনবী রহ.

'রোয়েদাদে নদওয়াতুল উলামা ১৩১১ হিজরী'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম অংশে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ. এই প্রাথমিক ও মৌলিক সম্মেলনের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন–

'১৩১০ হিজরীতে যখন অনেক নামকরা আলেম মাদরাসা ফয়জে আম, কানপুরের দস্তারবন্দী সম্মেলনের শোভা বর্ধন করেন, তখন কিছু দূরদর্শী আলেম আলোচনা ওঠান যে, উলামায়ে কেরামের একটি আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করা হোক, যাতে মুসলমানদের সমস্যাসমূহ বিশেষ করে তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় যেসব সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা যায় এবং উলামায়ে কেরামের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই প্রস্তাবকে উপস্থিত উলামায়ে কেরাম পছন্দ করেন এবং সে সময় পরবর্তী করণীয় স্থির করার জন্য দায়িত্বশীলও নির্বাচন করা হয়।'

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায়, উলামায়ে কেরামকে পূর্ব থেকে এ ধরনের কোনো অবগতি প্রদান করা হয়নি; বরং ঠিক সে সময়েই এই প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। বস্তুত যেহেতু এই প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি উলামায়ে কেরামের মধ্যে ছিল, তাই এই প্রস্তাব পছন্দ করা হয়েছিল এবং তা সে সময়েই কার্যকরী রূপ নেয়।

সেই সম্মেলনে আঞ্জুমানের নাম 'নদওয়াতুল উলামা' প্রস্তাব করা হয় এবং মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ.-ই সংস্থার প্রথম নাযেম মনোনীত হন। যারা সেই সম্মেলনে শরিক ছিলেন সকলেই এই আঞ্জুমানের প্রতি সহযোগী হিসেবে স্বাক্ষর করেন।

নদওয়াতুল উলামার ধারণা সর্বপ্রথম কার চিন্তায় আসে সে সম্পর্কে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মত হলো মাওলানা হাবীবুর রহমান শেরওয়ানীর। তিনি মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ আলী রহ.-এর ছেলে মাওলানা লুৎফুল্লাহ রহ.-কে এক চিঠিতে পরিষ্কার ভাষায় লিখেছিলেন–

'নদওয়াতুল উলামা প্রতিষ্ঠার ধারণা সর্বপ্রম তাঁরই চিন্তায় আসে। যার পক্ষে পুরো দেশ সাড়া দেয়। আজ তার নিদর্শন দেশ ও জাতির সামনে বিদ্যমান।'

নদওয়াতুল উলামার পরিচিতির জন্য প্রথম প্রতিনিধি দল

মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ.– দায়িত্ব গ্রহণের পর অনুভব করেন, সেসব উদ্দেশ্যের পরিচয় তুলে ধরার জন্যে বড় পরিসরে চেষ্টা-সাধনার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বিশেষভাবে সংবাদপত্রের মাধ্যমে উপকৃত হতে চাইলেন এবং তাতে লেখা পাঠান। অন্যদিকে সাধারণ সম্মেলনের জন্য ভূমি প্রস্তুতকরণ ও উলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় পুরো প্রচেষ্টা চালান।

মাওলানা মোশতাক আলী সাহেব, যিনি বিজনূরের অধিবাসী ছিলেন। মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতুবী, দারুল উলূম দেওবন্দের দ্বিতীয় মুদাররিস মাওলানা সাইয়িদ আহমদ এবং সাহারানপুরের মুহাদ্দিস মাওলানা আহমদ আলী থেকে দরসিয়াত ও হাদীসের পাঠ সম্পন্ন করেন এবং মাদরাসায়ে ইসলামিয়া ফয়জাবাদের মুদাররিস নিযুক্ত হন। নদওয়ার প্রাথমিক সময়কালে তার মূল্যবান প্রচেষ্টা ভোলার মতো নয়। তিনি অনেক সুন্দরভাবে ও আন্তরিকতার সাথে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেন। তিনি যেসব এলাকা সফর করেন তন্মধ্যে দেওবন্দ, রামপুর, পাটনা, নজীরাবাদ, ইটাওয়াহ, আলীগড়, কানসি, ভূপাল, মুম্বাই ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুম্বাই থেকে তিনি কামরান হয়ে জেদ্দা যান এবং মক্কা মুয়াজ্জমা এবং মদীনা মুনাওয়ারার জিয়ারতে ধন্য হন।

তাঁর সাথে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ.-এর লেখা একটি চিঠিও ছিল। যাতে নদওয়াতুল উলামার উদ্দেশ্যসমূহ দুই অংশে বিভক্ত করা হয়। সম্ভবতঃ এটিই ছিল প্রথম সাধারণ বিবরণ যা সেই বুনিয়াদি সম্মেলনের পর প্রচারের জন্য দেয়া হয়েছিল। তাতে নদওয়াতুল উলামা প্রতিষ্ঠার দুটি উদ্দেশ্য বর্ণিত হয় এবং

লক্ষণীয় বিষয় হলো তাতে সাধারণ রীতির বিপরীতে বিস্তারিতভাবে সবকিছু তুলে ধরা হয়।

প্রথম উদ্দেশ্য

যেহেতু এই যুগে যে সব ছাত্র মাদরাসাসমূহ থেকে ফারেগ হয়, তারা জাগতিক বিষয়সমূহের ব্যবস্থাপনা ও জীবিকা উপার্জনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবগতিহীন থাকে এবং জীবনের অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার কারণে অন্য কিছু করতেও পারে না। তাই তারা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে দুনিয়াদারদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং জনসাধারণের নজরে মর্যাদাহীন ও নিষ্কর্মা হিসেবে বিবেচিত হয়। অধিকন্তু দীনী ইলম সম্পর্কেও যতটুকু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তাও থাকে না; বরং যেসব দীনী ইলম সমকালে প্রয়োজন এবং দীনের সহায়ক তা সম্পর্কেও তারা অবগতিহীন থাকে। এই আঞ্জুমান সেসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে প্রথমত শিক্ষাব্যবস্থা যথাযথ করা এবং সর্বসম্মতিক্রমে সব ইসলামী মাদরাসাসমূহে তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাবে এবং যেসব বিষয় ছাত্রদের আদব-আখলাক ও ইলমের উন্নতির ক্ষেত্রে উপকারী বিবেচিত হবে তা বাস্তবায়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য

বর্তমানে আমাদের উলামায়ে কেরামের পারস্পরিক বিবাদ ও বিতর্ক কঠিন সমস্যা তৈরি করছে এবং অনেক ছোট ছোট বিষয়ে বড় বড় ফেতনা ও ফাসাদ তৈরি হচ্ছে। যার ফলে উলামায়ে কেরাম এবং এমনকি স্বয়ং পবিত্র ধর্ম ইসলাম বিরুদ্ধবাদীদের নজরে হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছে। এই আঞ্জুমান প্রচেষ্টা চালাবে যাতে এই পারস্পরিক সংঘাত না হয় এবং যখনই কোথাও কোনো মতভেদ তৈরি হবে এই সংস্থা তার সুরাহার ব্যবস্থা করবে। [নদওয়াতুল উলামা, ১ম বর্ষ, ১ম ভাগ]

উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে অভিনন্দন

উলামায়ে কেরাম ব্যাপকভাবে এই আন্দোলনকে উষ্ণ অভিনন্দন জানান। ভূপালের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ আলেম এর সাথে একমত পোষণ করেন এবং সহযোগিতার জন্য দস্তখত দেন।

মাওলানা শিবলী রহ.-এর সাথে সাক্ষাত ও নদওয়ার পরিচয় জ্ঞাপন

আলীগড়ে মাওলানা মুশতাক আলী সাহেব মাওলানা শিবলীর সাথে মুলাকাত করেন এবং নদওয়াতুল উলামার রূপরেখা, চিন্তাধারা, পাঠ্যপুস্তক ও পাঠদান পদ্ধতির সংস্কার এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নিরসনের ওপর আলোচনা করেন।

মাওলানা শিবলী রহ. সে সময় মাদরাসাতুল উলূম অর্থাৎ আলীগড়ে মোহামেডান কলেজের শিক্ষক ছিলেন। মাওলানা সেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতি ঐকমত্য প্রকাশ করেন। আলীগড়ে অন্যদের সাথেও সেসব বিষয়ে আলোচনা হয় এবং প্রায় সবাই তাকে পছন্দের দৃষ্টিতে দেখেন।

হাজী ইমদাদুল্লাহ রহ.-এর সমর্থন

হিজাজে এটা ছিল প্রথম পরিচিতি পর্ব, যখন মাওলানা মুশতাক আলী সাহেব মদীনা মুনাওয়ারার উলামায়ে কেরামের সামনে নদওয়ার রূপরেখা এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং তারা এর প্রয়োজনীতা ও গুরুত্বের কথা মেনে নেন। মক্কা মুয়াজ্জমায় হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ. সাহেবের সাথে তিনি বিশেষভাবে সাক্ষাত করেন এবং সব অবস্থা ও কার্যক্রম লিখিতরূপে তাঁর সামনে পেশ করেন। তিনি তা দেখে অনেক খুশি হন এবং সেই কাগজে নিজের স্বাক্ষর দিয়ে এর সৌন্দর্য বর্ধিত করেন।

মাওলানার লিখনীতে নদওয়াতুল উলামার উদ্দেশ্য

নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠা ও সাধারণ সভা আহ্বানের কারণ ও উদ্দীপক কী ছিল– উত্তম হবে যদি তা মাওলানার জবানীতে সরাসরি শোনা যায়। 'রোয়েদাদে সালে আওয়াল'–এর প্রথম ভাগে মাওলানা রহ. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সে যুগে ছাত্রদের যে অবস্থা ছিল তার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে মাওলানা লেখেন– 'এসব মাদরাসা থেকে দুই সময়ে ছাত্ররা বের হয়ে পড়ে। প্রথমত পড়াশোনার মাঝখানে যখন জীবিকার চিন্তা তাদের অতিষ্ঠ করে তোলে এবং ঘটনাক্রমে কোনো উপায় হাতে এসে পড়ে। তখন বাধ্য হয়ে পড়াশোনা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। এমতাবস্থায় আক্ষেপের বিষয় হলো, যে পরিমাণ সময় তারা এই ইলম অর্জনে ব্যয় করেছে তার সবটাই নিছক অকেজো সাব্যস্ত হয়। না তা দীনের কোনো কাজে আসে না দুনিয়ার। কেননা, তারা যে ইলম পড়েছে তা উপার্জনের মাধ্যমই হতে পারে না। বাকি থাকল দীনের কথা। তার অবস্থা হলো পাঠ্যক্রমে এ পরিমাণ মাকুলাতের কিতাব দেয়া হয়েছে যে, অনেক দিন পর্যন্ত সে 'কুল্লী'ও 'জুযয়ী' ছাড়া আর কিছুই জানতে পারে নাই। যদি কোন ফেকহী মাসআলা তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তবে সে সম্পর্কে সে থাকে বেখবর। আকায়েদ ও কালামশাস্ত্র সম্পর্কে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে তা সম্পর্কে পাওয়া যায় পরিচয়হীন। কুরআন মজীদের কোনো আয়াত কিংবা কোনো হাদীসের মর্ম তার থেকে উদ্ধার করা যাবে? তা তো অসম্ভব। সে সম্পর্কে তো তার কোন পরিচয়ই হয়ে ওঠেনি।'

সামনে অগ্রসর হয়ে লেখেন,

দ্বিতীয়ত তাদের মাদরাসা থেকে বের হওয়ার সময় তখনই যখন তারা পড়াশোনা শেষ করে। তাদের মধ্যেও অধিকাংশের অবস্থা প্রায় প্রথম দলের কাছাকাছি। আর যারা খোদাপ্রদত্ত স্বভাব বৈশিষ্ট্যের কারণে যোগ্যতাসম্পন্ন হন, তাদের তখন মনে এই চিন্তা জেঁকে বসে যে, সময় কিভাবে অতিবাহিত হবে! জীবিকা উপার্জনের উপায় কী হবে? এই চিন্তা করতে করতে তাদের মধ্যে যা কিছু যোগ্যতা ছিল তাও তারা নষ্ট করে ফেলে এবং পেরেশান হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে কিংবা ওয়াজ ইত্যাদির মাধ্যমে জীবনকাল অতিবাহিত করা শুরু করে। যার কারণে সে প্রত্যেকের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। আর যদি বড় সৌভাগ্য ধরা দেয় তবে ২০/২৫ রুপি মাসোহারায় শিক্ষকতার পেশা শুরু করে। এসব লোকের অবস্থা এমন হয়ে পড়ে যে, পুরো জীবন সেসব কিতাবের পৃষ্ঠা ওল্টানোতেই শেষ হয়ে যায় যা ইতোপূর্বে পড়েছে। তাদের এই সৌভাগ্য হয়েই ওঠে না যে, তারা দীনের সেসব কিতাব দেখবে যার ফলে তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের পরিধি বাড়তে পারে। যার ফলে ইলমে দীনের কোনো বিষয়ে সে পূর্ণ দক্ষতাসম্পন্ন হতে পারে। কিংবা দীনের এমন কোনো কাজ করতে সক্ষম হবে যার মাধ্যমে দীনের প্রচার-প্রসার ও সংরক্ষণ হতে পারে এবং দীনের কোনো উল্লেখযোগ্য উপকার তার মাধ্যমে হবে। মনে করা হয় সে ফারেগ হয়ে গেছে এবং ওয়ারেসে আম্বিয়া আখ্যা পাওয়ার উপযুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কোনো কোনো দীনী ইলম সম্পর্কে তার কোন পরিচয়ও হয়ে ওঠেনি। কুরআন মজীদ যা আমাদের দীন ও ঈমানের বুনিয়াদ তার ইলমের দিকে মুখই ফেরানো হয়নি।

আমাদের দিশারী রাসূলে বর হক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই জবরদস্ত স্থায়ী মুজিজা দেয়া হয়েছে, যা জানা এবং বিরুদ্ধবাদীদের সামনে তার মু'জিজা হওয়াকে সাব্যস্ত করা তাদেরই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কিন্তু আমাদের এই প্রিয় ও গর্বের জামাত তা থেকে উদাসীন রয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটি তো দুরূহ শাস্ত্র যে সম্পর্কে আমি উদাসীনতার কথা বর্ণনা করেছি। কুরআন মজীদের প্রতি অমনোযোগিতার অবস্থা এমন যে, সাদাসিধে মর্ম ও অর্থ অনুধাবনেরও সুযোগ হয় না। কাযী মোবারক ও সদরার এক পৃষ্ঠা বরং এক বাক্য বরং এক ছত্রও শিক্ষক ছাড়া পড়ে প্রশান্তি আসে না। যদি পড়ে থাকে তার অন্য কোন উস্তাদ থেকে আবার পড়া শুরু করে। দুবার তিন বার তা উস্তাযের কাছ থেকে শোনার লোকও পাওয়া যাবে। কিন্তু কুরআন মজীদের জ্ঞানসমুদ্র সর্বদা আগামীর জন্য পড়ে থাকে বর্তমানের গণ্ডিতে কখনও আসে না। একবারের জন্যেও তার শুরু

থেকে শেষ পর্যন্ত মর্ম অনুধাবনের সময় হয়ে ওঠে না। সামনে গিয়ে তিনি মর্মাহত হয়ে লেখেন–

'আফসোস! শত আফসোস! ছাত্রদের এমন কোন দল বের হয় না যারা নাস্তিক ও নব্য দার্শনিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম যার বিষাক্ত প্রভাব ধর্মহীনতা ও মুক্তচিন্তার প্রসারের ফলে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। যেভাবেই হোক তা নির্মূল করা আমাদের আলেমদের দায়িত্ব। মোটকথা, না তারা পড়াশোনাকালে কোনো দীনী ইলম বিশেষত উল্লিখিত শাস্ত্রসমূহের ওপর দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে আর না পরবর্তী সময়ে তার সুযোগ ঘটে। এখন বলুন, দীনের কাজ কারা করবে? আরো আফসোসের বিষয় হলো, তারা যুগের প্রয়োজন সম্পর্কে অনবহিত হওয়ার কারণে না কোনো দীনী বিষয়ের ব্যবস্থাপনা করতে পারে, না তাতে মতামত দিতে পারে। ব্যতিক্রম তো ব্যতিক্রমই; তা বিবেচনাযোগ্য নয়। অথচ এ সময় এদের দলের অধিক প্রয়োজন।'

পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও দলীয় গোঁড়ামীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লেখেন–

'এখন লক্ষ্য করুন, মুকাল্লিদীন ও গায়রে মুকাল্লিদীনের মধ্যে কেমন লজ্জাজনক দ্বন্দ্ব চলছে। এক ভাই অপর ভাইয়ের জানের, মালের, সম্মান ও সম্ভ্রমের ওপর আঘাত হানছে। অন্য ধর্মের এজলাসে মুকাদ্দামা দায়ের হচ্ছে। আমাদের সম্মানিত উলামায়ে কেরাম অপরাধীর মতো তাদের সামনে দণ্ডায়মান হচ্ছেন। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও হাদীসের অন্যান্য কিতাব তাদের জুতার সামনে স্তূপ করা হচ্ছে। আর 'আমীন' ও রফা' ইয়াদাইন-এর বিশ্লেষণ ঘনশ্যাম দাস বাহাদুর ও করমল সাহেব বাহাদুরের সামনে পেশ করা হচ্ছে এবং তাকে ধর্ম মনে করা হচ্ছে। এমন মন-মানসিকতার ওপর আফসোস! শত আফসোস! আমাদের উলামায়ে কেরামের এভাবে তাদের এজলাসের সামনে দাঁড়ানো উলামায়ে কেরামের শানের খেলাফ নয় কি? আমাদের ধর্মীয় কিতাবসমূহ এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীসসমূহকে এভাবে অসম্মানের সাথে রাখা দীনের অবমাননা নয় কি? ধর্মীয় বিবাদ ধর্মবিরোধীদের সামনে পেশ করা চরম বেদীনী বৈ কি?

এই লেখাটি মাওলানার চিন্তা-চেতনার একটি প্রতিবিম্ব, যা থেকে বোঝা যায়, তিনি কোন পদ্ধতিতে চিন্তা করতেন। আর যা চিন্তা করতেন তা কত সরল, সততা ও আন্তরিকতার সাথে পেশ করে দিতেন। তাতে না আছে খামোখা কোনো দর্শন বানানোর চেষ্টা। আর না বাহুল্য ও বাহ্যিকতার ছোঁয়া। আর না আছে তাতে শব্দের চানক্য কিংবা বর্ণনার বাগাড়ম্বরতা। তার সব সৌন্দর্য তার

সততা ও সরলতার মাঝে নিহিত। মাওলানার সব লেখনিতে, চাই তা পত্রের আকারে হোক কিংবা পুস্তিকা ও কিতাবের আকারে, তাতে এই রঙই নজরে আসে এবং 'যা অন্তর থেকে নির্গত হয় তা অন্তরে গিয়েই নাড়া দেয়'-এর বাস্তব নমুনা বলে অনুমিত হয়।

নদওয়াতুল উলামার প্রথম সাধারণ সভা

১৫, ১৬ ও ১৭ শাওয়াল ১৩১১ হিজরী মোতাবেক ২২, ২৩ ও ২৪ এপ্রিল ১৮৯৪ ঈসায়ী সালে মাদরাসা ফয়জে আম কানপুরের দস্তারবন্দী সম্মেলনের সময় নদওয়াতুল উলামার প্রথম সভা অনেক শান-শওকতের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। বস্তুত তা দেশের আনাচে-কানাচে জীবনের এক শিহরণ ছড়িয়ে দেয়। এটি ছিল নতুন অভিজ্ঞতা যার সাথে মানুষ পরিচিত হওয়া শুরু করেছিল। সেই সম্মেলনে ধর্মীয় বিভিন্ন দল ও মতবাদের প্রতিনিধিরা একতা ও ইসলামী ভাবাবেগের সাথে একত্রিত হয় এবং পরস্পর মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তা ছিল একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উপাখ্যান।

'কামালাতে মুহাম্মাদিয়া'-এর লেখক যথার্থই বলেছেন– 'মুকাল্লেদীন ও গায়রে মুকাল্লেদীন উলামায়ে কেরামকে তিনি (মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ.) বিস্ময়করভাবে মিলিয়ে দেন। যাকে কারামাত ব্যতীত আর কী বলা যেতে পারে?' বয়োবৃদ্ধ লোকেরা এই হতবাক করা দৃশ্য দেখে বলেন, 'এমন সম্মেলন যাতে এত অধিক লোক মিলেমিশে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বসেছে এবং এত অধিক নূরানী চেহারার উলামায়ে কেরাম যাদের চেহারা ও অবয়ব থেকে নিঃসৃত আলোকচ্ছটা পুরো এলাকাকে মনোমুগ্ধকর করে তুলেছে, যা ইসলামের শক্তি ও ইসলামের এক অভিন্ন রূপ প্রকাশের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে প্রথম দৃষ্টান্ত।'

২২ এপ্রিল সকাল ৭টায় দস্তারবন্দী সম্মেলনে শুরু হয়। সেই সম্মেলনে মাওলানা সুলায়মান ফলওয়ারবী রহ. এমন এক মর্মস্পর্শী বয়ান করেন যার ফলে শ্রোতাদের মধ্যে আত্মহারার ভাব সৃষ্টি হয়ে যায়। সম্মেলনের সভাপতি পাগড়ি বেঁধে দেন- যার উপর

اُدْعُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ

অনেক সুন্দরভাবে লেখা ছিল। শায়খ আহমদ মক্কী রহ. আরবি ঢঙে সনদ পড়ে শোনান এবং এর মাধ্যমেই দস্তারবন্দী সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

প্রথম বৈঠক

তৃতীয় প্রহরে সাড়ে তিনটায় সেই হলে নদওয়াতুল উলামার এই ঐতিহাসিক অধিবেশনের সূচনা হয় যার জন্যে পুরো দেশ উন্মুখ ছিল। মাওলানা শিবলীও এই অধিবেশনে শরিক ছিলেন। কেবল শরিকই ছিলেন না বরং অনেক আন্তরিকতার সাথে প্রত্যেকটি কাজে অংশ নিচ্ছিলেন। তাঁর প্রস্তাব এবং মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন ইলাহাবাদী রহ.-এর সমর্থনে মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেব সম্মেলনের সভাপতি মনোনীত হন। এই সম্মেলনটি যেভাবে শুরু হয় এবং তাতে যে শান, ইত্তেহাদ ও ঐক্যের দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তার দৃষ্টান্ত তা নিজেই। মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী যিনি সম্মেলনে শরিক ছিলেন এই, দর্শনীয় দৃশ্যপটকে এভাবে বর্ণনা করেন–

'শাওয়াল ১৩১১ হিজরীতে ১ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন স্বীয় মহিমা ও জমায়েতের নিরিখে বেনজীর ছিল। তার একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, প্রত্যেক ফেরকার বড় বড় নেতা সম্মেলনে শরিক ছিলেন। হানাফী উলামায়ে কেরাম ছাড়াও আহলে হাদীসের মধ্য থেকে মওলভী ইবরাহীম আরভী, মওলভী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী, শিয়া মুজতাহিদদের মধ্যে মওলভী গোলামুল হাসনাইন কানতুরী সম্মেলনে শরিক ছিলেন।'

এরপরে মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন ইলাহাবাদী নদওয়াতুল উলামার উদ্দেশ্য ও প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতিকর দিক, অধিকন্তু ইংরেজি শিক্ষার অশুভ পরিণতি ও তার প্রতিরোধকল্পে করণীয় সম্পর্কে এক জোরালো বয়ান রাখেন। সংবিধান ও কর্মসূচি উপস্থাপন করার দায়িত্ব মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. অর্পণ করেন মাওলানা আব্দুল হক হক্কানীর দায়িত্বে। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হতে পারেননি। তাই মাওলানা শিবলি রহ. সম্মেলনের সভাপতির অনুমতি সাপেক্ষে কর্মসূচি পেশ করেন। আর সিদ্ধান্ত হয়, প্রথমে একটি বিশেষ সম্মেলনের আয়োজন করা, যাতে তার প্রতিটি দফাকে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে মঞ্জুর করা হবে। পরবর্তী সময়ে সাধারণ সভায় মঞ্জুরির জন্য পেশ করা হবে।

দ্বিতীয় বৈঠক

দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৬ শাওয়াল সকাল ৬টায়। সময়ের অনেক পূর্বেই হল ভরে যায়। সাইয়িদ মুহাম্মাদ শাহ মুহাদ্দেসে রামপুরী রহ. সভাপতিত্ব করেন। সর্বপ্রথম মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী নদওয়াতুল উলামার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বড় আবেগদীপ্ত ভাষণ পেশ করেন। এরপর মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম আরভী (মুহতামিম, মাদরাসা আহমদিয়া, আরা) বয়ান রাখেন। কিন্তু তার বয়ান

বেশি একটি পছন্দনীয় হয়নি। কোনো কোনো ব্যক্তি মাঝখানে কিছু বলতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু বিষয়টি আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, মজলিসের মধ্যে কোনো ধরনের প্রতিবাদ সমালোচনা হবে না– তাই সবাই নীরবতা পালন করেন।

এই সম্মেলনে সংবিধানও পাস হয় এবং চারটি প্রস্তাব মঞ্জুর হয়–

০১. প্রথম প্রস্তাব এই ছিল যে, বর্তমান প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কারযোগ্য।

০২. দ্বিতীয়ত, মাদরাসার মুহতামিমরা নদওয়াতুল উলামার বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন।

০৩. তৃতীয়ত, ইসলামী শিক্ষায়তন তথা মাদরাসাসমূহকে একই শিকলে গ্রথিত করা হবে।

০৪. চতুর্থ প্রস্তাব মাদরাসা ফয়জে আমের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল।

নেসাব সংস্কারের প্রস্তাব অধিকাংশের সম্মতিতে পাস হয়। আর সকল আলেম এ মর্মে একমত পোষণ করেন যে, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সংশোধনযোগ্য।

সে সময় বারোজন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটিকে নেসাবে তালীম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে দ্রুত থেকে দ্রুততর সময়ে নিজেদের সুপারিশসমূহ পেশ করার জিম্মাদারি দেওয়া হয়। সে কমিটিতে মাওলানা রহ. ছাড়াও মাওলানা লুৎফুল্লাহ আলীগড়ী রহ., মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী রহ., মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন ইলাহাবাদী রহ., মাওলানা শাহ সুলায়মান ফলওয়ারবী রহ. মাওলানা শিবলী নুমানী রহ., মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী, মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী এবং মাওলানা জহুরুল ইসলাম ফতেহপুরী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদেরকে একথাও বলা হয় যে, তারা অন্যান্য উলামায়ে কেরাম বিশেষত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর সাথে এ বিষয়ে যেন যোগাযোগ করেন এবং পরামর্শ করে যেন নতুন নেসাব প্রস্তাব করেন। অন্য প্রস্তাবগুলোও অধিকাংশের সম্মতিক্রমে পাশ হয়ে যায়।

এই সম্মেলনে উলামায়ে কেরামের ঐকমত্যক্রমে মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. যথা নিয়মে নদওয়াতুল উলামার নাযেম মনোনীত হন। আর সম্ভবত সেই সিদ্ধান্তকে সুদৃঢ় করা হয় যা বুনিয়াদি সম্মেলনে স্থির করা হয়েছিল। প্রথম প্রস্তাবের মঞ্জুরির পরে মাওলানা শেরওয়ানী যিনি তখন যৌবনের সূচনালগ্নে ছিলেন– নেসাবে তালীম সম্পর্কে একটি অনেক সুন্দর প্রবন্ধ পড়ে শোনান।

সেই সম্মেলনে ৬০-৭০ জন শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম শরিক ছিলেন। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান রহ. মাদরাসার ব্যস্ততার কারণে সম্মেলনে শরিক হতে পারেননি এবং ওজর পেশ করে চিঠি লেখেন।

মাওলানা হালীর পাঠানো বয়ান

মাওলানা হালী সেই সম্মেলনে যোগদান করতে পারেননি। তবে তিনি তার বয়ান লিখে পাঠিয়ে দেন। যা পরবর্তী সময় অন্য সদস্যদের সামনে পাঠ করে শোনানো হয়। তাতে তিনি ইতিহাস, ভূগোল ও নেসাব পরিবর্তনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করার পাশাপাশি আরবি সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেই সম্মেলনে মাওলানা আহমদ রেযা খান (যিনি সম্ভবত পরবর্তী সময়ে নদওয়ার বিরোধী হয়ে গিয়েছিলেন) এর প্রবন্ধও ছিল। কিন্তু তা সময়ের সংকীর্ণতার কারণে পড়ে শোনানো সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সময়ে মাদরাসা ফয়জে আম-এর কার্যবিবরণীতে তা প্রকাশ করা হয়েছিল।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনের নিয়মতান্ত্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে নদওয়াতুল উলামার এই ঐতিহাসিক সম্মেলন শেষ হয়। কিন্তু পাশাপাশি সেই আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়, যা পুরো দেশের দৃষ্টিকে নদওয়াতুল উলামার প্রতি নিবদ্ধ করে। আর তা মুসলমানদের শিক্ষা ও সমাজ চিন্তার ময়দানে এক নতুন উপহার পেশ করে এবং এতে অমানিশার ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের ভীতিকর পরিবেশে তাদের সামনে আশার এক আলোক রেখা গোচরে আসে।

মাওলানা মুহাম্মদ আলী রহ.-এর সুচিন্তিত ও কার্যকরী দিক-নির্দেশনা

এই সম্মেলনের পর মাওলানা রহ. প্রবন্ধসূচি তৈরি করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল আগামী সম্মেলনসমূহের জন্যে লোকেরা সেসব বিষয়ে প্রবন্ধ প্রস্তুত করবে। নদওয়াতুল উলামা যে ধারণা পেশ করেছিল এবং যে সব বুনিয়াদ ও ভিত্তির ওপর মন-মানস গঠন করার লক্ষ্য তার সম্মুখে ছিল তার জন্য প্রয়োজন ছিল মানুষ যেন এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে যাতে তাদের মধ্যে সঠিক আবেগ অনুভূতি সৃষ্টি হয় এবং উন্নত মানসিকতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করার গুণ বৈশিষ্ট্য জাগ্রত হয়। মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানীর প্রসিদ্ধ কিতাব 'উলামায়ে সালাফ' এই দিক-নির্দেশনারই ফসল। এই কিতাব নদওয়ার সম্মেলনের জন্যেই লেখা হয়েছিল। মাওলানা রহ. এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের আলোচনা ও কিতাবের নামকরণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন-

'১৩১১ হিজরীর কথা। নদওয়াতুল উলামার প্রথম সম্মেলন কানপুর শহরে অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরাম শোভাবর্ধন করেন। তাদের গুণ-সৌন্দর্যে সম্মেলন ছিল প্রাণবন্ত এবং রূপচ্ছটায় চোখ ছিল আলোকিত। বস্তুত এমন এক পবিত্র দৃশ্য বিরাজ করছিল যার দৃষ্টান্ত মুসলিম ভারতের ইতিহাসে তা নিজেই। আমার চক্ষুযুগল যখন সেসব নূরানী চেহারা দর্শনে ধন্য হয়, তখন আমার অন্তর্চক্ষে এক নূর সৃষ্টি হয় যার আলোতে সেই যুগ আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে যা বিশ্বসভ্যতায় হাজার বছরের পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। অর্থাৎ ইতিহাসের পরবর্তীদের দেখে পূর্ববর্তীদের চিত্র ভেসে ওঠে এবং তাদের জীবনকাল অধ্যয়নের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। এই আকাঙ্ক্ষা সর্বদা বজায় ছিল। যখন মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী সাহেব, নাজেমে নদওয়া একটি বিষয়সূচি প্রকাশ করেন। তাতে কিছু শিরোনাম এই উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল যাতে আগত নদওয়ার সম্মেলনে এসবের ওপর প্রবন্ধ লেখা হয়। কাকতালীয়ভাবে তাতে একটি শিরোনাম 'উলামায়ে সালাফ' নামেও অন্তর্ভুক্ত ছিল।'

নদওয়াতুল উলামাকে পরিচিত করার প্রচেষ্টা

এই সম্মেলনের পরে নদওয়াতুল উলামার বিশিষ্ট সদস্যগণ ও অন্যরা পূর্ণ মনোযোগের সাথে নদওয়ার পরিচয় ও প্রসিদ্ধির জন্যে চেষ্টা-সাধনার সূচনা করেন। আর এক্ষেত্রে কোনো সময়ের জন্য মন্থরতা আসেনি। বিশেষত মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী সাহেব বড় আন্তরিকতা ও উদ্যমের সাথে এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। দিল্লি, মুম্বাই ও হায়দারাবাদে নদওয়াতুল উলামার পক্ষে তিনি জোরদার বক্তৃতা করেন। লোকদেরকে এর প্রতি সমর্থনের জন্য উৎসাহিত করেন। তার কারণে নদওয়ার জন্যে অর্থনৈতিক উপকারিতাও হাসিল হয়। তিনি ছাড়াও মাওলানা শাহ সুলায়মান ফলওয়ারবী, মাওলানা হাকীম জহুরুল ইসলাম ফতেহপুরী, মাওলানা ফতেহ মুহাম্মাদ তায়েব লাখনবী ও মাওলানা হাবীবুর রহমান খান এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে সামনে ছিলেন।

এই আন্দোলন অল্প সময়ের মধ্যে ঢাকা থেকে পেশওয়ার ও হায়দারাবাদ পর্যন্ত না জানি কত শীতল অন্তরে উষ্ণতার সৃষ্টি করে এবং কত অন্তরে আশা ও ইয়াকীনের মোম প্রজ্জ্বলিত করে।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ. নদওয়াতুল উলামার এই মকবুলিয়াত ও গ্রহণযোগ্যতাকে আনন্দের সাথে বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন–

'এই মোবারক সংস্থার বয়স এক বছর হয়েছে। এই এক বছরের স্বল্প মেয়াদে এ আন্দোলন যে পরিমাণ বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধি ও উল্লেখযোগ্য মর্যাদা হাসিল করেছে তাকে আল্লাহ তাআলার মেহেরবানী ও অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না।

সম্ভবত হিন্দুস্তানের কোনো শহর, কোনো এলাকা, কোনো গ্রাম এমন নেই যেখানে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েনি। কোনো বিবেকবান ব্যক্তি এমন থাকেনি যিনি তাকে আশার দৃষ্টিতে দেখেননি। কোনো কল্যাণকামী ও ইসলামের দরদী এমন থাকেননি যিনি এর গতিবিধি সম্পর্কে পূর্ণ মনোযোগী হননি। সেসব উলামা ও মাশায়েখ এই সম্মেলনে বহু দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অংশগ্রহণ করেন যারা নিজেদের শহরেও সাধারণ সভা-সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতেন না। কোনো কোনো আলেমের জবান থেকে এমন কথাও শোনা গেছে যে, আয় আল্লাহ! এটি কেমন চমৎকার কর্ম প্রচেষ্টা! অবচেতনভাবে এত দূর-দূরান্তের পথ পাড়ি দিয়ে মানুষেরা এতে অংশ নিচ্ছে। যদি কোনো বাদশাহও তাদের দাওয়াত দিতেন তবুও এমন আনন্দচিত্তে নিজের পয়সা খরচ করে আসতেন না। মোটকথা, এই প্রসিদ্ধি, এই চিত্তাকর্ষক ও ম্যাগনেটিক টান নিঃসন্দেহে গায়েবী সাহায্যের সংবাদ দিচ্ছে।'

মূলত মাওলানার নিষ্ঠা, রূহানিয়াত ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সদিচ্ছার ফলে এমন এক আন্দোলন যা বিপ্লবাত্মক চিন্তা-চেতনা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল এবং যার বিশেষ পদ্ধতির চিন্তাধারা উলামায়ে কেরামের এক বড় শ্রেণির কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ও নতুন ছিল, এত অল্প সময়ের মধ্যে সফলতার পরশে ধন্য হয় এবং প্রত্যেক শ্রেণি ও দল তাকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ ও তার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য হয়।

নদওয়ার লাখনৌ সম্মেলন

নদওয়ার দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন খান বাহাদুর মুনশী আতহার আলী সাহেবের ইচ্ছা অনুসারে লাখনৌতে অনুষ্ঠিত হয়। মুনশী আতহার আলী তখনও নদওয়াতুল উলামা সম্পর্কে বেশি কিছু অবগত ও পরিচিত হননি। নদওয়ার জিম্মাদারগণের সাথে তার একবার কথাবার্তাও হয়। কিন্তু কোনো আশাব্যঞ্জক ফল দেখা যায়নি। কিন্তু মুনশী আতহার আলী সাহেবের ভাষ্যমতে- 'আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই সম্মেলনের মর্যাদা ও গুরুত্ব আমার অন্তরের মধ্যে আঁচড় কেটে যায় এবং ধারণা হয় যে, এই প্রচেষ্টা কোনো মামুলি ব্যাপার নয়। এই ধারণায় আমি এমন তৃপ্তিবোধ করি যার ফলে সে সময়ই আমি তার জিম্মাদারী নেওয়ার জন্যে চিঠি লিখি।

'যাই হোক, নদওয়াতুল উলামার নাযেম সাহেব নদওয়াতুল উলামার সদস্যগণ, বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম, নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, মাদরাসার দায়িত্বশীল ও বিভিন্ন ইসলামী সংস্থা বরাবর আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করেন এবং প্রস্তুতি শুরু করে দেন। এবারও উলামায়ে কেরাম অনেক আগ্রহ করে এই আহবানে সাড়া দেন। যে সকল উলামায়ে কেরাম কোনো কারণে শরিক হতে পারেননি তারা ওজর পেশ করে চিঠি লেখেন এবং নদওয়াতুল উলামার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা খোলা মনে স্বীকার করেন।

মাওলানা শাহ আমানাতুল্লাহ ফসীহী গাজীপুরী (যিনি একজন শীর্ষস্থানীয় আলেম ও শায়খ ছিলেন এবং মাওলানা ইবরাহীম আরভীর সাথে তাঁর একটি পুরোনো ও পৈত্রিক বিবাদও চলছিল।) মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ. কে এক চিঠিতে লেখেন–

'আপনি নতুনভাবে ইসলামের বাগিচায়– যা দীর্ঘদিন থেকে শুকিয়ে যাচ্ছিল– আল্লাহ তাআলার অপার করুণায় পানি সিঞ্চন করেছেন এবং খোদা তাআলার ওপর ভরসা করে নদওয়াতুল উলামা প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর যে পরিমাণ চিন্তা-চেষ্টা দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেছেন– এক বছরের মধ্যেই আপনার প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে এবং তার উপকারিতা প্রত্যেক বিশেষ ও সাধারণের ওপর প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাচ্ছে, যা থেকে পুরোপুরি আশা করা যায়, আগামীতে নদওয়া ইসলামের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য কী কী কাজ আঞ্জাম দেবে এবং ইসলামের সফলতার ক্ষেত্রে কী কী রঙ দেখাবে। অধমের কাছে এই সম্মেলন অন্তরের স্বীকারোক্তি মতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইশারা বলে মনে হচ্ছে।

إِذَا أَرَادَ اللهُ شَيْئًا هَيَّأَ أَسْبَابَهُ.

সম্মেলনস্থলে যা কায়সার বাগের প্রসিদ্ধ বারাদরীতে প্রস্তুত হচ্ছিল– অন্যান্য সব রকমের ব্যবস্থাদির পাশাপাশি একটি হলো, দারুল মুতালাআও কায়েম করা। হাকীম ও ডাক্তারদের একটি দলকেও প্রস্তুত করা হয়েছিল যাতে প্রয়োজনের সময় তারা মেহমানদের তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন। কায়সারবাগের বারাদারী, যা কোনো এক কালের বিলাসব্যসনের সাক্ষ্যবহন করে থাকবে, তা আজ উলামায়ে কেরামের প্রাণবন্ত সমাবেশের কারণে আপন সৌভাগ্যের ওপর গর্ববোধ করছে। সুন্দর আকৃতির সাথে সুন্দর ভাবের মিশ্রণ দৃশ্যের মনোহরিতা ও তাৎপর্যকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে।

১৬ শাওয়াল ১৩১২ হিজরী মুতাবেক ১২ এপ্রিল ১৮৯৫ ঈসায়ী সকাল ৬টায় প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানার প্রস্তাবে মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ রহ.

মুহাদ্দেসে রামপুরী সভার সভাপতি মনোনীত হন এবং মাওলানা আব্দুল মজীদ ফিরিঙ্গী মহল্লী কালামে পাকের তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার সূচনা করেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ. স্বীয় দুর্বলতা ও অসুস্থতার কারণে বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও রিপোর্ট পেশ করতে পারেননি। সৌভাগ্যের লটারিতে মাওলানা শিবলীর নাম ওঠে যিনি এই রিপোর্ট সভাপতির অনুমতি সাপেক্ষে পড়ে শোনান। সে রিপোর্টে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ.-এই বিষয়টি ব্যক্ত করেন যে, নেসাবসংস্কার সংক্রান্ত যে প্রস্তাব গত বছরের সম্মেলনে মঞ্জুর হয়েছিল সে সম্পর্কিত অভিমতসমূহ এখনও এসে পৌঁছায়নি। অবশ্য আমাদের বন্ধুবর মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন ইলাহাবাদী এবং মাওলানা আব্দুল আলী মাদ্রাজী অনেক বিস্তারিতভাবে সে সম্পর্কে মতামত পেশ করেছেন।

বাস্তবতা হলো, যে নেসাব দুশ বছর ধরে চলে আসছে এর সংস্কার ও সংশোধন এক বছরের কাজ নয়। তথাপি এই বিষয়টি বর্ণনা করতে আমার আনন্দ হচ্ছে যে, এই আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষের অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের চিন্তা নেসাব সংস্কারের প্রতি ঝুঁকছে। পাশাপাশি প্রচলিত নেসাবে আরবি সাহিত্য ও তাফসীর শাস্ত্রের প্রতি গুরুত্ব নেহায়েত কম হওয়া এবং আধুনিক যুক্তিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তার কথা অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম মেনে নেন।

মাওলানার রিপোর্টের পরে ফিরিঙ্গী মহলের মাওলানা এফহামুল্লাহ সাহেব (যিনি লাখনৌর একজন বিদগ্ধ ও বহু পুস্তক রচয়িতা আলেম মাওলানা ওয়ালী উল্লাহ লখনবী রহ.-এর পৌত্র ছিলেন) তাঁর প্রবন্ধ পেশ করেন।

দ্বিতীয় বৈঠকে মাওলানা শাহ সুলায়মান ফলওয়ারবী রহ. এমন প্রভাব সৃষ্টিকারী বয়ান রাখেন যার ফলে উপস্থিত লোকদের অন্তর তপ্ত ও চক্ষু সিক্ত হয়ে ওঠে। সভার অসাধারণ প্রভাব দেখে মাওলানা বলেন, নদওয়া যে সুমহান কাজের ভিত্তি রেখেছে তার সফলতা কোনো তুচ্ছ বিষয় নয়। দু চার দিনের কাজ নয়। কোনো বড় কাজ কেবল চিন্তা করলেই হয়ে যায় না; বরং আমাদেরকে উচ্চ মনোবল ও দীর্ঘস্থায়ী কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে চেষ্টা ও কর্মতৎপরতা চালিয়ে যেতে হবে। ইনশাআল্লাহ একদিন নদওয়াকে সফল দেখতে পাবেন।

দারুল ইফতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মাওলানার প্রস্তাব

তৃতীয় বৈঠকে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ. প্রস্তাব করেন যেন একটি ইফতা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাওলানা রহ. এ ব্যাপারে অনেক আগ্রহী ছিলেন এবং তা অনেক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। এজন্যে তিনি জোরদারভাবে এই প্রস্তাব পেশ করেন। মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী রহ. ও মাওলানা শাহ

সুলায়মান ফলওয়ারবী তার সমর্থনে সংক্ষিপ্ত বয়ান রাখেন। কিন্তু অন্য সাথীরা তৎক্ষণাৎ তা পাস করার ব্যাপারে একমত পোষণ করলেন না। অবশেষে এই প্রস্তাব একটি বিশেষ বৈঠকের জন্যে মুলতুবি রাখা হয়। এরপর মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী রহ. বয়ান রাখেন এবং মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী আপন প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই সম্মেলনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, তাতে একটি আরবি কসীদা পাঠ করা হয় এবং একটি ফার্সি মসনবী শোনানো হয়। আবুল কাসেম সাহেব আরশী (যিনি হায়দারাবাদের এক বিশেষ কবি ছিলেন) ইরানী ভাব-ভঙ্গিতে স্বীয় ফার্সী মসনবী পরিবেশন করেন এবং শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। সেই মসনবীতে বড় শিল্প চাতুর্য ছিল এবং কবির ভাষাদক্ষতার নমুনা বিদ্যমান ছিল।

احمد مرسل کہ فلک بخت اوست ☆ تیغ و قلم کوکبہ ورخت اوست

بادۂ توحید بساغر گرفت ☆ خامہ و شمشیر بکف در گرفت

قطرہ زاں بادہ چو ایثار کرد ☆ ابر بدشت آمد و گلزار کرد

گلشن اسلام بہار آمدہ ☆ بر چمن خشک بہار آمدہ

'রাসূল মুহাম্মদ সা.,আসমান যার কারণে ভাগ্যবান
তলোয়ার ও কলম তার সাফল্যের পাথেয়।
তিনি তাওহীদের মদিরা পাত্রে নিলেন
হাতে নিলেন কলম ও তলোয়ার।
সেই মদিরার এক ফোটা যখন উৎসর্গ করলেন
তখন মরুভূমির উপর মেঘ এসে বাগিচা করলো।
ইসলামের বাগিচায় বসন্ত এসেছে
শুকনো বাগিচায় বসন্ত এসেছে।'

নদওয়াতুল উলামার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন,

انجمن ندوہ کہ نامش شدہ ☆ رحمت حق حامی کامش شدہ

رومی و بومی ہمہ گشتند جمع ☆ صورت پروانہ حوالی شمع

کار مریضاں بہ مسیحا رسید ☆ سلسلہ قطرہ بدریا رسید

তারপর এ কবিতার উপর মছনবী সমাপ্তি করেন-

کف بدہاں، مست شتابی ہنوز

قافلہا رفت و بخوابی ہنوز

১৭ শাওয়াল চতুর্থ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, নেসাবে তালিমের জন্যে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করতে হবে। মাগরিবের নামাজের পর এক বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আর তাতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা কারিকুলামে আরো কিছু জ্ঞান-শাস্ত্রের সংযোজন প্রয়োজন। রিজালশাস্ত্র, উসূল, তাফসীর, ইতিহাস ও ভূগোলকে চিহ্নিতও করা হয়। এ বিষয়টিও নির্ধারিত হয় যে, এসব বিষয় আরবিতেই পড়ানো হবে। শিক্ষা সময়কাল দশ বছর সাব্যস্ত করা হয়।

নদওয়াতুল উলামার প্রথম ফসল

পঞ্চম বৈঠকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই ছিল যে, মাওলানা শাহ আমানাতুল্লাহ ফসীহি গাজীপুরী এবং মাওলানা ইবরাহীম আরভী গাজীপুরী সমন্বয়ে ঘোষণা দেন যে, আজ আমাদের উভয় দলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এখন দুই দলও বলা ঠিক নয়। এখন তো একই হয়ে গেছে। আমরা উভয়ে মিলে কওমের হালতের ওপর আজ অনেক কেঁদেছি এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আমরা আমাদের বিষয়কে নদওয়ার কাছে সোপর্দ করে দেব।

উভয়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে একটি বিবাদ চলে আসছিল এবং কোনো প্রচেষ্টাই সফল হচ্ছিল না। নদওয়াতুল উলামার এটি প্রথম ফসল ও সফলতা ছিল যা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায়। এই বিবাদের যে গুরুত্ব ছিল তার ফলে এ সমাধানে সাধারণ লোকদের মধ্যে অনেক ভালো প্রভাব পড়ে। অধিকন্তু লোকেরা এ বিষয়টি অনুভব করতে পারে যে, বিদ্যমান বিভিন্ন মতবিরোধ নিরসন এবং উলামায়ে কেরামের মধ্যে যথাযথ জাগরণ সৃষ্টিতে নদওয়াতুল উলামা কার্যকর মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হবে।

এই সভার পরিসমাপ্তি আযীয লখনবীর ফার্সী কসীদার মাধ্যমে হয়- যা মাওলানা শাহ সুলায়মান সাহেব পড়ে শোনান। কসীদার শেষে নদওয়ার আলোচনা করে বলেন-

آب ازیں چشمہ جاری برود تا پنجاب ☆ فیض ایں ابر بہاری برسد تا بہ بہار

لکھنؤ یافتہ خوش برگ ونوائی از تو ☆ مژدہ اے لکھنویاں مژدہ بہاراست بہار

তিনি মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ. প্রসঙ্গে বলেন–

داعی ندوہ بود قدوہ ارباب ہمم

زبدۂ اہل کرم، عمدۂ جمعے احرار

তিনি নদওয়াতুল উলামাকে দুআ দিয়ে কসীদার ইতি টানেন–

یارب ایں ندوہ وایں نادی وایں بادی باد

شاد تا یوم تناد ایمن از ارباب عناد

এই সম্মেলনে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি নতুন ব্যবস্থাপনা পরিষদও গঠন করা হয় এবং সংশোধিত নীতিমালাও মঞ্জুর হয়। মাওলানা শাহ আবদুর রাজ্জাক রহ.–এর যোগ্যউত্তরসূরী ফিরিঙ্গী মহলের মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহহাব সে সকল উলামায়ে কেরামকে দাওয়াত করেন যারা সম্মেলনে শরিক হওয়ার জন্য এসেছিলেন এবং সেখানে খানা খাওয়ান যেখানে উস্তাযুল আসাতিজা মোল্লা নেজামুদ্দীন রহ. বৈঠক করতেন। অন্য সময় মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ নাঈম সাহেব রহ.-এর পক্ষ থেকে দাওয়াত ছিল এবং সাধারণ ঘোষণা ছিল যে, উলামায়ে কেরামের সাথে আরও যত লোক রয়েছেন তারাও দাওয়াতে শরিক রয়েছেন।

আধুনিক শ্রেণির পক্ষ থেকে নদওয়ার প্রথম সমর্থন লাভ

১৮৯৪ ঈসায়ী সালে মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স নদওয়ার সমর্থনে একটি রেজলুশন মঞ্জুর করে যা নবাব মুহসিনুল মুল্‌ক বাহাদুর পেশ করেছিলেন এবং অনারেবল সাইয়িদ মাহমুদ সাহেব সমর্থন দিয়েছিলেন। স্যার সাইয়িদ আহমদ খান এই রেজুলেশনের শত শত কপি কনফারেন্স-এর রিপোর্ট থেকে আলাদা করে ছাপিয়ে মুসলমানদের মাঝে বিতরণ করেন। আধুনিক শ্রেণির পক্ষ থেকে এটি নদওয়ার প্রতি সর্বপ্রথম সুশৃঙ্খল ও কার্যকরী সমর্থন ছিল।

লাহোর আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের সমর্থন

অনুরূপভাবে আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম লাহোরও নদওয়ার সমর্থনে রেজুলেশন মঞ্জুর করে।

মিসর ও সিরিয়ায় নদওয়াতুল উলামা আন্দোলনের পরিচিতি

নদওয়াতুল উলামার রিপোর্টসমূহ থেকে জানা যায় যে, দুই বছরের ভেতর কেবল ভারতবর্ষ নয় বরং মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে নদওয়াতুল উলামার পরিচয় পর্ব সম্পন্ন হয়েছিল। আরবের উলামায়ে কেরাম নির্দ্বিধায় তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। মিসরের সংবাদপত্রগুলোতেও এর সমর্থনে একাধিক প্রবন্ধ ছাপা হয়। বিশেষভাবে আল মুয়াইয়িদ এবং আর রফীক এর প্রতি জোরদার সমর্থন ব্যক্ত করে। নতুন জ্ঞান-শাস্ত্রের সংযোজন ও নেসাব সংস্কার এমন বিষয় ছিল যার ফলে আরব বিশ্বের উলামায়ে কেরামের সাথে নদওয়ার অসাধারণ আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাব বিস্তারের ফলে তাদের সেখানেও এধরনের সমস্যা দেখা দেয় যার সাথে ভারতবর্ষের মুসলমানদের পরিচয় ঘটেছিল। আলোকিত হৃদয়ের অধিকারী ও মুখলিস উলামায়ে কেরাম এই অবস্থাদৃষ্টে পেরেশান ছিলেন এবং তাদের সামনে কোন পথ নজরে আসছিল না। তারা না তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তার প্রেক্ষাপট এবং তার চাহিদা ও দাবিকে অস্বীকার করতে পারছিলেন, আর না তাকে অবিকল কবুল করতে পারছিলেন। নদওয়াতুল উলামা প্রতিষ্ঠার ফলে তাদের কাছে মুশকিল আসান হতে দেখা যায়। কিন্তু যখন এই আন্দোলনের প্রথম আলোকরেখা আরব বিশ্বের দিগন্তে নজরে আসছিল তখন খোদ ভারতবাসী তার সাথে যে অসমীচীন আচরণ করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ সামনে এগুলো বুঝতে পারবেন। আপত্তি উত্থাপনকারী ও ছিদ্রান্বেষণকারীরা বলা শুরু করেন যে, দু বছর হলো, নদওয়া এ পর্যন্ত কী করতে পেরেছে?

নদওয়ার সমালোচনাকারীদের প্রতি মাওলানার জবাব

সেসব সমালোচনাকারীর জবাবে মাওলানা রহ. হৃদয়ের রক্তকণা দিয়ে নিম্নলিখিত বাক্যগুলো লেখেন- 'আমাদের কিছু সহজ-সরল ভাই এখন থেকে এ কথা বলা শুরু করেছে যে, দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও নদওয়া কী কাজ করেছে? কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো এ কথা যারা বলেন, তারা নিজেরাও কখনো কোনো কাজ করেননি। এর মূল্য তারাই জানেন যারা দুনিয়াতে থেকে কখনো কোনো কাজ করেছেন। কোনো ছোট থেকে ছোট কাজ এমন নিয়ে আসেন যার

দিক থেকে মানুষের সাধারণ দৃষ্টি সরে গেছে– তা নতুনভাবে শুরু করার সময় আপনি বুঝতে পারবেন যে, কেমন সব কষ্ট ও বাঁধা সামনে আসে। আফসোসের বিষয় যুগের পরিবর্তনের ফলে যেখানে আমাদের মধ্যে আরও অনেক দোষ-ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে এক বড় দোষ (যা উন্নতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক) এও যে, আমরা যে কাজকে উপকারী মনে করছি, গাফলত ও অলসতার কারণে তাতে হাত লাগাই না। আর যদি কোনো আল্লাহর বান্দা তা করতে উৎসাহীও হয় তখন তাকে সহযোগিতার পরিবর্তে তার দোষ তালাশ করা শুরু করে দেই। আর যিনি সবচেয়ে উপযুক্ত কাজটি করেন তিনি দূর থেকে দাঁড়িয়ে ফলাফলের অপেক্ষায় থাকেন।'

এ ধরনের ছিদ্রান্বেষী ও দোষ ধরার লোক কোনো যুগেই কম ছিল না। মাওলানা মুহাম্মদ আলী রহ. অন্য এক স্থানে বলেন, এক বছর অতিক্রম হতেই লোকেরা বিভিন্ন ধরনের বিরূপ আপত্তি ও মন্তব্য উত্থাপন করতে শুরু করে। নদওয়ার ঐতিহাসিক সেই সম্মেলন দেখা সত্ত্বেও, যা পুরো দেশের মধ্যে জীবনের এক ঢেউ সৃষ্টি করে দেয় এবং প্রত্যেক শ্রেণি ও দলের লোক তাতে আবেগ ও উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেছিল– নদওয়াতুল উলামার ছিদ্রান্বেষী এক বছরও ধৈর্যধারণ করতে পারেনি। অথচ বিভিন্ন মতাদর্শের লোকদের এই প্রাণবন্ত উপস্থিতি ও বিস্ময়কর একতাবন্ধন স্বতন্ত্রভাবেই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ও বড় কৃতিত্বের মর্যাদা রাখে।

দারুল ইফতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মাওলানার বয়ান

১৩১৩ হিজরী সালের ১ মুহাররম ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বৈঠকে মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. অনেক জোরালোভাবে দারুল ইফতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োনীয়তা তুলে ধরেন। (উল্লেখ্য, ইতোপূর্বের লাখনৌ সম্মেলনে মাওলানা রহ. এই প্রস্তাব পেশ করেছিলেন।) মাওলানা বলেছিলেন, এক বছরের মধ্যে যে পরিমাণ প্রসিদ্ধি নদওয়াতুল উলামার হয়েছে অন্যান্য সংস্থার দশ পনের বছরেও তেমনটি সম্ভবত হয়নি। অধিকন্তু, বিশেষ-সাধারণ সবাই জানে, এটি উলামায়ে কেরামের সংস্থা। এখন যেসব লোক বিশেষ কোনো আলেমের সাথে সম্পর্ক রাখে তারা ছাড়াও পুরো ভারতবর্ষের মুসলমানদের দৃষ্টি এই সম্মেলনের দিকে রয়েছে। যখন তাদের কোনো প্রয়োজন দেখা দিবে কিংবা আকায়েদ ও আমলী সংক্রান্ত কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করার দরকার হবে তখন অবশ্যই তারা নদওয়ার কাছে প্রশ্ন করবে।

ফেকাহ্শাস্ত্রে গবেষণা ও প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা

এরপর তিনি ইফতা বিভাগের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের ওপর ইলমী ও শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তারিত মন্তব্য পেশ করে বলেন,

'ফেকাহ্ সম্পর্কে আমি যে দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছি তা ছিল তাত্ত্বিক দিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের উলামায়ে কেরামের আরও একটি সমস্যা হলো– যুগের অবস্থার ওপর তাদের কোনো দৃষ্টি নেই। জাগতিক বিষয় সম্পর্কে অধিকাংশই অসচেতন। তার মার-প্যাঁচসমূহ সমাধানে অক্ষম। যখন ফুকাহায়ে কেরাম এ কথা বলেন যে, যুগের পরিবর্তনের ফলে বিধি-বিধানও পরিবর্তন হয়ে যায়, তখন তাদের জন্য অপরিহার্য হলো যুগের অবস্থা সম্পর্কে তারা অবগত হবেন। বস্তুত যখন এ ধরনের মুআমালাত সম্পর্কে অবহিত না হবেন এবং তার মার-প্যাঁচসমূহ ধরতে অক্ষম হবেন তখন যথাযথ উত্তর কিভাবে দিতে সক্ষম হবেন। এখানে ইফতা-বিভাগের প্রয়োজনীয়তা আরেকভাবেও প্রমাণিত হয়। এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া ব্যতিরেকে এই স্তর অতিক্রম করা যাবে না, বরং আমাদের অবস্থা দৃষ্টে তা অসম্ভব। আমাদের উলামায়ে কেরামের এদিকে মনোযোগই নেই যে, তারা যুগের অবস্থা ও তার বর্তমান বিষয়সমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন। যখন আমরা এ বাস্তবতার মুখোমুখি তখন ইনসাফের সাথে চিন্তা করলে সহজেই অনুমান করা যাবে দীনের নিরীখে ইফতা বিভাগের কত প্রয়োজন রয়েছে।

এরপরে মাওলানা রহ. ১১ দফা সম্বলিত 'মাহকামায়ে ইফতা' সম্পর্কে একটি নকশা পেশ করেন, যা পড়লে মাওলানার জ্ঞানের প্রসারতা ও দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। মুনশী আতহার আলী সাহেব, রয়ীসে কাকুরদী, অনেকক্ষণ পর্যন্ত আবেগদীপ্তভাবে এর সমর্থনে বয়ান রাখেন এবং বলেন, 'প্রথম প্রথম আমি এর বিরোধী ছিলাম। কিন্তু মাওলানা সাহেবের বয়ান আমার ধারণা পাল্টে দিচ্ছে। অবশেষে শর্তসাপেক্ষে দারুল ইফতা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি মঞ্জুর হয়।

দারুল উলূমের প্রস্তাব ও মাওলানা রহ.-এর রূপরেখা

নদওয়াতুল উলামার তত্ত্বাবধানে বড় মাপের একটি দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সর্বপ্রথম মাওলানার রহ.-এর চিন্তাতেই আসে। মাওলানা রহ. তার একটি সুন্দর রূপরেখা তৈরি করে ১৪ মুহাররম ১৩১৩ হিজরী সনে ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মেলনে পেশ করেন। এই প্রস্তাব মঞ্জুর হয়। এরপর এই রূপরেখা 'প্রস্তাবিত দারুল উলূম' নামে প্রকাশ করে মতামত নেয়ার জন্যে শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম, আকাবির ও আহলে ইলমদের কাছে পাঠানো হয়। তাতে দারুল উলূমের

উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা দুটি বিষয়ের ওপর বিশেষ জোর দেন। তিনি লেখেন–

দীনী ইলম, ফেকাহ্ ও কালাম শাস্ত্রে পূর্ণ যোগ্যতা

সবচেয়ে অগ্রাধিকার এই বিষয়ে যে, কওমের মধ্যে উলামায়ে কেরামের এমন এক জামাত তৈরি হবে, যারা ধর্মীয় ইলমের ক্ষেত্রে পূর্ণ মাত্রার যোগ্যতা রাখবেন। বিশেষত ইলমে কালামের ক্ষেত্রে। যাতে ধর্মবিরোধীদের বিপরীতে ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হতে পারে। আর ফেকাহশাস্ত্রের ওপর তাদের পূর্ণযোগ্যতা অর্জিত হবে যাতে ইবাদাত ও লেনদেনসংক্রান্ত বিধি-বিধান ও ফতওয়ার ক্ষেত্রে তারা নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হতে পারেন।

বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগতি

দ্বিতীয় বিষয় যা মাওলানা রহ. গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন তা হলো সমকালীন বিশ্বপরিস্থিতি ও ঘটনা সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের অবগতি। তিনি লেখেন– এই বিষয়ের বড় প্রয়োজন যে, একদল উলামায়ে কেরাম বিশ্বের অবস্থা ও বাস্তবতা সম্পর্কেও অবগত থাকবেন। যারা জানবেন তারা যে রাষ্ট্রে বসবাস করছেন তার রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনার সংবিধান কী। তার সাথে রাষ্ট্রের কী রকম সম্পর্ক রয়েছে! মুসলমানদের জাগতিক অবস্থা কেমন। তাদের কী কী প্রয়োজন সামনে রয়েছে। রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে তার ফলে মুসলমানদের অবস্থার ওপর কী প্রভাব পড়ছে। দেশের মধ্যে উলামায়ে কেরামের প্রভাব যে ধীরে ধীরে কমে আসছে তার একটি বড় কারণ হলো এ ধারণা সাধারণ্যে প্রচার হয়ে আসছে যে, উলামায়ে কেরাম কামরাসমূহে ইতেকাফরত রয়েছেন এবং দুনিয়ার অবস্থা সম্পর্কে তাদের একেবারেই কোনো খবর নেই। এ জন্য দুনিয়ার লেনদেনের ক্ষেত্রে তাদের নির্দেশনা ও হেদায়াত সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হচ্ছে।

নিঃসন্দেহে যেসব উলামায়ে কেরাম দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ হাত ধুয়ে বসেছেন এবং তাদের অধিকহারে ইবাদত ও জিকির-ফিকিরের কারণে নিজের পরিবার-পরিজন, ছেলে-মেয়েদের প্রয়োজনের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই আসহাবে সুফফার সাথে তাদের তুলনা দেয়া যেতে পারে। কিন্তু একটি বিষয় জানা থাকা উচিত, সকল সাহাবায়ে কেরাম আসহাবে সুফফা ছিলেন না; আর না তা হওয়া সম্ভব ছিল।

নিঃসন্দেহে আসহাবে সুফফার মতো দল সর্বদা উম্মতের মধ্যে থাকা উচিত। কিন্তু পাশাপাশি নেহায়েত জরুরি হলো একটি বড় দল এমনও থাকবে যারা

জ্ঞানগরিমা, ইন্তেজাম ও ব্যবস্থাপনা, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে হযরত ওমর রাযি., আমর ইবনুল আস রাযি., খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ রাযি., আবু ওবায়দা রাযি. প্রমুখ সাহাবীর মতো হবেন।

'দারুল উলূমের প্রস্তাবিত রূপরেখায়' মাওলানা রহ. শিক্ষার স্তরসমূহ, শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষার সময়কাল, বিষয় বিন্যাস, ছাত্র ও শিক্ষকদের থাকার স্থান, সময়সূচি ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণসহ একটি পরিষ্কার ও সুসমন্বিত কর্মপরিকল্পনা পেশ করেন। তা অধ্যয়নের মাধ্যমে অবগত হওয়া যাবে, মাওলানার দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে কত সুপরিসর, কত আধুনিক, কত সুদূরপ্রসারী ও সময়োপযোগী ছিল। এই রূপরেখা ও পরিকল্পনা এতদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও সে রকম সতেজ ও প্রাণবন্ত রয়েছে। নদওয়ার প্রত্যেক হিতাকাঙ্ক্ষী ও জিম্মাদারের জন্য সেই নকশা অধ্যয়ন করা উপকারী ও জরুরি। এই 'রূপরেখা ও পরিকল্পনা' দরকার ছিল পুরোটাই এখানে তুলে ধরি। কিন্তু দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার কারণে তার কিছু লক্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে লেখা হচ্ছে। এ থেকে আমাদের ধারণা হবে যে, মাওলানার চিন্তায় দারুল উলূমের কী চিত্র ও নকশা ছিল। এটি কলমের চিত্র যার সাহায্যে আমরা মাওলানার চিন্তা-চেতনাকে আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি এবং তার তালিম, তরবিয়াত ও ব্যক্তিত্ব গঠনের পরিকল্পনাকে নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে অনুধাবন করতে পারি। সেই প্রস্তাবমালায় মাওলানা রহ. দারুল উলূমের চৌহদ্দিতে শিক্ষক, নেগরান ও মুরব্বী হযরতদের আবাস নির্মাণের ওপর জোর দিয়েছিলেন। ছাত্রদের জন্য একটি খাবার ঘরের (ডাইনিং হল) প্রস্তাব করেছিলেন, যেখানে ছাত্র-শিক্ষক একত্রে খাবার খাবে। ছাত্রদের আবাসনের ব্যাপারে লেখেন–

'প্রত্যেক ছাত্রের জন্য আলাদা কামরা হবে। কোনো বিশেষ অবস্থা ব্যতীত দুইজন ছাত্র এক কক্ষে থাকবে না। ছাত্রদেরকে জোর দেওয়া হবে যাতে তারা নিজেদের কামরাগুলোকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যেসব ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন– ঘুম থেকে ওঠা, নামাজ পড়া, অধ্যয়ন করা, মাদরাসায় যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া করা, ব্যায়াম করা ইত্যাদি সবকিছুর জন্যে নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ থাকবে। আর সকল ছাত্রের নির্ধারিত সময়ে সব কাজ করতে হবে।'

একটি ইসলামী পোশাক

একটি বিশেষ বিষয় যা এই প্রস্তাবে নজরে আসে তা হলো একটি ইসলামী ইউনিফর্ম। বস্তুত মাওলানার এই দৃষ্টিভঙ্গি বড় দূরদর্শিতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় বহন করে।

ঘোড় সওয়ারী ও তীরন্দাযি

পাশাপাশি আসর নামাজের পর সব ছাত্র ঘোড়ায় আরোহন, বন্দুক চালানো, তীরন্দাজি এ ধরনের বিভিন্ন শারীরিক কসরত ও ব্যায়ামে অংশ নেবে। হালাল উপার্জনের জন্যে কিছু কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করা হবে। তবে তা নির্ধারণ ছাত্রদের ঝোঁক ও আগ্রহের ভিত্তিতে হবে। মাসে দুতিন বার ছাত্ররা জ্ঞানগত ও চরিত্রগত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করবে। আর তার জন্য একটি নির্দিষ্ট হলও থাকবে। থাকা-খাওয়া ও লেবাস-পোশাকের ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্র ছাত্রদের মধ্যে মাওলানা রহ. কোনো পার্থক্য রাখেননি। মাওলানার ভাষায় কেবল পার্থক্য এতটুকু যে, ধনী ছাত্ররা সব খরচ নিজেদের পক্ষ থেকে বহন করবে। আর গরিব ছাত্ররা এসব কিছুর ব্যবস্থা মাদরাসার পক্ষ থেকে লাভ করবে।

চরিত্র সংশোধন ও আত্মশুদ্ধি

ব্যক্তিগঠন ও চরিত্র সংশোধনের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধির কথাও মাওলানা রহ. এই নিখাদ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত চিত্রকল্পের মধ্যেও ভুলে যাননি। নিশানা ঠিক করা, ঘোড়া দৌড়ানো শেখা এবং আধুনিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতির পাশাপাশি তার ওপরও জোর দিয়েছেন। বস্তুত মাওলানার সেই বিশেষত্ব ও সুসমন্বিত চিন্তা সে যুগের কম লোকের মধ্যে নজরে আসে। এক্ষেত্রে তাসাওউফ ও চরিত্রগঠন সম্পর্কিত দুটি প্রসিদ্ধ কিতাব এহইয়াউল উলূম ও আওয়ারিফুল মাআরিফের বাছাইকৃত অংশ পড়ানোর সুপারিশ করা হয় এবং তাফসীর ও হাদীস অধ্যয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়।

আরবি ভাষার চর্চা

মাসে একবার আরবি ভাষায় আলোচনা অনুষ্ঠান জরুরি ও বাধ্যতামূলক সাব্যস্ত করা হয়। যার কারণ ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা লেখেন–

'আজকালের ছাত্র বরং অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের অবস্থা এমন যদি কোনো আরব আসে তবে তার সাথে পাঁচ মিনিট আরবি ভাষারীতিতে কথা-বার্তা বলতে সক্ষম হয় না।

ইসলামী দেশসমূহের ভৌগোলিক জ্ঞানের ওপরও মাওলানা জোর দেন এবং কুরআন ও হাদীসের ভাষা ও প্রবাদ প্রবচন বোঝার জন্যে তার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিষয়গুলোর ওপর বয়ান

ওয়াজ ও বিতর্ক ছাড়াও যেকোনো জ্ঞানগত, রাজনৈতিক কিংবা ঐতিহাসিক বিষয়ের ওপর দু ঘণ্টা বক্তৃতা চর্চার বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে।

পরীক্ষার ক্ষেত্রে মাওলানা রহ. কঠিন কঠিন শর্ত লিখেছেন এবং ফারেগীনের জন্য 'আবা' ব্যবহারের পরামর্শ দেন। যা ফারেগ হওয়ার পর মাদারাসার পক্ষ থেকে তাদেরকে নিয়মাতান্ত্রিকভাবে দেয়া হবে।

পোশাক, খাবার, আবাসন পদ্ধতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে মাওলানা রহ. আরবি রুচি-অভিরুচিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং তাকে অনুসরণযোগ্য হিসেবে পেশ করেছেন।

দরসিয়তের ক্ষেত্রে যেসব প্রস্তাব ছিল তার আলোচনা আমি এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেছি। তার বিস্তারিত বর্ণনা 'আরবি নেসাবের রূপকল্প' শিরোনামে সামনে পাওয়া যাবে। এই চিত্র পেশ করার পর মাওলানা লিখেছেন–

'সে সব প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হলো, আমাদের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা এমন সুসভ্য ও ধার্মিক হবে যে, তারা অন্যদের ওপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। ছাত্রদের মধ্যে সাহস, উন্নত মনোবল ও উদার মানোভাব তৈরি হবে যা সে ধরনের দারুল উলূম ব্যতীত– যাতে সকল বিষয় নেহায়েত শান-শওকতের সাথে বিদ্যমান থাকবে– অর্জিত হতে পারে না। দীনী ইলম, বিশেষত ইলমে কালামের ক্ষেত্রে– যার তখন নিতান্ত প্রয়োজন ছিল– উন্নত স্তরের দক্ষতা সৃষ্টি করতে হবে, যাতে নাস্তিক্যবাদ ও ধর্মহীনতার মোকাবেলা পূর্ণ জোর ও শক্তির সাথে করা যেতে পারে।

পরিশেষে মাওলানা রহ. সেই পরিকল্পনার ব্যয় ও খরচের আনুমানিক পরিমাণ তখনকার হিসেবে দশ লাখ রূপি সাব্যস্ত করেন।

উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক পত্রসমূহ

এই রূপরেখা উলামায়ে কেরাম ও চিন্তাশীল একটি বড় শ্রেণির কাছে পাঠানো হয়। যদিও অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম সে সময় এতটুকু সামনে অগ্রসর হয়ে এবং প্রচলিত ধ্যান-ধারণার ঊর্ধ্বে ওঠে চিন্তা-ভাবনা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু তারপরেও একটি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ব্যক্তি তাকে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও উৎসাহের সাথে স্বাগত জানান এবং নিজেদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। আর তাকে এমন এক বিপ্লবী পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়েছে, মুসলিম উম্মাহর জন্যে যার পরিণাম ও ফলাফল বড় সুদূরপ্রসারী ও প্রাণসঞ্জীবনী প্রমাণিত হতে পারে।

মাওলানা থানভী রহ.-এর অভিমত

মাওলানা থানভী রহ.ও (যিনি সে সময় মাদরাসা জামিউল উলূম, কানপুর-এর প্রধান শিক্ষক ছিলেন) বিস্তারিতভাবে নিজের মতামত পেশ করেন এবং লেখেন–

'দারুল উলূমের পুরো চিত্রকল্পই যথাযথ ও সময়োপযোগী। এমন আজীমুশ-শান ও মর্যাদাপূর্ণ দারুল উলূমের 'ওজুদে জেহেনী' থেকে 'ওজুদে খারেজী'তে আসা 'মুজেদুল মওজুদাত'-এর কাছে কোনো দুরূহ বিষয় নয়।'

মাওলানা রহ. সেই বয়ানে মুসলমানদের সমর্থন ও সহযোগিতার দিকেও মনোযোগ আকর্ষণ করেন। দারুল উলূমের এই রূপখেরা বেরেলী'র সম্মেলনে পেশ ও পাশ করা হয়।

নদওয়াতুল উলামার প্রথম প্রস্তাবিত নেসাবে তালিম

নদওয়াতুল উলামার স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতার জন্যে এই সময়টা ছিল কেবলই চিন্তাজগতের ব্যস্ততার। যখন নদওয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি রচিত হচ্ছিল, সে সময় সামান্য উদাসীনতা কিংবা বিচ্যুতি তার ভিতকে ভুল পথে ঠেলে দিতে পারত। মাওলানার চিন্তা-চেতনা সে ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছিল নিরন্তর। বস্তুত তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ সজাগ ও হুঁশিয়ারির সাথে পথ দেখিয়ে যাচ্ছিলেন। ১২ মুহাররম ১৩১৩ হিজরীতে তিনি দারুল উলূমের রূপরেখা পেশ করেছিলেন। তার পাঁচ মাস পরে ১৪ জুমাদাল উলা ১৩১৩ হিজরী সালে তিনি 'নেসাবে আরবি'র খসড়া রূপরেখা' নামে নদওয়াতুল উলামার প্রস্তাবিত নেসাবে তালিমের নকশা পেশ করেন।

এই পুস্তিকায় তিনি হিন্দুস্তানের দরসী নেসাবের পরিমার্জন পরিবর্ধন ও বিবর্তনের এক সুসমন্বিত অথচ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার পর পরিবর্তিত অবস্থার আলোকে একটি নতুন নেসাব প্রস্তাব করেন। এটি যেন নদওয়ার প্রথম 'মেনিফেস্টো' যাতে তার বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত ও উদ্দেশ্যসমূহ অনেক সুন্দরভাবে উঠে আসে। বস্তুত সেসব চিন্তা-জাগতিক ভিতের উপর প্রতিষ্ঠা লাভকারী ইমারতের পুরো চিত্র তাতে অঙ্কিত হয়েছে।

তাতে মাওলানা রহ. ২০টি জ্ঞানশাস্ত্রের উল্লেখ করেন এবং তাতে সেসব শাস্ত্রের কিতাব বাছাই করেন। এরপর এই বাছাইয়ের কারণসমূহ বর্ণনা করেন। সেসব শাস্ত্রের মধ্যে অধিকাংশই প্রচলিত। মাওলানা ৬টি ইলমের সংযোজন ঘটান। (১) ইতিহাস, (২) উসূলে লুগাত, (৩) তাজবীদ, (৪) ছন্দশাস্ত্র, (৫) আধ্যাত্মিকতা ও আত্মশুদ্ধি (৬) ইসলামী বিধানের তাৎপর্য। অতঃপর তিনি এই সংযোজনের কারণও বর্ণনা করেন।

ইতিহাস শাস্ত্রের গুরুত্ব

তিনি ইতিহাস সম্পর্কে লেখেন, (এক্ষেত্রে মাওলানা রহ. 'তারিখুল খুলাফা' এবং মুকাদ্দামায়ে ইবনে খালদুন সংযোজন করেছিলেন।) এ সময় এর খুব প্রয়োজন রয়েছে। তা দেখলেই ইসলামের শান শওকত বোঝা যায়। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে এ বিষয়ের খুব জোরশোর রয়েছে, মুসলমানরা তা না জানার কারণে তাদেরকে অনেক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সাথে দেখা হচ্ছে। নীচু নীচু লোকেরা উলামায়ে কেরামকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে নিজেদের সামনে গণ্ডমূর্খ ধারণা করে অনেক অসম্মানের নজরে দেখছে। সামান্য অমনোযোগিতার কারণে মুসলিম ছেলেদের সামনে তাচ্ছিল্যের শিকার হওয়া ইসলামের শানের পরিপন্থি এবং অত্যন্ত অযৌক্তিক বিষয়। বিশেষত ওই জ্ঞান যা জানার ফলে দীন-দুনিয়া উভয়ের উপকার রয়েছে।'

বিধি-বিধানের তাৎপর্য

'আসরারে আহকাম' তথা বিধি-বিধানের তাৎপর্য জানার প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা রহ. লেখেন–

'এটি এমন ইলম যার মাধ্যমে ঈমান 'তাকলীদ' থেকে 'তাহকীক'–এর মর্যাদায় উপনীত হয়। অন্তরের প্রশান্তি পূর্ণমাত্রা লাভ করে। ধর্মবিদ্বেষীদের জবাবে অনেক কিছুই এ থেকে সহযোগিতা পাওয়া যায়। বর্তমানে এটার নিতান্ত প্রয়োজন রয়েছে। কেননা স্বাধীনতা বেড়ে চলেছে। কারণ না জেনে মানুষ কোনো কিছুকে মেনে নেয় না। তাই একে দরসের অন্তর্ভুক্ত করা নিতান্ত প্রয়োজন।' যেসব জ্ঞান-শাস্ত্র হ্রাস-বৃদ্ধি সংযোজন-পরিমার্জন করা হয়েছে তন্মধ্যে দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি রয়েছে। ইলমে 'হায়য়াত' তথা জ্যোতির্বিদ্যাসংক্রান্ত প্রসিদ্ধ কিতাব শরহে চুগমিনী বাদ দেওয়া হয় এবং আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যাকে উত্তম ও সমীচীন মনে করা হয়। কিন্তু এ পরিপ্রেক্ষিতে কোনো নির্ধারিত কিতাব প্রস্তাব করা হয়নি।

নেসাবের ওপর এক নজর

মাওলানার লিখিত নেসাব ও নেসাবের নীতিমালা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনা করার পর বোঝা যায়, তাতে আধুনিক দর্শন, আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা ও আধুনিক ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তার স্বীকারোক্তি পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখ করার মতো কিতাব কম নজরে আসে। অংকশাস্ত্র ও ভূগোলের কোনো কিতাবের প্রস্তাব করা হয়নি। অথচ উভয় শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারটি মাওলানার সম্পূর্ণ অনুভবে ছিল। রাজনীতি ও

অর্থনীতির কথা নিয়মতান্ত্রিকভাবে সেই পুস্তিকায় উল্লেখ নেই। অথচ তার চাহিদা ও উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে।

'দারুল উলূমের প্রস্তাবিত রূপরেখা' যা তার কয়েক মাস পূর্বে লেখা হয়েছিল তাতে তিনি শাসনব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্র, তার পরিবর্তন ও সেই পরিবর্তনের ভালোমন্দ প্রভাব এবং উপকারিতা ও অপকারিতার উল্লেখ করেছেন। উলামায়ে কেরামের জন্যে সে সম্পর্কে অবগতি অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে নদওয়াতুল উলামার প্রথম দিকেই তিনি উলামায়ে কেরামকে জীবিকা উপার্জনের দিকে মনোযোগী হওয়ার জন্যে দাওয়াত দিতে থাকেন এবং অর্থনৈতিকভাবে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে থাকেন। তথাপি কী কারণে অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কে কোনো কিতাব নেসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি?

মাওলানার অক্ষমতা

ছিদ্রান্বেষণকারীদের সম্ভবত তাতে আপত্তি ও সমালোচনার একটি সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হয়েছে! কিন্তু আমার দৃষ্টিতে যিনিই এমন অবস্থানে হতেন এবং নেসাব বিন্যস্ত করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁর কাঁধে অর্পিত হতো এবং সুখ স্বপ্নের ধ্যান-ধারণার জগত থেকে বেরিয়ে বাস্তব ক্ষেত্রের দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যার মোকাবেলা করার প্রয়োজন দেখা দিত তবে তিনি এমন পরিস্থিতিতে এর চেয়ে বেশি চিন্তা করতে পারতেন না। এ বিষয়টিকে আমাদের সেই পরিবেশে থেকে চিন্তা করতে হবে যে পরিবেশে মাওলানা রহ. এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা-সংক্রান্ত পরিকল্পনা পেশ করেছেন। সে সময় রাজনীতি, অর্থনীতির মতো জ্ঞান শাস্ত্রের এত সুসংহত, সুবিন্যস্ত ও গ্রন্থিত কিতাব বিদ্যমান ছিল না, যেমনটি বর্তমানে দেখা যায়। আর তা থেকে উপকৃত হওয়া সে সময় এত সহজ ছিল না যেমনটি বর্তমানে হচ্ছে। দ্বিতীয় বিষয় হলো, এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান পূর্ণরূপে উর্দুতে অনূদিত হয়নি। তৃতীয়ত, যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো পশ্চিমারা সেসব জ্ঞান শাস্ত্রকে নিজেদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে গ্রন্থিত করেছে এবং তাতে পূর্ণরূপে পশ্চিমা চিন্তাধারা ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ছিল। মুসলমানদের জন্য তা পূর্ণরূপে গ্রহণ করা না উপকারী ছিল না তা সম্ভব ছিল। মাওলানা বড় সরলতা ও অপরাগতার সাথে এই শূন্যতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইতিহাসের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, আক্ষেপের বিষয় হলো, যে ধরনের ইতিহাসের বর্তমানে প্রয়োজন রয়েছে তেমনটি নজরে পড়ে না। যদি আল্লাহ তাআলা ব্যবস্থা করে দেন তবে তাকে নেসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ইলমে কালামের কথা উল্লেখ করে বলেন–

আমাদের 'ইলমে কালাম' যাদের জন্য পড়াতে হবে তারা সবাই নতুন নতুন ফেরকা। তাদের জন্য নতুন ইলমে কালামের প্রয়োজন। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য এই নয় যে, পুরনো সব 'ইলমে কালাম' সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে। বরং সেসব বিষয় সংযোজন করা যা এ সময়ের জন্য আবশ্যক।'

আধুনিক দর্শনের ক্ষেত্রে মাওলানা রহ. একটি গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন–

'আধুনিক দর্শনশাস্ত্রকে রদ করার জন্য ইংরেজি জানাও আবশ্যক। কেননা, এই দর্শন ইংরেজি ভাষাতেই রচিত। বস্তুত অনুবাদ করে তার জবাব দেওয়া যেমনটি ইসলামের শুরুর যুগে ইউনানী দর্শনের সাথে করা হয়েছে যথেষ্ট হতে পারে না।'

পরে লিখেছেন–

'আধুনিক দর্শনের মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা নিত্য পরিবর্তনশীল। নতুন নতুন গবেষণা এতে নিত্য যোগ হচ্ছে। অতএব, সর্বদা তার অনুবাদ করা ও জবাব লেখা কঠিন অসুবিধাই কেবল নয়; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অনর্থক বিবেচিত হবে। কেননা, যতদিনে অনুবাদ হবে এবং জবাব লিখে প্রচার করা হবে ততদিনে সেখানে তা পরিবর্তিত হয়ে থাকবে। তখন আমাদের জবাব তাদের সামনে অর্থহীন সাব্যস্ত হবে।

গণিতশাস্ত্র, ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে মাওলানা লিখেছেন–

এসব শাস্ত্রের কিতাব আমি এখন নির্দিষ্ট করছি না। পরামর্শ সাপেক্ষে পরবর্তী সময়ে করা হবে।

নতুন জ্ঞান-শাস্ত্রের ওপর উর্দুতে এমন সব কিতাব, যা ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লিখিত, সে সময় দুষ্প্রাপ্য ছিল। এজন্যে তা বাছাই করার কোনো প্রশ্নই আসেনি। যে সকল কিতাব মিসর, সিরিয়া ও বৈরুতে প্রকাশিত হচ্ছিল তা পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা ও বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার মিশ্রণ থেকে পবিত্র ছিল না; বরং অবিকল তাদের চর্বিত চর্বণ ছিল। এছাড়াও সেসব কিতাবের শাস্ত্রীয় মান মাদরাসার ছাত্রদের অনুধাবন যোগ্যতার বহু ঊর্ধ্বে ছিল। কেননা যারা এসব শাস্ত্রের প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কেও অপরিচিত ছিল।

দ্বিতীয় সমস্যা

দ্বিতীয় সমস্যা হলো নির্ধারণ করলে সেসব কিতাব থেকেই করতে হতো যা সে সময় বিদ্যমান ছিল। নতুন জ্ঞানশাস্ত্রের পাঠদানের জন্য নতুন নতুন কিতাব

রচনা, সরফ, নাহব, আদব ও বালাগাতের জন্য নেসাব বিন্যস্ত করা না সে সময় সম্ভব ছিল, আর না সকল স্তরের লোকদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য ছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য বিশেষ সময়ের প্রয়োজন ছিল। এমতাবস্থায় বেশি থেকে বেশি এটি করা যেত যে, যে সকল কিতাব সে যুগে প্রচলিত ও সুলভ ছিল তা থেকে যুগের অবস্থা, ছাত্রদের যোগ্যতা ও ভবিষ্যতের সমস্যাসমূহকে সামনে রেখে উত্তম থেকে উত্তম কিতাব নির্বাচন করা যেত। যে সকল নতুন ও সফল কিতাব এসব বিষয়ে লেখা হয়েছে তা থেকে উপকার নেয়া এবং যেসব জ্ঞান বিদ্যার গুরুত্ব এ যুগে অনেক বেড়ে গেছে এবং যা আমাদের দীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্য উপকারী ও আবশ্যক, সেগুলোকে নেসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেত। উদাহরণস্বরূপ, নতুন ইলমে কালাম, শরয়ী বিধি-বিধানের রহস্যজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি। মানতিক ও ফালসাফার বড় অংশকে বর্জন এবং কেবল তার উপকারী ও প্রয়োজনীয় অংশের ওপর ক্ষান্ত করা যায়। কুরআন, হাদীস ও ফেকাহর দিকে অধিক মনোযোগ দিতে হবে এবং এই চেষ্টা করতে হবে, ছাত্রদের যেন সেসব জ্ঞানের সাথে অধিক থেকে অধিকতর সম্পর্ক তৈরি হয় এবং সেসবের মহব্বত ও আযমত তাদের মানসপটে যেন নকশা হয়ে যায় এবং তারা এগুলোকেই তাদের সব চেষ্টা, সাধনা, সামাজিক ও গঠনমূলক কাজের প্রাণসত্তা মনে করে।

মাওলানা যে নেসাব বিন্যস্ত করেছিলেন তা এই মানদণ্ডে পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ। ফারেগ হওয়ার পর 'তাকমীল' এর জন্য মাওলানা যে নেসাব প্রস্তাব করেছেন তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তাতে প্রত্যেক শাস্ত্রের সাথে তাফসীর, হাদীস ও ফেকাহ্ শাস্ত্রের একটি করে বাছাইকৃত কিতাব আবশ্যকীয় করে দেয়া হয়। যদি কেউ আদব কিংবা ইতিহাসের ওপর তাকমীল করতে চায় তবে তাকে সেই বিশেষ বিষয়ের পাশাপাশি উল্লিখিত বিষয়সমূহের প্রত্যেকটি থেকে একটি কিতাবও পড়তে হবে যাতে সে সকল জ্ঞান-শাস্ত্রের সাথে তাদের সরাসরি সম্পর্ক কায়েম থাকে যেসব জ্ঞান-শাস্ত্রের ওপর ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। আর যাতে সেসব জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ও সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। বাস্তবতা হলো, মাওলানার এই দৃষ্টিভঙ্গি তার বোধ ও রুচির যথার্থতা এবং স্থান, কালপাত্র নির্বাচনের প্রাজ্ঞতার প্রমাণ বহন করে এবং বাস্তবতা ও হেকমতের প্রতি তাঁর অনুরাগের চিত্র তুলে ধরে।

পাশাপাশি আত্মশুদ্ধির ও চরিত্র সংশোধনের বিষয়ে মাওলানা রহ. কিছু কিতাবের প্রস্তাব করেন, চাই তা পাঠ্যতালিকাভুক্ত হোক কিংবা কেবল অধ্যয়নের জন্য হোক।

বিপ্লবী নেসাব

প্রচলিত দরসে নেজামী এবং শরাহ ও হাশিয়ার কুতুবখানার বিপরীতে এই নেসাব একটি বিপ্লবী নেসাব আখ্যা পাওয়ার উপযুক্ত এবং তার পৃষ্ঠপোষকদের দৃষ্টিতে এটি বিদ্রোহ থেকে কোনো অংশে কম নয়। এতে তার পুরো নেজামকে প্রথমবারের মতো উলট-পালট করে দেয়া হয়েছে। আর সেসব অনেক নীতিমালা ও প্রচলিত বর্ণনা ধারাকে ভেঙে দেয়া হয়েছে, যেসবের ওপর তার ভিত্তি ছিল। এই নেসাবে মাওলানা রহ. যেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেছেন তা সেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে অনেক বেশি সুপরিসর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ, যেসব উদ্দেশ্য সে দরসের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষকদের নজরে ছিল। কিতাব নির্বাচন ও বিন্যাস, পরিমার্জন ও সংযোজনের সময় এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় যেন এ সকল কিতাব ছাত্রদের মধ্যে সে যোগ্যতা ও দক্ষতা গুণাগুণ ও বিশেষত্ব তৈরি করতে সক্ষম হয়, যা এই পরিবর্তনশীল ও বস্তুবাদী পৃথিবীতে আবশ্যক।

এই নেসাবে তালিম ও দারুল উলূমের সেই রূপরেখা ও সংবিধান বিগত পৃষ্ঠাগুলোতে যার কিছুটা ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে নদওয়াতুল উলামার জন্যে সে সময় নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী যথাযোগ্য নেসাব ও সংবিধান ছিল। এতদসত্ত্বেও, তার ওপর দিয়ে অর্ধ শতাব্দীর অধিক সময়কাল অতিক্রম করে গেছে এবং তাতে বিশেষ পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংযোজনের প্রয়োজন রয়েছে (এবং যতদিন যুগের পালাবদল হতে থাকবে ততদিন তার প্রয়োজন বাকি থাকবে) তার প্রাণশক্তি ও স্পিরিট, অভিরুচি ও উদ্দেশ্য আজও সতেজ ও সজীব রয়েছে। বস্তুত তার কিছু কিছু দিক এই পশ্চিমা, প্রাচ্যবাদী, ধর্মহীনতার ও বস্তুবাদী পৃথিবীতে এখনও অনুসরণযোগ্য ও উপকারী বিবেচিত হতে পারে। মাওলানার এই প্রস্তাবিত নেসাব ৯ রজব ১৩১৩ হিজরীতে পরিচালনা পরিষদের সভায় আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য পেশ করা হয়। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন উলামায়ে কেরামের মতামতও এসে পৌঁছেছিল এবং কিছু নেসাবও সামনে ছিল। তিন দিনের দিবা-রাত্রির আলোচনা-পর্যালোচনার পরে তাতে একাধিক সংযোজন ও সংশোধনী আনা হয়। কিন্তু কাজের পরিপূর্ণতা তারপরেও সম্পন্ন হতে পারেনি এবং বিভিন্ন বৈঠকে তার ওপর ধীর-স্থিরতার সাথে চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকে। আর তাতে একটি সুদীর্ঘ সময় পার হয়ে যায়।

ইস্তফা দেয়ার চেষ্টা

৮ রজব ১৩১৩ হিজরী সনে পরিচালনা কমিটির সম্মেলনে কাজের ব্যাপ্তি, নিজের অসুস্থতা ও দুর্বলতার কারণে (উল্লেখ্য, মাওলানার পূর্ব থেকেই প্লীহার ব্যথাজনিত

অসুস্থতা ছিল। তার ফলে দিন দিন অসুস্থতা বেড়ে চলছিল) মাওলানা রহ. ইস্তফা দিতে চাইলেন। কিন্তু আঞ্জুমানের সভাপতি মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেব রহ. তা নামঞ্জুর করেন বরং এই প্রস্তাব রাখেন, নাজেমের সহযোগিতার জন্যে একজন সহযোগী ঠিক করা হোক। তাতে মাওলানার বোঝা কিছুটা হালকা করতে হবে। সেমতে মাওলানা শাহ সুলায়মান ফলওয়ারবীর কথা প্রস্তাবে আসে। কিন্তু মাসিক ব্যয়ভার সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ দেখা দেয় এবং মাওলানা এই জিম্মাদারী পালন করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। মাওলানা জহুরুল ইসলাম ফতেহপুরী মাওলানা হাকীম সাইয়িদ আব্দুল হাই রহ.-এর নাম প্রস্তাব করেন। মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই রহ. বিনা পারিশ্রমিকে এই খেদমত কবুল করেন এবং সম্মেলন থেকে সবার সম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত স্থির করা হয় যে, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ. যথারীতি নাযেম থাকবেন এবং মাওলানা আব্দুল হাই রহ. সহকারী নাযেম হিসেবে কাজ করে যাবেন।

শিয়াদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকরণ

সেই সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, শিয়াদের আগামী সম্মেলনগুলোতে বয়ান রাখতে কিংবা প্রস্তাব পেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না। (উল্লেখ্য, নদওয়ার প্রথম সম্মেলনে একজন শিয়া মুজতাহিদ বয়ান রেখেছিলেন। তার ফলে বিশেষ তিক্ততা ও সমালোচনা হয়েছিল।

নদওয়ার পরিচিতির জন্য উলামা প্রতিনিধি দল

সেই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়, নদওয়ার ধারণা এবং তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পরিচিতি, পাশাপাশি মাদরাসাগুলোর তত্ত্বাবধান এবং মুসলমানদের অবস্থা জানার জন্য নদওয়ার একটি প্রতিনিধি দল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সফর করবে। এই সিদ্ধান্তও হয় যে, যারা নদওয়ার উদ্দেশ্যের সাথে একমত পোষণ করবে এবং কার্যকরীভাবে তার পূর্ণ সহযোগিতা করবে তাদেরকে 'মুঈনুন্ নদওয়া' বা নদওয়ার সহযোগি হিসেবে আখ্যা দেয়া হবে।

মাওলানার নেতৃত্বে নদওয়ার প্রতিনিধি প্রেরণ ও উল্লেখযোগ্য সফলতা

২৫ রজব ১৩১৩ হিজরী নদওয়াতুল উলামার কানপুর অফিস থেকে মাওলানার নেতৃত্বে একটি দল ফতেহপুর, হাসওয়াহ ও রায়বেরেলীতে সফরের জন্য রওয়ানা হয়। সেখানে পৌঁছে মাদরাসার অবস্থা দেখেন। লোকদেরকে পারস্পরিক বিবাদ থেকে সতর্ক করেন। একতা ও ভালোবাসার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এই সফর অনেক সফল প্রমাণিত হয়। অনেক লোক মৌসুমী ও

অপ্রয়োজনীয় আচার অনুষ্ঠান পালন থেকে তওবা করে এবং সর্বসম্মতিক্রমে লিখিত অঙ্গীকার দেয় যে, ঐক্য ও মহব্বতের সাথে জীবনযাপন করবে। সেসব প্রকাশ্য উপকার ছাড়াও নদওয়ার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ভালোভাবে প্রচার হয়। মাদরাসা ইসলামিয়া ফতেহপুর যা সেখানকার একমাত্র দীনী মাদরাসা ছিল তা অর্থনৈতিক দুরাবস্থার শিকার ছিল। প্রতিনিধি দলের আগমনে তাতেও বসন্ত আসে। ছাত্রদের কক্ষ নির্মাণের জন্য অধিকাংশ শরীকে জলসা নিজেদের একদিনের আয় লিখে দেন। কেউ কেউ এক একটি কামরা নির্মাণের জিম্মাদারী নিজেরা নিয়ে নেন। একজন জমিদার সেই সময় ২৫ বিঘা জমি মাদরাসার জন্য ওয়াকফ করে দেন। অন্য একজন বার্ষিক ২৫ রুপি হারে খাজনার একটি জমি ওয়াকফ করে দেন। তাই সে সময় ইমারতের একটি নকশা নির্মাণের নির্দেশনা দেয়া হয়। এছাড়া মৌসুমী বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে একটি চুক্তিনামা সম্পাদন করা হয় এবং সকলে সর্বসম্মতিক্রমে তা মঞ্জুর করেন।

সেই মাদরাসা সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ.-এর বড় ভাবনা ছিল। এক সময় দেখার জন্য তাতে তাশরিফ নিয়ে যান। সে সময় ছাত্রদের কিছু কামরার নির্মাণসম্পন্ন হয় এবং নির্মাণ কাজ অব্যাহত ছিল।

একটি পুরনো বিবাদের সমাপ্তি

রায়বেরেলীর মাদরাসা ইসলামিয়া বড় ভগ্নদশা অবস্থায় ছিল। এই প্রতিনিধি দল তার ক্ষেত্রেও জীবন-সঞ্জীবনী প্রমাণিত হয়। টাউন হলে সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই রহ. সেখানে একটি হৃদয়কাড়া বয়ান করেন এবং সে সময় মাদরাসার জন্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয়। একটি বড় উপকার এই হয় যে, সেখানে দুইজন জমিদারের মধ্যে অনেক দিন ধরে একটি বিবাদ চলে আসছিল এবং সে কারণে কঠিন ফেতনা সৃষ্টি হয়েছিল। এই প্রতিনিধি দলের কল্যাণে সেই বিবাদ খতম হয়ে যায়।

অন্যান্য অঞ্চলের জন্য মাওলানা মুশতাক আলীকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি আশানুরূপ আন্তরিক আবেগ ও মেহনতের সাথে কাজ করেন। তাঁর জিম্মায় ছিল, বিভিন্ন এলাকায় এমন সব আঞ্জুমান ও সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা যা মুসলমানদের মধ্যে দীনী ও জাগতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। বিভিন্ন ধরনের কুপ্রথার মূলোৎপাটন করবে। তাতে মাওলানা মুশতাক আলী সাহেব বিস্ময়কর সফলতা লাভ করেন। অতএব, কানপুর, লাখনৌ, আনোলাহ, বেরেলী, রায়পুর, সাম্বল, মুরাদাবাদ, আমরূহা, নগীনা, নাজীবাবাদ, বিজনূর, শেরকুট, ধামপুর, লেটুর ও অন্যান্য স্থানে এমন বিভিন্ন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাজের গতি

এটি ছিল নদওয়াতুল উলামার উন্নতি ও যৌবনকাল। কাজের গতি ছিল খুব বেশি। মাওলানা মুহাম্মদ আলী রহ. নিজের বিভিন্ন ব্যস্ততা ও অসুস্থতা সত্ত্বেও সব দাফতরিক কার্যক্রম নিজে দেখাশোনা করতেন। তৃতীয় বছরের রিপোর্টের পৃষ্ঠা উল্টালে জানা যায়, সে বছর নদওয়ার দফতরে যে সকল চিঠি এসেছিল তার সংখ্যা ছিল ১০৫৫টি এবং যেসব চিঠি দফতর থেকে পাঠানো হয়েছিল তার সংখ্যা ছিল ৩০৭৬টি। এই সংখ্যা থেকে অনুমান করা যায় যে, দাফতরিক কাজ পুরোপুরি মেহনত, দক্ষতা ও সচেতনতার সাথে আঞ্জাম দেয়া হচ্ছিল। বস্তুত এর মাধ্যমে নদওয়ার সাথে উলামায়ে কেরামের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, নদওয়ার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পরিচিতি ও প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে বড় রকমের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছিল।

হায়দারাবাদের পক্ষ থেকে ভাতা ধার্যকরণ ও মাওলানার অমুখাপেক্ষিতা

সেই যুগে নবাব ওয়াকার নওয়াজ জঙ্গ বাহাদুরের প্রচেষ্টায় 'নদওয়ার জন্য মাসিক ৫০ রুপি এবং মাওলানার জন্যে মাসিক ৫০ রুপি ভাতা ধার্য করা হয়। কিন্তু মাওলানা রহ. প্রয়োজন সত্ত্বেও তা গ্রহণ করতে রাজি হননি। বরং নিজের অংশটুকুও নদওয়ার নামে হস্তান্তর করে দেন।

বেরেলীর সম্মেলন

২৬ শাওয়াল ১৩১৩ হিজরী মুতাবেক ১১ এপ্রিল ১৮৯৬ ঈসায়ী বেরেলীতে তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন শুরু হয়। সেই তিন বছরের সময়কালে নদওয়াতুল উলামা দেশের মেধাবী ও সচেতন শ্রেণিকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। সেসব সুপারিশনামা থেকে এর ধারণা পাওয়া যেতে পারে যা সেই সম্মেলনে পেশ করা হয়েছিল। হিন্দুস্তানের সম্ভবত কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান এমন ছিল না যার পক্ষ থেকে কোনো সুপারিশনামা পেশ করা হয়নি। সে সময় উলামায়ে কেরামের মধ্যে যে নৈরাশ্য ও হতাশার অবস্থা বিরাজ করছিল এই আন্দোলন তাদের মাঝে নতুন সুযোগ ও উদ্যম সৃষ্টি করে।

বেরেলীতে তখন নদওয়াবিরোধী এক বিশেষ শ্রেণি বিদ্যমান ছিল। যদিও বিরোধীদের আওয়াজ তখনও বেশি তীব্র হয়নি, কিন্তু তাদের কিছু কিছু সমালোচনার ধাক্কা নদওয়ার জন্যে বিরূপ হয়ে দেখা দেয়। মেহমানদের অবস্থানের জন্য যখন স্থান তালাশ করা হলো তখন শহরের প্রত্যেক দীনদরদী ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা অকপটে নিজেদের জায়গা পেশ করেন। নিষ্ঠাবান ও

সহযোগী লোকদের পাশাপাশি সিএসআই হিত রাম সাহেবের নামও নজরে আসে যিনি এই নেক কাজের জন্য নিজের নাম পেশ করেছিলেন।

মুফতি লুৎফুল্লাহ সাহেব (যিনি হায়দারাবাদের উচ্চ আদালতের মুফতি নিযুক্ত ছিলেন।) এই সম্মেলনেও সভাপতিত্ব করেন।

সর্বপ্রথম মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী নদওয়ার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও তার কর্মপন্থা সম্পর্কে একটি আবেগদীপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব বিহারী স্বরচিত আরবি কসীদা পেশ করেন। এরপর মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই নাযেম সাহেবের দুর্বলতা ও অসুস্থতার কারণে বিগত বছরের কার্যক্রম ও রিপোর্ট পড়ে শোনান।

মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানীও বয়ান রাখেন এবং বিশেষভাবে নদওয়ার নাযেম সাহেবের শুকরিয়া আদায় করেন। তিনি নিজের সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা না করে নিজ অজীফাও নদওয়ার নামে দিয়ে দেন। এখন পালা মাওলানা শিবলীর। অনেক বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। এজন্য মাওলানা অপারগতা পেশ করেন। কিন্তু আগ্রহীদের আগ্রহে ও জোরাজুরিতে দাঁড়ান এবং একটি সংক্ষিপ্ত ভাবোদ্দীপক বয়ান রাখেন। (সেই বয়ান মাওলানা নিয়মতান্ত্রিকভাবে লিপিবদ্ধ করেননি। তাই রিপোর্টে তার বিস্তারিত বর্ণনা নেই।)

দারুল উলূমের খসড়া পরিকল্পনার অনুমোদন

তিনটার সময় একটি বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে মাওলানার প্রস্তুতকৃত কার্যপ্রণালীবিধি (যার আলোচনা ইতোপূর্বের পৃষ্ঠাগুলোতে বিস্তারিতভাবে এসেছে) পাসের জন্য পেশ করা হয় এবং সব উলামায়ে কেরামের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তা পাস হয়। এ সময় মতভেদের একটি পয়েন্ট এ মর্মে ওঠানো হয় যে, দারুল উলূমকে কেন নদওয়ার অধীনে রাখা হবে? একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেন রাখা হবে না?

মাওলানার বয়ান

মাওলানা সেই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণ দেন এবং বলেন– দারুল উলূম উপকারী ও প্রয়োজনীয় হওয়ার ক্ষেত্রে কারও কোনো কথা নেই। আমাদের দোস্ত মওলভী ইবরাহীম সাহেবও এই বিষয়টি সমর্থন করেন। যদি কথা বলতে হয় তবে এ পরিপ্রেক্ষিতে যে, নদওয়ার পক্ষ থেকে তা প্রতিষ্ঠা করা কল্যাণকর না কি অকল্যাণকর। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, যদি উপকারী ও দরকারি কাজ নদওয়া নিজে না করে তবে এত বড় মর্যাদাপূর্ণ কাজ

কে করতে সক্ষম? ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। আর যদি হয়েও যায়, তবে যে সকল সমস্যার কারণে দারুল উলূমের প্রয়োজন মেনে নেয়া হয়েছে তা থেকে নদওয়াও দায়মুক্ত হতে পারে না। আর যদি তা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে অন্য কোনো দলের প্রয়োজন হয়, তবে এ বিষয়টিও লক্ষ্যণীয় যে, তাও তেমন নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ় হতে হবে, যেমনটি নদওয়া। নতুবা তার মাধ্যমে এত বড় কাজ বাস্তবায়ন হওয়া দুরূহ ব্যাপার। যদি এমনটি হয়ও তবে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের শক্তিকে দ্বিধা বিভক্ত করা কোনোক্রমেই উপকারী হবে না। এ জন্যে নদওয়াতুল উলামার পক্ষ থেকে দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠা সঠিক সিদ্ধান্ত বলেই অনুমিত হয়। নদওয়াতুল উলামা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে থাকবে। পরিশেষে এই বিষয়টি প্রকাশ করাও আবশ্যকীয় মনে করছি যে, দারুল উলূম প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরও নদওয়ার সদস্যরা সেই কর্মকৌশলকে পরিত্যাগ করবে না যা বর্তমানে অব্যাহত রয়েছে এবং যথাসম্ভব দারুল উলূমেও সেই কর্মকৌশলের আলোকে কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

এরপর এই বিষয়ে মতামত নেওয়া হয় এবং মাওলানার মতের অনুকূলে সিদ্ধান্ত আসে।

দ্বিতীয় বৈঠকে হায়দারাবাদ অঞ্চলের বিশিষ্ট কবি আবুল কাশেম আরশী সাহেব তার ফার্সী কবিতা পড়ে শোনান এবং নদওয়ার প্রশংসাস্তুতি করেন।

তিনি বলেন-

زرچہ باشد سر اگر خواہد فدائے کن ☆ ندوہ باشد نائب محبوب رب کردگار

কবিতার শেষ অংশ এই-

یارب ایں تعمیر محکم تا ابد معمور باد

چشم بد از دامن جاہ و جلالش دور باد

আরশী সাহেব যখন নিজের দীর্ঘ কবিতা শেষ করে বসেন তখন মঞ্চে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মগ্নতা আচ্ছন্ন থাকে। অবশেষে মাওলানা শাহ সুলায়মান সাহেব নীরবতা ভাঙ্গেন এবং তার শুকরিয়া আদায় করেন।

দারুল উলূমের খসড়া প্রস্তাব মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী সাহেব পেশ করেন এবং সাধারণ সভা তা অনুমোদন করে। মাওলানা শিবলী সাহেব দারুল উলূমের প্রয়োজনীয়তার ওপর বয়ান রাখেন।

বিশেষ সভা

কার্যপ্রণালী বিধি পাস করার জন্য বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই রহ. এক এক দফা আলাদা আলাদা পড়ে শোনাতেন এবং আলোচনার পর তাতে সংশোধন ও সংযোজনী আনা হতো। কার্যপ্রণালী বিধির একটি বড় অংশ সেই সম্মেলনে পড়ে শোনানো হয়, যা ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও মাদরাসায় পাঠিয়েছিলেন।

বক্তা নিযুক্তকরণ

দ্বিতীয় প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল বক্তা নির্ধারণের বিষয়ে। তার উদ্দেশ্য ছিল নদওয়ার পক্ষ থেকে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন শহরে বক্তা ও ওয়ায়েজ পাঠানো, যারা মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও পারস্পরিক লেনদেন ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে সংশোধনের প্রতি মনোযোগী করবেন। তাদের হালাল-হারাম সম্পর্কে সতর্ক করবেন। ভালো-মন্দ ও দোস্ত-দুশমনের মধ্যে পার্থক্য বুঝাবেন। হালাল উপার্জন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব এবং উপকারিতা ও কল্যাণকর দিকসমূহ সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করবেন। তাদের মধ্যে সেই চেতনা সৃষ্টি করবেন যা তাদেরকে ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক জীবনের বিশুদ্ধ ও সুষম উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে সক্ষম হবে। রসম-রেওয়াজ, স্বগোত্রীয় অনুসরণ ও অনুকরণের মানসিকতা দূর করবে এবং ইসলামের সামগ্রিক শিক্ষা স্বীয় পূর্ণতা, সুস্পষ্টতা ও বাস্তবিক আকৃতি নিয়ে মুসলমানদের সামনে আসবে।

বিরোধিতার ঝড়

নদওয়ার বিরুদ্ধে যেসব সমালোচনা এতদিন পর্যন্ত নিচু স্বরে হচ্ছিল এই সম্মেলনের পরে তা জোরালোভাবে শুরু হয়। বিরোধীদের এক তুফান সামনে উপস্থিত হয়। সম্ভবত সমালোচনাকারী অনুভব করতে পারেননি যে, এই সমালোচনা তাদের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে উপাযোগী হবে না এবং এই কার্যক্রম সামনে বাড়তেই থাকবে।

বিরোধীদের আসল ঘাঁটি ছিল বেরেলী। মাওলানা আহমদ রেযা খান, যিনি নদওয়ার বিরোধী হয়ে গিয়েছিলেন- বেরেলীর সম্মেলনে পূর্বেও তিনি অংশ নেননি। বাইরে থেকে তিনি এবং তার সাথী-সঙ্গীরা নদওয়ার বদনাম করার পুরো

চেষ্টা শুরু করেন। সীমা এতটুকু ছাড়িয়ে গিয়েছিল যে, মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেব সম্পর্কে একথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তিনি নদওয়ার বিরুদ্ধে ফতওয়ায় দস্তখত করেছেন। অথচ বেরেলীর সম্মেলনের সভাপতিত্ব মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেব করেছেন। আর না কেবল সভাপতিত্ব করেছেন বরং সম্মেলনের শেষে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেন যে, যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে তার সবই যথাযথ ও যথার্থ এবং আমি তার সাথে একমত পোষণ করি। বেরেলী সম্মেলনের পূর্বে মাওলানা আহমদ রেযা খান ও মাওলানার মধ্যে পত্র বিনিময় হয়েছিল। কিন্তু কোনো সফলতা আসেনি। মাওলানা এক পত্রে, যা ১১ রমযান ১৩১৩ হিজরীতে লেখা হয়েছিল– মাওলানা আহমদ রেযা খানকে বড় ব্যথা ও আক্ষেপের সাথে লিখেন–

'একটু চিন্তা করে দেখুন আমাদের বাড়াবাড়ি ও গোঁড়ামি আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের এবং বিশেষ করে হানাফী মতাদর্শের কত বড় ক্ষতি সাধন করেছে। হিন্দুস্তানে প্রায় সবাই হানাফী ছিল, গায়রে মুকাল্লিদের চিহ্ন কদাচিতই চোখে পড়ত। শুরুতে এক দুজন বিভ্রান্তির শিকার হয় কিংবা যারা এর কারণ হয়েছে তারা কিছু কিছু মাসআলার ক্ষেত্রে মতভেদ করে। আমাদের কোনো কোনো ব্যক্তি হকের সমর্থনের খাতিরে তাদের লক্ষ্য করে কথা বলেন এবং তাদের প্রতিরোধ করেন। যদিও তাদের নিয়ত ছিল ভালো এবং ইনশাআল্লাহ তার সওয়াবও তারা পাবেন। কিন্তু এতদিনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বোঝা গেছে যে, এই পক্ষপাতিত্ব সুফল বয়ে আনেনি। যদি সেসব কিছু বক্র মতাদর্শী লোককে লক্ষ্যবস্তু বানানো না হতো এবং তাদের বাদ প্রতিবাদের আওয়াজ তোলা না হতো তবে তারা অখ্যাতির অতলে পড়ে থাকত। না তাদের নিজেদেরও সমর্থন তালাশের প্রয়োজন পড়ত, না নিজেদের মতাদর্শ প্রচারের এত বেশি প্রয়োজন দেখা দিত। না আমাদের মুরুব্বিদের এত গাল-মন্দের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে হতো।

বেশি থেকে বেশি এতটুকু হতো যে, তাদের সমমনা আরো দশ-বিশজন হয়ে যেত। হাজারো, লাখো পর্যন্ত পৌঁছত না। এটি ছিল

من ابتلى ببليتين فليختر اهونهما এর ওপর আমল করার ক্ষেত্র। মসজিদ থেকে তাদের বের করে দেয়ার ফতওয়া যখন থেকে প্রচার করা হয় তখন থেকে আমাদের দলের লাঞ্ছনার মুখোমুখি হতে হয়। কাফের বিচারকদের সামনে অপরাধীদের মতো ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আমাদের দীন ও ঈমানের কিতাব তাদের পায়ের ওপর স্তূপ করে রাখা হচ্ছে, আমরা ও আমাদের উলামায়ে কেরাম দাঁড়িয়ে থেকে দেখছি এবং আমাদের বিরোধীদের ডিগ্রি মিলছে। আফসোস! শত

আফসোস! আমাদের পবিত্র ধর্মের ও মাযহাবের এই লাঞ্ছণার ও অপমানের ব্যাপারে আমাদের কোনো দৃষ্টিই নেই। মাওলানা! আল্লাহর ওয়াস্তে চিন্তা করবেন এবং ইসলামের দুশমনদের আমাদের ও আমাদের পবিত্র ধর্মের ব্যাপারে হাসার সুযোগ দিবেন না।'

এই চিঠিতে কোনো ফল হলো না। বরং বিরোধীদের তীব্রতা আরও জোরালো থেকে জোরালো হতে থাকে। নদওয়াতুল উলামার জন্য নদওয়াতুল জাহালা শব্দ প্রয়োগ করা হয়। নদওয়ার সাথে ছন্দ মিলিয়ে বিভিন্ন ধরনের গালি উদ্ভাবন করা হয় এবং এর ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পুস্তিকার নামকরণ করা হয়। পাঞ্জাব, বিহার ও অন্যান্য এলাকার উলামায়ে কেরামের কাছে নদওয়াতুল উলামা সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা করে কিংবা কোনো ফতওয়ার উপর নদওয়াতুল উলামার লেভেল লাগিয়ে নদওয়ার বিরুদ্ধে ফতওয়া নেওয়া হয় এবং সেসবের খুব প্রচার করা হয়। নদওয়ার কোনো কোনো আলেমকে কাফেরও ফতওয়া দেয়া হয়। এই লড়াইয়ে মাওলানা আহমদ রেযা খান ছাড়াও মাওলানা আব্দুল কাদের বাদায়ুনী, মাওলানা নজীর আহমদ খান রামপুরী সবার সামনে সামনে ছিলেন।

প্রশ্নের ভিত্তি

যে সব বিষয়ের ওপর সবচেয়ে বেশি আপত্তি করা হয়েছে তা দেখলে বোঝা যায়, সেসব বিরুদ্ধবাদীর চিন্তার স্তর কত অগভীর ছিল। আর তাদের চিন্তার ধরণ কত বিস্ময় উদ্রেককারী ও হাস্যকর ছিল।

লাখনৌতে অনুষ্ঠিত নদওয়ার দ্বিতীয় সম্মেলনে মুসলমানদের ঐক্য ও সংঘবদ্ধতার উপকারিতা এবং পারস্পরিক বিবাদের অনিষ্ঠতা উল্লেখ করতে গিয়ে মাওলানা মুহাম্মদ আলী রহ. মাওলানা কাসেম নানুতুবীর বরাতে বলেন–

'মুসলমানদের সকল গুনাহ মাফ হতে পারে। কিন্তু অনৈক্য ও পারস্পরিক শত্রুতার গুনাহ মাফ হবে না। মাওলানা আব্দুল কাদের বাদায়ুনী–

يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ. 'যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন।' এই আয়াত লিখে মাওলানার কথার সমালোচনা করে বলেন, মাওলানা এ কথা কিভাবে মেনে নিলেন যে, অনৈক্যের গুনাহ মাফ হবে না?

দ্বিতীয় যে বিষয় নদওয়ার লাখনৌ সম্মেলনে বলা হয়েছিল তা হলো, মুকাল্লিদ ও গায়রে মুকাল্লিদের এই পারস্পরিক সংঘাতের পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত। মূলত উভয়ের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। উদ্দেশ্য সবারই এক। এ কথার ফলে এই দলের লোকেরা অনেক আশান্বিত হয়। তাই তাদের অধিকাংশ পুস্তিকা ও লেখায়

নদওয়ার লাখনৌ সম্মেলন এবং সেসব বয়ান ও প্রস্তাবনার উদ্ধৃতি বারবার পাওয়া যায়।

তাদের মতে, ততক্ষণ এই দুই দলের মধ্যে ঐক্য হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিশেষ মতাদর্শ ও উসূল থেকে হাত গুটিয়ে নেবে এবং নিজেদের কেফহী মাযহাব ও মতাদর্শ বর্জন করবে।

মাওলানা আহমদ রেযা খান তার এক চিঠিতে যেসব আপত্তি তুলেছেন কিংবা যেসব অপবাদ আরোপ করেছেন তার মাধ্যমে সেসব লোকের চিন্তাধারা ও গোঁড়ামীর ধারণা সহজে পাওয়া যায়। মাওলানা মুহাম্মদ আলী রহ.কে এক চিঠিতে লেখেন–

'আপনি নদওয়ার সব কিতাব বিস্তারিতভাবে সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্য করুন। আপনার নিজেরই দেখা হয়ে যাবে যে, আহলে সুন্নাতের সাথে কী পরিমাণ কঠিন বিরোধিতা করা হয়েছে। ধর্ম বর্জন ও বস্তুবাদী মতাদর্শ গ্রহণ করার জন্যে খোলাখুলিভাবে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। সুন্নাতি মাযহাব ও আহলে সুন্নাতের ইসলামের পরিষ্কারভাবে অপমান করা হয়েছে।

বিরোধীদের অপকৌশল অবলম্বন

এ ক্ষেত্রে বড় একটি অপকৌশল অবলম্বন করা হয়েছে যে, হারামাইনের উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে ধর্মবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে যাদেরকে সে যুগে প্রকৃতিবাদী বলা হতো এবং গায়রে মুকাল্লিদের বিরুদ্ধে ফতওয়া আনা হয় এবং তাকে ভারতবর্ষে এমনভাবে প্রচার করা হতে থাকে যেন তা নদওয়া ও আহলে নদওয়ার বিরুদ্ধে। এ ধরনের ১৫টি ফতওয়া

رفاه الكونين باتباع اهالى الحرمين নামক একটি পুস্তিকায় বিদ্যমান রয়েছে।

পুস্তিকা প্রচারের অপকৌশল

এই বিরোধিতা কত জোরে শোরে হচ্ছিল তার ধারণা কেবল এ থেকে হতে পারে যে, পোস্টার, ইস্তেহার, বিদ্রুপাত্মক কবিতা, ফতওয়া ইত্যাদি ছাড়াও কেবল সেসব চিঠি ও পুস্তিকা নদওয়ার বিরুদ্ধে এই দল থেকে প্রচার করা হয় তার সংখ্যা ছিল চল্লিশেরও অধিক। এসব তো মাওলানা আহমদ রেযা খান ছাড়া অন্যদের পুস্তিকার বর্ণনার। স্বয়ং মাওলানা আহমদ রেযা খান নদওয়ার বিরুদ্ধে যেসব পুস্তিকা লিখেছেন এর মোট সংখ্যা প্রায় ২০০। বিরোধিতার তীব্রতার ধারণা এ থেকেও পাওয়া যায় যে, ৭০ হাজার রুপির একটি ফান্ড কেবল নদওয়ার বিরোধিদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল।

এই অশুভ ঝড়ের বিরুদ্ধে নীরবতা অবলম্বন করাকেই নদওয়া সমীচীন মনে করে। কোনো কোনো সময় এই নীরবতাকে দুর্বলতা মনে করে বিরোধীদের আচরণ তীব্রতর হয়। আবার কোনো কোনো সময় তার শুভ প্রভাব পড়তে দেখা যায়। ১৩১৪ হিজরীর রজব মাসে মাওলানা মুহাম্মদ হাফিজুল্লাহ সাহেব 'ইরশাদুল কামালা' লেখেন। তাতে তাফসীর ও হাদীস, ফেকাহ ও তাসাওউফ এবং সীরাত ও ইতিহাসের আলোকে সেসব সংশয় ও আপত্তির উত্তর দেয়া হয় যেসবের আড়াল নিয়ে নদওয়া বিরোধীরা এই আন্দোলনকে শেষ করে দিতে চেষ্টা করছিল। এই পুস্তিকা সভ্য শ্রেণিকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু বাতাস ও গোঁড়ামির আগুন যথারীতি বাড়তে থাকে।

ইতোপূর্বে রবিউস সানী ১৩১৪ হিজরীতে মির্জা হায়রত দেহলভী যিনি 'সীরাতে মুহাম্মাদিয়া ওয়া হায়াতে তায়্যিবা ওয়া হায়াতে আযম'–এর লেখক– তিনি 'মাকাসেদে নদওয়াতুল উলামা আওর উসকি মুখালেফাত' শিরোনামে ৩১ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা লেখেন এবং তাতে অনেক জোরালোভাবে এবং আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে নদওয়ার পূর্ণ ওকালত করেন। ইতিহাস, বর্তমান অবস্থা ও সময়ের চাহিদার আলোকে নদওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজন স্পষ্ট করেন এবং মুসলমানদেরকে এই দলাদলির প্রতি ভর্ৎসনা করেন। এক জায়গায় তিনি লেখেন–

'দীনী ইলম থেকে মানুষ উদাসীন হয়ে গেছে। মসজিদ ও খানকাগুলো বিরান পড়ে আছে। চতুর্দিক থেকে আর্য ও ঈসায়ীদের ধূম্রজাল সৃষ্টিকারী প্রশ্নের বান আসছে। কিন্তু কোনো খবরই নেই। খবর থাকবে কিভাবে? ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে তাদের সময় মিললেই অন্যান্য ধর্মের মোকাবেলা করতে তারা উদ্বুদ্ধ হবে। যদি মুসলমান আলেমদের সকল রচনা একত্রিত করা হয় তবে শতকরা পাঁচ কিংবা কিছু বেশি কিচ্ছা-কাহিনী সম্পর্কে বের হবে।' পঁচানব্বই ভাগ মুসলমানদের তারদীদ ও 'তাকফীর' সম্পর্কে বের হবে।'

মাওলানা সাইয়িদ আহমদ আল-হাসানী রায়বেরেলীও 'ইতমামুল হুজ্জাহ' নামে নদওয়া বিরোধীদের জবাবে একটি রিসালা লেখেন এবং অনেক চমৎকার ও সরলভাবে সেসব প্রশ্নের জবাব দেন।

মাওলানার কর্মকৌশল

এক্ষেত্রে মাওলানার কর্মকৌশল এই ছিল যে, সমুচিত নিরবতা আবশ্যক। তবে তা যথেষ্ট সমাধান নয়। মুসলমানদের মধ্যে তা থেকে ভুল ধারণা ছড়াতে পারে। অনেক সরলমনা ও নিষ্কলুষ অন্তরাত্মার অধিকারী মুসলমান তাদের ভ্রান্ত

প্রোপাগাণ্ডার শিকার হতে পারে। এজন্য আবশ্যক হলো তাদের জবাব মার্জিতভাবে সহনশীলতা ও সচেতনতার সাথে দেয়া। মাওলানার তাগাদা ও নির্দেশেই 'ইরশাদুল কামালা' লেখা হয়। মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাইকে তিনিই এই ব্যাপারে বারবার মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং তাকে সে সকল প্রয়োজনীয় ও সমীচীন কর্মকৌশল অবলম্বন করার নির্দেশনা দেন যা এই ক্ষেত্রে উপকারী বিবেচিত হতে পারে।

যাই হোক, এই অসার বিরোধিতার ঝড় সত্ত্বেও এই নব প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটি উন্নতি ও অগ্রগতির সাথে অবিচল থাকে। উলামায়ে হক ও মাশায়েখ সর্বদাই এই সংস্থাকে সমর্থন জোগাতে থাকেন। আধুনিক শ্রেণির তাতে চিন্তা ও ভাবনার এক নতুন রশ্মি গোচরে আসে। বুযুর্গানে দীন ও আহলে দিলগণ একে গায়েবী মদদ ও খোদায়ী সাহায্য হিসেবে মেনে নেন। মোটকথা, যেসব শ্রেণি নিষ্ঠা ও সুবিবেচনার কিছুটা হলেও অধিকারী ছিলেন তারা এটিকে নিজেদের অন্তরের প্রতিধ্বনি ও হৃদয়ের আওয়াজ হিসেবে মনে করতেন।

যখন এই ঝড় প্রবলতার দিকে ছিল সে সময় মাওলানা জহুরুল ইসলাম ফতেহপুরী যার উল্লেখ কিতাবে বারবার এসেছে হজ্ব ও জিয়ারতের উদ্দেশ্যে হিজাজে ছিলেন। তিনি হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ.-এর কাছ থেকে একটি লেখা সংগ্রহ করেন। তাতে হাজী সাহেব রহ. নদওয়া সম্পর্কে অনেক সমুচ্চ বাণী ও নির্দেশনা প্রদান করেন।

নদওয়াতুল উলামা মুসলমানদের জন্য অদৃশ্যের দান হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ.-এর অভিমত

এই চিঠিতে হাজী সাহেব রহ. লেখেন, 'মুসলমানদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় যে তিন বছর থেকে এ ধরনের সম্মেলন ও সংস্থা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার তিনটি সম্মেলন কানপুর, লাখনৌ ও বেরেলীতে শান-শওকতের সাথে হয়েছে। তা ছাড়া হাজার হাজার মুসলমান ও শত শত উলামা-মাশায়েখ দূর-দূরান্ত থেকে এসে সেখানে শরিক হয়েছেন। এটি মূলতঃ গায়েবী সাহায্য। বিশ্ব প্রভু-

إِذَا أَرَادَ اللهُ شَيْئًا هَيَّأَ أَسْبَابَهُ.

এর মর্ম অনুসারে নদওয়াতুল উলামার সম্মেলনকে মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য শেষ যুগে অদৃশ্যের দান হিসেবে প্রকাশ করেছেন। নদওয়াতুল উলামাকে মুসলমানদের পরিপ্রেক্ষিতে অদৃশ্যের সাহায্য মনে করা উচিত এবং

মুসলমানদের কর্তব্য হলো তাতে দান-দক্ষিণা, কথাবার্তা ও সহযোগিতার মাধ্যমে নিষ্ঠার সাথে অংশগ্রহণ করা।

মাওলানা মুনাওয়ার আলী যিনি হাজী সাহেবের খলিফা, বেরেলীর জলসায় শরিক ছিলেন। তিনি জলসার পুরো বৃত্তান্ত ও নিজের অভিব্যক্তি পাঁচ পৃষ্ঠায় লিখে হাজী সাহেব রহ.-এর খেদমতে পেশ করেন। তার জবাবে হাজী সাহেব রহ. তাকে লেখেন–

'নদওয়ার অবস্থা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যতটুকু অধমের নজরে এসেছে তা নিঃসন্দেহে বড়ই উপকারী এবং মুসলমানদের জন্য উভয় জাহানের সফলতা ও কামিয়াবীর মাধ্যম হতে পারে। অধমের সর্বদা এই প্রার্থনা যে, যে বিষয়ে মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট তাতে আল্লাহ তাআলা গায়েবী সাফল্য দান করুন এবং তাকে হিংসুকদের কিংবা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অনিষ্টতা থেকে সর্বদা নিরাপদ রাখুন।

মাওলানার দিল্লি সফর এবং 'মুঈনুন্ নদওয়া' সংস্থা প্রতিষ্ঠা

এই সময়ে মাওলানা মুহাম্মদ আলী রহ. নদওয়ার শাখা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে দিল্লি আসেন এবং দিল্লির প্রধান হাকীম গোলাম রেযা খান সাহেবের মেহমান হন। হাকীম সাহেবের কুঠিতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আর তাতে 'মুঈনে নদওয়াতুল উলামা' নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। হাকীম সাহেবকে আঞ্জুমানের সভাপতিত্ব করা হয় এবং তা তত্ত্বাববধান করার ভার খান সাহেবের কাঁধে সোপর্দ করা হয়। শহরের নেতৃবর্গ আঞ্জুমানে শরিক হন এবং খুব আন্তরিকতার সাথে তাতে অংশগ্রহণ করেন।

মাওলানার গাজীপুর সফর এবং নদওয়াতুল উলামার শাখা প্রতিষ্ঠা

২০ রজব ১৩১৩ হিজরী সালে মাওলানা মুহাম্মদ আলী রহ. একটি প্রতিনিধি দলের সাথে পূর্বের দিকে রওয়ানা হন। সেই প্রতিনিধি দলে নাজেমের সহযোগী মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই, মাওলানা জহুরুল ইসলাম ফতেহপুরী, মাওলানা শাহ সুলায়মান সাহেব ফলওয়াররী প্রমুখ শরিক ছিলেন। সেই প্রতিনিধি দলের যে প্রভাব পড়ে, যে উষ্ণতা, আন্তরিকতা ও মহব্বতের সাথে তাকে স্বাগত জানানো হয়, সৌভাগ্যের বিষয় হলো তার কিছু বৃত্তান্ত ইতিহাস সংরক্ষণ করেছে।

'গাজীপুরের নেতৃবৃন্দ যে আন্তরিকতা ও সম্মানের সাথে প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানিয়েছে এবং মাওলানা শাহ আমানাতুল্লাহ গাজীপুরী যে নিষ্ঠা ও মহব্বতের

আচরণ করেন তার বর্ণনা দেয়া এক ধরনের বাগাড়ম্বরতা। তবে আপনি তা থেকে অনুমান করতে পারবেন। গাজীপুর হলো একটি নদী তীরের জনপদ তার স্টেশন নদীর অন্য পারে। স্টেশনে মাওলানা আবুল বারাকাত সাহেবের নেতৃত্বে একদল নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানানোর জন্যে। দরিয়ার অপর প্রান্তে মাওলানা আমানাতুল্লাহ সাহেব নিজে এক হাজার মুসলমানকে সাথে নিয়ে সংবর্ধনা দেয়ার জন্যে এসেছিলেন। যখন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা নৌযান থেকে নামে তখন তাদেরকে একটি শামিয়ানার নিচে নিয়ে বসানো হয়। এই শামিয়ানা নেহায়েত প্রশস্ত ও শানদার ছিল এবং কাঁচ দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছিল। আলোর আধিক্যের কারণে রাতকে দিন মনে হচ্ছিল। নিচে আরামদায়ক কার্পেট বিছানো ছিল। তার উপর চেয়ার পাতা ছিল। সেখানে পৌঁছলে মাওলানা শাহ আমানাতুল্লাহ সাহেব গাজীপুরের নেতৃবৃন্দের পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর বিশ্রাম কক্ষ খুলে দেয়া হয়। সেখান থেকে বিশ্রাম কক্ষ পর্যন্ত দুই সারি সোজাসুজি বাতির সজ্জা ছিল এবং বাতিগুলো ছিল কাঁচে আচ্ছাদিত। এখান থেকে সেখান পর্যন্ত পুরো এলাকা মুসলমানদের ভিড়ের কারণে এবং তাদের ইসলামী ভাবাবেগের ফলে এই সংবর্ধনা পর্ব বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠেছিল। এর মাধ্যমে মুসলমানদের এখলাছ, তাদের সত্যিকারের ভালোবাসা– যা ছিল কেবল ধর্মীয় ও জাতীয় ঐক্যের উদ্দেশ্যে–আন্দায করা যেতে পারে।'

দ্বিতীয় দিন ভোরবেলা জলসা হয়। সকলের সম্মতিক্রমে গাজীপুরে নদওয়ার শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাওলানা শাহ আমানাতুল্লাহকে তার সভাপতি মনোনীত করা হয়।

পরোপকারের ঈর্ষণীয় দৃষ্টান্ত

এই সফরে একটি বিশেষ ব্যাপার ঘটে। মাওলানা শরফুদ্দিন সাহেব, যিনি গাজীপুরের উকীল, নিজের একটি কুঠি যা তিনি বসবাসের জন্য তৈরি করেছিলেন নদওয়াকে সোপর্দ করে দেন। বস্তুত তিনি যে প্রক্রিয়ায় তা দান করেন তা তাঁর নেহায়েত নিষ্ঠা, ভালোবাসা, আস্থা ও আন্তরিকতার প্রমাণ বহন করে। মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ. ও মাওলানা শাহ সুলায়মান সাহেবকে নিজের কুঠিতে নিয়ে যান। পৃথকভাবে দাঁড়িয়ে অনেক আদরের সাথে অশ্রুসজল চোখে বলেন–

'আমি কোনো কিছুরই উপযুক্ত নই। এই কুঠি যা আমি নিজের বসবাসের জন্য নির্মাণ করেছিলাম তা নদওয়াতুল উলামাকে দিয়ে দিলাম। আমি এটি বুঝিয়ে দেয়ার জন্য আপনাদের নিয়ে এসেছি।' মোটকথা, কুঠি নদওয়াতুল উলামার

দখলে এসে যায়। আর আল্লাহর সেই বান্দা ভাড়া করা বাড়িতেই খুশি মনে থাকাকে বরণ করে নেন।

পুরনো ও নতুনের প্রথম প্রতিনিধিত্বশীল সম্মেলন

এরপর প্রতিনিধি দল পাটনা রওয়ানা হয়। সেবার সফরে মাওলানা শিবলীও শামিল ছিলেন। পাটনায় একাধিক সম্মেলন হয়। তবে দু'টি সম্মেলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শাহ রশীদুল হক সাহেবের খানকায়ে ইমাদিয়ায়। দ্বিতীয়টি বাঙ্কীপুরের সরকারি কলেজে। বাঙ্কীপুরের সম্মেলনে চার হাজার মুসলমান শরিক ছিলেন। এটি নতুন ও পুরাতনের প্রথম প্রতিনিধিত্বশীল সম্মেলন ছিল। সেখানে উভয় শ্রেণি খোলাখুলিভাবে কথা বলার ও একে অন্যের দৃষ্টিকোণ অনুধাবন করার সুযোগ লাভ করে। উভয় শ্রেণির মধ্যে বিভেদের যে দেয়াল খাড়া হয়েছিল, যা তাদেরকে একই ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও চিন্তা ও ভাবনাগতভাবে একে অপরকে অনেক দূরে ঠেলে দেয় এবং পরস্পরকে বিদ্বেষী ও শত্রুভাবাপন্ন করে তোলে এই সম্মেলনের ফলে তা কমে আসে। আর যখন তারা উভয়ে বুঝতে পারল যে, তাদের আবেগ অনুভূতি, উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা অভিন্ন তখন তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। এটি তাদের জন্য নতুন এক জ্ঞান অর্জন ও রহস্য উন্মোচনের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। মাওলানা শিবলী রহ. দারুল উলূমের প্রয়োজনীয়তার ওপর একটি চিত্তাকর্ষক, কার্যকরী ও স্থানোপযোগী বয়ান রাখেন। সেই বয়ানে তাদের সামনে একটি নতুন পৃথিবীর চিত্র ফুটে ওঠে যাতে নতুন পুরাতনের কোনো ভেদাভেদ অবশিষ্ট থাকেনি। আর না উলামায়ে কেরাম ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে কোনো ধরনের বিদ্বেষ বাকি থাকে। মাওলানা হাবীবুর রহমান শেরওয়ানীর কলম সেই দৃশ্যের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছে।

রাত ছিল শীতের। প্রথম থেকেই উলামায়ে কেরাম শোভাবর্ধন করেছিলেন। যখন কালো মেঘের কারণে চতুর্দিকে অন্ধকার গিয়েছিল– যেহেতু আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে প্রথম বার এই সুযোগ তৈরি হয়েছিল, কোনো ধরনের পেরেশান না হয়েই আলোচনার আলো খুব দ্রুত প্রকৃত অবস্থার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে মেঘের ঘনঘটাকে দূর করে দেয়।

که آب چشمۂ حیواں درون تاریکی است

'ওই অন্ধকারে লুকিয়ে আছে আবে হায়াতের ঝরনা।'

এই জলসা পুরনো ও নতুনের দুই ধারাকে এমনভাবে মিলিত হতে দেখে যেমনিভাবে গঙ্গা ও সিওনের মিলনস্থলে এই শহর অবস্থিত।'

নবাব সরফরাজ হুসাইন খান মাওলানা মুহাম্মদ আলী রহ.-এর কাছে আবেদন করেন, এ বছর সম্মেলন পাটনায় করা হোক। কিন্তু যেহেতু মিরাঠে সম্মেলনের ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই ধার্য করা হয়েছিল তাই তা পরবর্তী বছরের জন্য মুলতবি রাখা হয়।

এরপর বিহারের নেতৃবৃন্দের ফরমায়েশ অনুসারে মাওলানা একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে বিহার গমন করেন। তাতে মাওলানা শিবলী শরিক ছিলেন না। খান বাহাদুর মৌলভী সাইয়িদ নাছির উদ্দীন সাহেব ও খান বাহাদুর মৌলভী সাইয়িদ আমীরুদ্দীন খান সাহেবের সেখানে প্রতিনিধি দল অবস্থান করে এবং সেখানেই জলসা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মাওলানা শাহ সুলায়মান অনেক কার্যকরী বক্তৃতা দেন এবং সমাবেশে তার বয়ানের অনেক ভালো প্রভাব পড়ে।

সে বছর দেশের অধিকাংশ অংশে নদওয়ার শাখা ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ণাল, লাহুর, রেওয়াড়ী, পাটনা, বাঙ্কীপুর ইত্যাদি স্থানে 'মুঈনুন্ নদওয়া' নামে সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

অন্যান্য দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য ছাত্রদের ভাতা

এসব প্রাথমিক অবস্থায় যখন নদওয়ার সামনে বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা পেশ হয়েছিল এবং বিরোধীদের ঝড়ের ভেতর দিয়ে পথ চলতে হচ্ছিল– নদওয়ার কর্তৃপক্ষের দৃঢ় মনোবল ও উৎসাহের মধ্যে কোনো ধরনের দুর্বলতা দেখা যায়নি। ১২ শাওয়াল ১৩১৩ হিজরীতে ব্যবস্থাপনা পরিষদের বৈঠকে প্রস্তাব পেশ করা হয় যে, অন্যান্য দেশে ইসলামের প্রসারের জন্যে বাছাইকৃত ইংরেজি জানা ছাত্রদেরকে উপযুক্ত ভাতা দিয়ে আরবি পড়ানো হবে এবং ইসলামের বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন শিখানো হবে। এরপর তাদেরকে নদওয়া অন্যান্য দেশে ইসলাম ও তাবলীগের জন্য প্রেরণ করবে। তবে প্রস্তাব আসে বিষয়টি সিদ্ধান্ত করার পূর্বে সাধারণ পরিষদের অনুমোদন নেয়ার।

মাওলানা শিবলী রহ. প্রস্তাব করেন, একজন ফারেগ ছাত্রকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য মিসর পাঠানো হোক। এই প্রস্তাবও সাধারণ সভার অনুমোদনের জন্যে মুলতবি রাখা হয়।

মিরাঠ সম্মেলন

১৫ শাওয়াল ১৩১৪ হিজরী মোতাবেক ১৯ মার্চ ১৮৯৭ ঈসায়ী নদওয়ার চতুর্থ সম্মেলন মিরাঠে অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেব সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ.-এর অসুস্থতা ও দুর্বলতার কারণে মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই রহ. রিপোর্ট পড়ে শোনান। এরপর হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী রিপোর্টের ওপর আলোচনা করেন।

উলামায়ে কেরামের বৈঠক

দ্বিতীয় বৈঠকটি উলামায়ে কেরামের জন্য নির্ধারিত ছিল। হিন্দুস্তানের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা তাতে শরিক হন। মাওলানা মুহাম্মদ আলী রহ. নেসাবে তালীমের ওপর আলোচনা রাখেন। এই সিদ্ধান্ত স্থির হয় যে, তখন পর্যন্ত যত নেসাব ও যত মতামত এসেছিল তা প্রকাশ করা হবে। মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই রহ. প্রস্তাব পেশ করেন। প্রথম প্রস্তাব ছিল, দারুল উলূম প্রতিষ্ঠা করা হবে দিল্লিতে। যদি সেখানে না হয় তবে তা হবে লাহোরে। মাওলানা মুহাম্মদ আলী রহ. ও মাওলানা আব্দুল হাই রহ. এই প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু মাওলানা শাহ্ সুলায়মান রহ. তাতে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন– দিল্লি সর্বদা ফেতনা-ফাসাদের কেন্দ্রবিন্দু। এমন স্থানে দারুল উলূম প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন হবে না। তবে তখন সংখ্যাধিক্যের মতামতের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, দারুল উলূম দিল্লিতেই প্রতিষ্ঠা করা হবে। দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল সাধারণ সভায় উলামায়ে কেরামের জন্য বিনা প্রয়োজনে চেয়ারের ব্যবস্থা না করা। বিছানার উপর বৈঠক হতে পারে এবং তা-ই উত্তম হবে।

বসার পদ্ধতি সম্পর্কে মাওলানা রহ.-এর গুরুত্বপূর্ণ মতামত

মাওলানা রহ. বৈঠকের এই পদ্ধতির কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'এতদিন সাধারণ সভায় ব্যাপকভাবে সবার জন্যে নদওয়া চেয়ারের ব্যবস্থা করে আসছে। তার কারণ হলো– সাধারণ সভা থেকে আমাদের উদ্দেশ্য, সেসব লোকও যেন আমাদের থেকে ফায়দা নিতে পারে যারা মসজিদে গিয়ে আমাদের ওয়াজ নসীহত শোনে না। বস্তুত তারা চেয়ারে বসতে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এমনকি তাদের নিত্যদিনের ওঠা-বসাও তাতেই হয়ে থাকে। যদি তাদের জন্য এই ব্যবস্থা করা না হয় তবে কষ্টের কারণে তারা সভায় শরিক হওয়া ও তা থেকে ফায়েদা নেয়ার জন্যে আসা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থেকে যাবে। আর যেহেতু এ উদ্দেশ্যেই তাদের জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তখন এ

বিষয়টিকেই নেহায়েতই অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা হয়েছে যে, তারা চেয়ারে বসবে আর উলামায়ে কেরাম নিচে বিছানায় বসবেন। এ জন্যে এই ব্যবস্থার অনুমোদন রাখা হয়েছে। যদি এই উদ্দেশ্য না থাকত তবে উলামায়ে কেরামের জন্য এ সকল কৃত্রিমতার কোনো প্রয়োজনই ছিল না।

তৃতীয় যে প্রস্তাব মঞ্জুর হয় তা হলো, যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরোধী হবে সে নদওয়ার সদস্য হতে পারবে না। অবশ্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারবে। কারণ, অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা অসমীচীন এবং নদওয়ার উদ্দেশ্যের পরিপন্থি। বিগত পরিচালনা পরিষদের সভায় এ প্রস্তাব হয়েছিল যে, ইংরেজি জানা ছাত্রদেরকে আরবি পড়ানো হবে। যাতে তারা অন্যান্য দেশে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার উপযুক্ত হতে পারে। সাধারণ সভা এই প্রস্তাবকে মঞ্জুর করে।

এরপর মাওলানা শিবলী রহ. নদওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এক চিত্তাকর্ষক ও পূর্ণ প্রভাব বিস্তারকারী বয়ান রাখেন, যা দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি পুরো সময় জুড়ে বিমোহিত ও উৎফুল্ল ছিল। মাওলানা আব্দুল জব্বার জবলপুরী আরবিতে একটি কবিতা পড়েন ও নদওয়ার নিম্নোক্ত প্রশংসাস্তুতি পেশ করেন।

اهلًا وَ سَهلًا ندوة العلماء + قد كنت اية رحمة الرحمن

امتد ظلك فى الضواحى كلها + حتى تشيب مفارق الغربان

এই সম্মেলনে মাওলানা শেরওয়ানী তার প্রসিদ্ধ কিতাব 'উলামায়ে সলফ'-এর কিছু কিছু পড়ে শোনান।

আরশী রহ. এবারও একটি আবেগদীপ্ত কসীদা পড়ে শোনান। তাঁর আন্তরিকতা এবং প্রত্যেক সম্মেলনে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ এমন রূপ নিয়েছিল যে, তাকে যথার্থ অর্থে 'শায়েরে নদওয়া' বলা যেতে পারে।

এই সম্মেলনের কার্যবিবরণীতে মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ.-এর নাম 'পৃষ্ঠপোষক' হিসেবে গোচরে আসে। এরপর সংস্থার সভাপতি, সদস্য ও দায়িত্বশীলদের নাম রয়েছে।

দুর্ভিক্ষের প্রভাব ও নদওয়ার সমস্যাসমূহ

১৮৯৫ সালের দুর্ভিক্ষ যা হাজার হাজার ঘর বিরান ও বাতিহীন করে দিয়েছিল, তা শেষও হতে পারেনি প্লেগ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং মুম্বাই থেকে অগ্রসর

হয়ে পাঞ্জাবের পাঁজরে আঘাত হানা শুরু করে। সরকার স্থানে স্থানে আক্রান্তদের জন্যে আশ্রয় শিবির গড়ে তোলে। যার ফলে সফরে অসুবিধা বেড়ে যায় এবং মানুষ সফরকে ভয় করতে শুরু করে। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসও এই সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাদের অধিবেশনে অনেক প্রচেষ্টা ও ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও যে ডেলিগেট আসে তার সংখ্যা অনেক কম ছিল। এসব পরিস্থিতির আলোকে আশংকা ছিল নদওয়ার সম্মেলন সম্ভবত বড় পরিসরে সফলকাম হবে না। অতএব, অনেক চিন্তাভাবনার পর এই সিদ্ধান্ত স্থির করা হয় যে, কেবল সদস্যদেরই সম্মেলনে আহ্বান করা হবে।

কানপুরের বিশেষ সম্মেলন

১৪/১৫ শাওয়াল ১৩১৫ হিজরী নদওয়াতুল উলামার সদস্যদের এই জলসা নদওয়াতুল উলামার দফতরে (যা একটি সুপরিসর ও আলিশান প্রাসাদে অবস্থিত ছিল) দুদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। অপ্রত্যাশিতভাবে অধিকাংশ সদস্য অনেক গুরুত্বের সাথে এই সম্মেলনে শরিক হন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ. প্রস্তাব করেন, নেজামে হায়দারাবাদের উস্তাদ ও মাওলানা মসীহুজ্জামান খান এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করবেন। খান বাহাদুর মুনশী আতহাব আলী খান সাহেবের সমর্থনে মাওলানা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই মাওলানার পক্ষ থেকে রিপোর্ট পেশ করেন। যার অধিকাংশ জুড়ে ছিল সমালোচনাকারী ও বিরুদ্ধবাদীদের জবাব। মাওলানা তাতে অনেক বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করেন যে, পারস্পরিক বিবাদের নিরসন, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব, আধুনিক শ্রেণি আরবির দিকে মনোযোগ, উলামায়ে কেরামের মধ্যে সচেতনতা ও অনুভূতির যে দৃশ্য এ সময় নজরে আসছে তা এই নদওয়াতুল উলামারই ফল, যা এসব উদ্দেশ্যের পতাকাবাহী এবং সব ধরনের বিরোধীতা সত্ত্বেও তার জন্যে ইস্পাত কঠিন অবিচল।

দারুল ইফতার কার্যক্রম

দারুল ইফতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে মাওলানা বলেন, এই বছর ৫৬৫টি ইস্তেফতার জবাব দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে ৪৭টি ফতওয়া নেহায়েত মুশকিল ও জটিল প্রকৃতির। এ ছাড়াও ২৩৫টি মাসআলা সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে তাহকীক করা হয়েছে।

কানপুরের ইয়াতিম খানা

কানপুরের ইয়াতিমখানা যা নদওয়াতুল উলামার তত্ত্বাবধানে চলে আসছিল তাতে সে সময় ৪৩ জন শিশু ছিল। তন্মধ্যে ২৫ জন ছেলে এবং ১৮ জন মেয়ে। তাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য প্রশিক্ষক ও মুদাররিস নিযুক্ত ছিল। তাদের পেশা ও বৃত্তিমূলক শিল্প শেখানোরও ব্যবস্থা করা হয়। কোনো কোনো শিশুকে চামড়ার কাজ এবং কিছুকে প্রেসের কাজ শেখানো হয়।

এক হাজার নিয়মতান্ত্রিক সদস্য

সেই বছর সদস্য সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পায় ফলে সে বছর সদস্য সংখ্যা ১০১৫ জন পৌঁছে।

দারুল উলূমের জন্য লাখনৌর প্রস্তাব

মাওলানার রিপোর্টের পর মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী প্রস্তাব রাখেন– দারুল উলূম লাখনৌতেই প্রতিষ্ঠা করা হোক। মাওলানা গোলাম মুহাম্মাদ হুশিয়ারপুরী তাতে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে মাওলানা আব্দুল হাই রহ. যিনি পূর্বে তার সমর্থনে ছিলেন অন্য মত দেন। মাওলানা বলেন– এ সময় একটি প্রস্তাবের রদ-বদল করা সহজ, পরবর্তীতে এই অপ্রয়োজনীয় শর্তের অশুভ পরিণামকে মেনে নেয়া মুশকিল হবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী রহ. সাহেব যিনি নদওয়ার নাযেম যার চেয়ে এ ব্যাপারে কারো চিন্তা অধিক হতে পারে না তিনি যেখানে থেকে এই কাজকে করতে সক্ষম সেখানেই এই দারুল উলূম কায়েম করা হোক। কেননা, অন্তমিল হওয়াকেই যথেষ্ট জ্ঞান করা হয়। অতঃপর একটি প্রস্তাব আসে, তা এক মাসের জন্য মূলতবী রাখা হোক।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ.-এর অভিমত

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ. যিনি পূর্বে নদওয়াকে দিল্লিতে স্থাপনের পক্ষে ছিলেন, এখন তাতে সুর কিছুর নরম হয়ে যায়। তিনি দিল্লির জন্য কোনো জোর দেননি; বরং বলেন, আমার মত হলো, এখন কোনো একটি স্থান নির্বাচন করা হোক– চাই তা দিল্লি হোক কিংবা লাখনৌ, যাতে অপেক্ষায় না থেকে এখন থেকেই তার বাস্তব কার্যক্রম শুরু করা যায়।

অবশেষে অধিকাংশ মত এই পক্ষে আসে যে, এই সৌভাগ্য লাখনৌর বরাদ্দে আসুক এবং কেন্দ্রের মর্যাদা লাখনৌকেই দেয়া হোক। আঞ্জুমানের সভাপতি মাওলানা মসীহুজ্জামান সাহেব বলেন, তাতেই আল্লাহ তাআলার কিছু কল্যাণ

মঞ্জুর রয়েছে। এখন নদওয়ার সদস্যদের নেহায়েত মেহনত ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই কাজকে শুরু করে দিতে হবে।

প্রাথমিক শ্রেণীগুলোর অনুমোদন

মাওলানা হাবীবুর রহমান শেরওয়ানি প্রস্তাব করেন, প্রাথমিক শ্রেণীগুলো অবিলম্বে চালু করা হোক। মাওলানা আবদুল হাই এতে জোর সমর্থন জানান এবং বলেন, বর্তমানে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, তা বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। আমি মনে করি, এই আলোড়ন যদি উপেক্ষা করা হয়, তাহলে দারুল উলূমের বাস্তব কার্যক্রম শুরু করার আর কোন উপায় নেই। সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব পাশ হয়।

মাওলানার প্রতিনিধি প্রেরণের প্রস্তাব

মাওলানা এই প্রস্তাব পেশ করেন যে, নদওয়াতুল উলামার পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল লাখনৌর নেতৃবৃন্দের কাছে পাঠানো হোক এবং দারুল উলূমের জন্য উপযোগী স্থান পাওয়ার জন্য চেষ্টা শুরু করা হোক।

বাস্তব উদ্দীপনা ও কাজের গতিময়তা

উক্ত সম্মেলনে মাওলানা রহ. এই প্রস্তাবও পেশ করেন যে, দারুল উলূমের এক বছরের খরচ এ সময়ই ব্যবস্থা করতে হবে। কাকুরীর রঈস মুনশী আতহার আলী সাহেব তার সমর্থন করেন। এই প্রস্তাবও তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর হয়ে যায়। মাওলানা শিবলী রহ. সে প্রেক্ষিতে বলেন, উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে এই অপবাদ রয়েছে যে, তারা নিজেদের পয়সা খরচ করে কোনো কাজ করেন না। এ জন্যে আমার প্রস্তাব হলো এই ব্যয় ভারের জিম্মাদার ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্যরাই হবেন। অতএব তখনই চাঁদা উঠানো হয় এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অংকের ব্যবস্থা হয়। আর ঘোষণা দেয়া হয় আরো যারা এই ভালো কাজে অংশ নিতে চান তাদের জন্যও এই দরজা খোলা রয়েছে। মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই রহ. প্রস্তাব রাখেন কানপুর সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দীনিয়াত শিক্ষা দেয়ার জন্যে নদওয়ার পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা হোক। তিনি বলেন, সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। কানপুরের ইংরেজি জানা ছাত্রদের পক্ষ থেকে একটি দরখাস্ত আসে যাতে তারা এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। এ জন্যে সমীচীন হবে নদওয়াতুল উলামা যেন কানপুরে গুরুত্বের সাথে এই প্রস্তাবকে বাস্তাবায়িত করে যাতে অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য তা নজীর হতে পারে এবং তার উপর ভিত্তি করে কার্যক্রম পরিচালনা শুরু হতে পারে।

মাওলানা শিবলী রহ. এই প্রস্তাবের জোরালো সমর্থন করে বলেন, আমার বাসস্থান যদি কানপুরে হত তবে আমি খুশির সাথে এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করে নিতাম। তিনি নদওয়াতুল উলামার মুফতি আব্দুল লতীফ সাহেবকে এই খেদমত আঞ্জাম দেয়ার অনুরোধ করেন। মুফতি সাহেব অনেক আনন্দচিত্তে তা কবুল করে দেন। ১৫ শাওয়াল তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সর্বপ্রথম মাওলানা শিবলী সাহেব শাহ আমানাতুল্লাহ ফসীহি গাজীপুরীর ইন্তেকালের উপর অনেক উপযোগী শব্দে স্মৃতিচারণ ও শোক জ্ঞাপক আলোচনা করেন। তার আলোচনার পর শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। মাওলানা মরহুমের জন্য মাগফেরাতের দুআ করা হয়। অতঃপর মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই রহ. ইয়াতিম খানায়ে ইসলামিয়ার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করেন।

ইংরেজি শিক্ষিত ছাত্র ও দারুল উলুম

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ. প্রস্তাব করেন, ইংরেজি শিক্ষিত ছাত্রদের ইসলামী মাদরাসায় দীনিয়াত ও আরবি শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার ব্যবস্থা বরা যায়নি। এজন্যে সমীচীন হলো দারুল উলূমের মধ্যে তারও ব্যবস্থা করা। জলসার সমাপ্তিলগ্নে তিনি উলামা ও উপস্থিত জনসাধারণ মুসলমানদের ইসলাহ, উন্নতি ও নদওয়াতুল উলামার সফলতার জন্যে নেহায়েত নিষ্ঠার সাথে দুআ করেন।

ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে মাওলানা রহ.-এর সময়োপযোগী ঘোষণা

মাওলানা রহ.-এর এ ব্যাপারে খুব চিন্তা ছিল যে, আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণি যেন আরবি ও দীনী শিক্ষা অর্জনের প্রতি মনোযোগী হয় এবং তাদের অন্তরে যেন এসব জ্ঞানের মর্যাদা ও সম্মানবোধ সৃষ্টি হয়। কিন্তু তার পাশাপাশি, বরং তা থেকে অনেক বেশি ও বহুল পরিমাণে এই ভাবনা মাওলানার মনে ছিল যে, আমাদের ছাত্র ও উলামায়ে কেরাম- যাদের হাতে এই উম্মতের নেতৃত্বের লাগাম- তারা যেন ইংরেজি ভাষা ও আধুনিক জ্ঞান-শাস্ত্র সম্পর্কে যথার্থ যোগ্যতার অধিকারী হন এবং তা যেন ইসলামকে তুলে ধরার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। তারা কেবল মুসলমানদের পশ্চিমা ধ্যান-ধারণায় আসক্ত শ্রেণি প্রভাবিতই হবে না; বরং তারা ইউরোপে গিয়ে ইসলামের বাণী প্রচার করবে। তাদেরকে আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সতর্ক করবে। কানপুরের ইন্সপেক্টর মুনশী সাঈদুদ্দীন সাহেবের এক পত্রের জবাবে মাওলানা রহ.-এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করেন এবং জোরালোভাবে ইংরেজি ভাষা ও

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তবে তার সীমারেখা, উপকার ও অপকারের দিকগুলোর প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা

এই পরিকল্পনায় মাওলানা রহ. কলেজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষানীতির ক্রটি-বিচ্যুতিগুলোও চিহ্নিত করেন এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, যথা ভূগোল ও ইতিহাসের অপ্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তগুলো শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননশীলতায় বদ্ধমূল করার লক্ষে যে পরিমাণ শ্রম-সাধনা ব্যয়িত হয় তার সমালোচনা করেন। কোন এক স্থানে মাওলানা রহ. স্পষ্টভাবে লিখেছেন–

'ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা অতি প্রয়োজনীয় বিষয় বটে। তবে ইংরেজি বিদ্যালয়গুলোতে যে পরিমাণ পাঠদান করা হয় তাতে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন কল্যাণ নেই।'

মাওলানা রহ.–এর এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টত গভীর সূক্ষ্মদর্শিতা ও বিজ্ঞোচিত বিশ্লেষণের পরিচয় বহন করে। পাশাপশি তাঁর চিন্তার পরিমাপ ও প্রচুর পড়াশোনার ফলাফলেরও পরিচায়ক। বাস্তবতা হলো, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পাঠদানের এক বৃহৎ অংশ–চাই তা ভূগোল ইতিহাস অথবা শরীর চর্চার সাথে অথবা সাহিত্যের সাথে সম্পৃক্ত হোক না কেন- বিফলে যায়। কখনো এমনও হয় কিছু অপ্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পেছনে পড়ে শিক্ষার্থীর মেধা এতটা বিগড়ে যায় যে, উপকারী ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদিও তার স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকে না। ফলে তার সময় ও মেধার এক বড় অংশ অহেতুক, বাস্তবতাবিমুখ, সম্ভাব্য ও শাখাগত বিষয়ের পেছনে বিনষ্ট হয়।১

তিনি সেই যুগে এই আওয়াজ বুলন্দ করেন, যখন উলামায়ে কেরাম ইংরেজি শিক্ষার ঘোর বিরোধিতায় ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। ইংলিশ-তো দূরের কথা, নিজেদের নির্ধারিত পাঠ্যসূচিভুক্ত গ্রন্থাবলীতে সামান্য রদ-বদল পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কথাও তারা ভাবতেন না। সেই সময় তিনি খুব স্বচ্ছ ও চিত্তাকর্ষক পন্থায় আলেমদের ইংরেজিতে পারদর্শী হওয়ার পরামর্শ দেন এবং ভূগোল ও ইতিহাসের মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

১. হাদীসে উপকারহীন ইলম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। আর এই ধরনের জ্ঞান অনুপকারী। সম্ভবত এইসব দীর্ঘ আলোচনা জীবনে খুব কম সময়েই প্রয়োজন পড়ে বা গোটা জীবনে যার একেবারেই প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমাদের জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় যাতে চিন্তা-চেতনার ক্ষিপ্রতার প্রগতি সাধিত হয়। এসব নিরর্থক গবেষণায় অসম পন্থায় বিনষ্ট হয়।

সে সময় এই ঘোষণা এতটা সহজ ছিল না যেমনটি আমাদের কাছে এখন মনে হয়। সে যুগ সম্পর্কে যারা ধারণা রাখেন তারা সহজেই অনুমান করতে পারবেন, এ বিষয়টি মাওলানা রহ.-এর সত্যের আরাধনা ও স্বভাবজাত সাহসিকতার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অধিকন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই আওয়াজ যদি তাসাওউফ তত্ত্বে অজ্ঞ বা আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে মূর্খ ব্যক্তির মুখ থেকে উচ্চারিত হতো তাহলে এতে আশ্চর্যের কিছুই ছিল না। বরং মাওলানা রহ. একে ইরশাদ ও ইসলাহের স্তর এবং রুহানী কামালিয়্যাতের পরিপন্থী কিছু ভাবতেন না।

نوا را تلخ تر می زن چو ذوق نغمہ کم یابی

সঙ্গীতের রুচি যখন কম অনুভব করবে, তখন স্বর করবে আরো বেকর্কশ।

উল্লিখিত কাব্যাংশের অনুযায়ী তিনি কঠোর ভাষা প্রয়োগের দায়িত্ব পালন করেছেন, স্থবিরতা ও অধঃপতনের সব যুগে প্রয়োজন সর্বদা ছিল।

ওই পত্রের নির্বাচিত অংশগুলো এখানে উপস্থাপন করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

একস্থানে লিখেছেন-

'যুগ পরিবর্তন হয়েছে। ফালসাফা (দর্শন) সম্পর্কে উত্থাপিত প্রশ্নাবলী এখন আর নেই। আর প্রশ্নকারীদের অস্তিত্বও অবর্তমান। ফলে তাদের প্রশ্ন-উত্তর শেখারও তেমন প্রয়োজন নেই। এখন নতুন বিশ্ব ও নতুন খোরাকের যুগ। আধুনিক যুক্তিশাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে এ যুগে ইসলামবিরোধীরা নতুন আঙ্গিকে প্রশ্ন উত্থাপন করছে। যেগুলো পূর্বে ছিল না। যে যাই দাবি করুক না কেন, এগুলোর সমুচিত উত্তর দেয়া প্রাচীন যুক্তিশাস্ত্রে বিজ্ঞজনদের পক্ষেও সম্ভব না। কারণ হলো, প্রশ্নকারীর পক্ষে যথার্থ উত্তর তখনই দেয়া সম্ভব যখন তার প্রশ্নের মূল উদ্দেশ্য ভালোভাবে জানা থাকে। আর এ বিষয়টিও জানতে হবে, কিসের ওপর ভিত্তি করে সে প্রশ্নটি করেছে।'

সামনে তিনি আরো লিখেছেন-

আর এই বিষয়টি প্রাচীন ফালসাফা (দর্শন) দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়। একজন বিজ্ঞ আলেম যত ভালোই আলোচনা করুন না কেন, তার মনে বদ্ধমূল বিষয়কে যতক্ষণ না মূলোৎপাটন করবেন ততক্ষণ তার যথার্থ উত্তর দেয়া আদৌ সম্ভব হবে না। আর এই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ইংরেজি ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকায় ইংরেজি জানা অত্যাবশ্যক।

ইউরোপে ইসলামের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে ইংরেজির গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন-

মোটকথা এ যুগে পার্থিব ও পরকালীন প্রয়োজন এতটা প্রকটরূপ ধারণ করেছে যে, আমাদের কিছু সংখ্যক আলেমে দীন যদি ন্যূনতম এ পরিমাণ ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন, যা দিয়ে ইউরোপে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তাদের মাতৃভাষায় ব্যক্ত করবেন, তাহলে ইসলামের অনেক প্রচার-প্রসার হবে। অনুরূপভাবে ইংরেজি ভাষায় পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে বিতরণ করা হলেও অনেক কল্যাণ সাধিত হবে। মোটকথা এ সময়ে পৃথিবীর একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী ভূ-পৃষ্ঠের অনেক অঞ্চলে বিড়ম্বনার শিকার। যাদের মাতৃভাষা ইংরেজি। তাই তাবলীগে-ইসলামের (ইসলামের প্রচার-প্রসারের) জন্যে ইংরেজি ভাষা শেখা অতি প্রয়োজন। কেননা অধুনা বিশ্বে তাদেরই জয়জয়কার। আর মুসলমানরা হলো অধীনস্ত। বিজয়ীরা পরাজিতদের ভাষা শিখতে বাধ্য নয়। সুতরাং প্রয়োজনবোধে অধীনস্তদেরকে প্রভাবশালীদের ভাষা শিখতে হবে। তদুপরি এখানে আলোচনা হচ্ছে ধর্মীয় প্রয়োজনের। আর পার্থিব প্রয়োজনের বিষয়টি মোটামুটি সবাই বুঝেন। এতকিছুর পরও কিভাবে প্রশান্তচিত্তে সকলেই সংসারত্যাগী হয়ে বসে থাকবে। আর দুনিয়ামুখর ব্যক্তিদের প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ করবে না।

ভাষাই মুখ্য নয়, আল্লাহ-রাসূলের ভালোবাসাই মূল

এই চেতনা পোষণ করা যে, 'অধিকাংশ ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তি মৃত্যুকালে ড্যাম ফুল (অভিশপ্ত বোকা) হয়ে ইহলোক ত্যাগ করে' এটা নির্বোধদের ধারণা। যার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক নেই, সে চাই ইংরেজি শিক্ষিত হোক বা আরবি-ফার্সি শিক্ষিত হোক সবই নিষ্ফল। যদি আরবি শিক্ষিত কোন ব্যক্তি দিবানিশি كلي ও جزئي নিয়ে আলোচনা করে আর তার মন মস্তিষ্কে 'হাইউলা' (অশরীরী) 'সূরত' (আকার-আকৃতি) এর চিন্তা-ভাবনা জেঁকে বসে, তাহলে অসম্ভব নয় যে, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তা আপন ভাষায় উচ্চারিত হতে থাকবে। এমতাবস্থায় মৃত্যুকালে 'ড্যাম ফুল' উচ্চারণ করুক বা কুল্লি-জুযই উভয়টি সমান।

এবার একটু ভেবে দেখুন ফার্সি ও তুর্কির মতোই আরবি একটি ভাষা মাত্র। ফার্সি ও তুর্কি এ দুটি ভাষা ইতোপূর্বে যখন কাফেরদের ভাষা ছিল, আর পরবর্তী সময়ে তারা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রিত হলো তখন তা মুসলমানদের মাঝে প্রসার লাভ করে। তদ্রুপ আল্লাহর অনুগ্রহে যা হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা হচ্ছে-যদি ইংরেজিভাষীরাও ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে ইংরেজির অবস্থাও হবে ফার্সি ও আরবির মতো। যেমনিভাবে আপনারা ফার্সি ভাষায় রচিত দীনী গ্রন্থাবলি পাচ্ছেন ঠিক তদ্রুপ ইংরেজি ভাষায়ও পাবেন। বাকি রইল সরকারি স্কুলগুলোর পাঠদানপদ্ধতির ওপর উত্থাপিত প্রশ্ন। এসবের বেশির ভাগই যথার্থ।

এখন জ্ঞানের দাবি হলো, যেহেতু প্রয়োজনের খাতিরে আমরা তা শিখতে বাধ্য হচ্ছি তাই আমাদের জন্য উচিত, ওই বাহ্যিক ক্ষতিকর বিষয়গুলো প্রতিহত করার চেষ্টা করা। এমন প্রয়োজনকে নাকচ করা উচিত নয় যা (উপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে) কখনও সম্ভব নয়। রাজনৈতিক ধাপগুলোতে দক্ষতা অর্জন করা এবং দেশের মঙ্গলজনক বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগতি লাভের জন্য ইতিহাস এবং ভূগোলে জ্ঞানার্জন অত্যাবশ্যক। কিন্তু যে অধিক পরিমাণ সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে পাঠদান করা হয় তাতে উল্লেখযোগ্য কোন কল্যাণ নেই। সারকথা, সময়ের দাবি হলো ক্ষতিকর বিষয়গুলোর সমাধান করে একযোগে আরবি ও ইংরেজি ভাষাজ্ঞান অর্জন করা। যাতে আপন ভাইদের কল্যাণ সাধন সম্ভব ও সহজসাধ্য হয় এবং দীনেরও সংরক্ষণ করা যায়।

আরবি ও ইংরেজি ভাষাদ্বয় একযোগে অর্জনের পন্থা

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এমন কলেজ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, যাতে আরবি ও ইংরেজি উভয় ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠদান করা হবে। অতঃপর যে সকল ছাত্র ইংরেজির জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনে আগ্রহী তারা প্রয়োজনীয় আরবি ভাষায় ইলম অর্জনের পর ইংরেজি ভাষাজ্ঞান অর্জনে মগ্ন হবে। যারা দীনী লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইলম অর্জনে আগ্রহী অথবা ব্যবসা বা শিল্প-কারখানা নিয়ে নিজের ভবিষ্যত গড়তে আগ্রহী তারা ব্যবহারিক ইংরেজিতে জ্ঞান অর্জনের পর ক্ষান্ত হবে (আধুনিক ভাষায় যাকে ART SIDE বলে)। পাশাপাশি আরবি জ্ঞান-বিজ্ঞানে গভীরতা অর্জনে যথাসাধ্য মগ্ন হবে।

আরবি মাদরাসায় ইলম হাসিলের পর কলেজ ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষালাভ করা মাওলানা রহ. সঠিক মনে করতেন না; বরং তাঁর কামনা ছিল এমন মাদরাসা ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে আমরা প্রয়োজনমাফিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে পারি। এর মৌলিক দুটি কারণ মাওলানা রহ. চিহ্নিত করেছেন–

১. পরিবেশের কুপ্রভাব।

২. ওই সকল ধ্বংসাত্মক চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধর্মত্যাগী চিন্তা-চেতনা যেগুলো প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে যুবকদের মনমস্তিষ্কে সংক্রমিত হচ্ছে।

এর সমাধান মাওলানা রহ.–এর কাছে এটাই ছিল যে, পাঠ্যসূচি থেকে ক্ষতিকর ও বাড়তি অংশ বাদ দেয়া। আর কেবল পরিশুদ্ধ ও কল্যাণকর অংশটুকুই পাঠ্যতালিকাভুক্ত রাখা। আর তা তখনই সম্ভব হবে, যখন এই শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে আমাদের আয়ত্ব থাকবে। আর আমরা তা উপকার ও ভালোমন্দ যাচাই করে প্রণয়ন করব।

দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা আরবির সাথে সাহিত্য হিসেবে এই পরিমাণে ইংরেজি শিখবে, যার মাধ্যমে দীনের কোনো খেদমত করার যোগ্য হবে তারা। তাছাড়া এর সাহায্যে তারা জীবিকা উপার্জনের কোনো উপায় সৃষ্টি করতে পারবে। এই পদ্ধতি খুব সম্ভব মাওলানার চিন্তায় দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার জন্য বেশি উপযুক্ত এবং এক পর্যায় পর্যন্ত বাস্তবায়নযোগ্য ছিল, দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে যা সীমিত আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

দারুল উলূমের জমি সন্ধান

১৪ শাওয়াল ১৩১৫ হিজরি মোতাবেক ১০ মার্চ ১৮৯৮-খৃস্টাব্দে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ. এক কাফেলাসহ কানপুর থেকে লাখনৌ রওনা হন। এই কাফেলায় ছিলেন মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী, মাওলানা জহুরুল ইসলাম ফতেহপুরী, মাওলানা খলীলুর রহমান সাহারানপুরী, মাওলানা মাসীহুয্ যামান খান সাহেব রঈসে শাহজাহানপুর। ইস্তিকবালের জন্য মুন্সি ইহতিশাম আলী সাহেব রঈসে কাকুরবী আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন। সফরকারী দল দারুল উলূমের ধারণা ও সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাকে আগেই অবগত করেছিলেন।

মুন্সি ইহতিশাম সাহেব উদারচিত্তে বললেন, শহর সংলগ্ন আমার মালিকানাধীন দুটি জমি আছে। একটি হলো যা শহরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। অপরটি হলো 'আফাক্ব বাগের' সাথে মিলিত। এগুলো দেখার পর যে ভূমিটিই পছন্দ হবে তা حسبة لله (আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষে) দারুল উলূমের জন্য দান করলাম।

আসরের নামাজের পর কাফেলা ভূমি পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়ে। আর তাদের পছন্দ হলো সেই জমিটিই যা 'হাসান বাড়ি' তে অবস্থিত।

লাখনৌতে নদওয়ার অফিস স্থানান্তর

এ সময়ে মুন্সি ইহতিশাম আলী সাহেব উঁচু মনোবলের পরিচয় দেন। দারুল উলূমের নিজস্ব ভবন প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত 'গোলাগঞ্জে' (মালকিনের নামে বাড়ির পরিচয়) নয় হাজার টাকা মূল্যের একটি বাড়ি কিনে নদওয়াতুল উলামার কাছে হস্তান্তর করেন। ফলে ১৫ রবিউস সানী, ১৩১৫ হিজরি মোতাবেক ২ সেপ্টেম্বর ১৮১৮ নদওয়ার অফিস কানপুর থেকে লাখনৌতে স্থানান্তরিত হয়।

জনৈকা বৃদ্ধার মোটা অংকের অনুদান

লাখনৌতে বসবাসরত এক বয়োবৃদ্ধ অসুস্থ নারী দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার খবর শ্রবণে নিজের পুরো সম্পদের একটি ওসিয়তনামা (উইল) লেখান, 'পাঁচ ছয় হাজার রুপি পরিবার-পরিজন ও নিকটাত্মীয়র জন্য বরাদ্দ করে অবশিষ্ট পূর্ণ সম্পদ, যার পরিমাণ ১৫ থেকে ২০ হাজার রুপির কম নয়' দারুল উলূমের

স্মরণে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়ের জন্য ওয়াক্বফ করে দেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি মাওলানা মুহাম্মদ নাঈম ফিরিঙ্গী মহল্লীর হাতে বাইয়াত হন এবং 'দুআয়ে তওবা' নসীব হয়।

প্রাথমিক স্তরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

৯ জুমাদাল উলা ১৩১৬ হিজরি মোতাবেক ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে প্রাথমিক স্তর উদ্বোধন করা হয়। পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে এ উপলক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। অবশেষে এই নতুন ঘরেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে দেশবরেণ্য উলামায়ে কেরাম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা আব্দুল বারি ফিরিঙ্গী মহল্লী রহ. মাওলানা আইনুল কুযাত রহ. মাওলানা মুহাম্মদ নাঈম ফিরিঙ্গী মহল্লী রহ. মাওলানা ফাতাহ মুহাম্মদ তায়্যিব লাখনভী রহ. হাকীম আব্দুল আযীয রহ. হাকীম আব্দুল ওয়ালী রহ. মুহাম্মদ নাসীম সাহেব হাইকোর্টের-খান বাহাদুর ডা. আব্দুর রহীম. আতর ব্যবসায়ী শাইখ আসগার আলী রহ. ছাড়াও শহরের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এ ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। কমিশনার মি. হার্ডি এবং মি. গ্রিও উপস্থিত ছিলেন। এটাই ছিল কোন প্রথম উপলক্ষ যেখানে নদওয়াতুল উলামার কোন অনুষ্ঠানে ইংরেজ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হলো মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ. অসুস্থতার কারণে আর মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল হাই কোন সংগত কারণে (যা আমাদের জানা নেই) এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ফলে মাওলানার লিখিত প্রতিবেদন মুন্সি আতহার আলী রহ. উপস্থাপন করেন।

এই রিপোর্টে মাওলানা রহ. দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার চারটি (মৌলিক) উদ্দেশ্য উল্লেখ করেন। যেগুলো মাওলানা রহ.–এর লিখিত ভাষায় নিম্নে তুলে ধরা হলো–

১. জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণতাসাধন।

২. মুসলমানদের মাঝে ইসলামী আচার-স্বভাব এবং কৃষ্টি-কালচারের পুনর্জীবন দান করা। আর তাদের উন্নত চরিত্র ও রীতি-পদ্ধতিতে অভ্যস্ত করা।

৩. ছাত্রদের উঁচু দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদারতায় সমৃদ্ধি ঘটানো। দারুল উলূমের মতো এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে এসব বিষয়ে গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করা ব্যতীত এই গুণাবলী অর্জন সম্ভব হবে না।

অতঃপর মাওলানা মাসীহুয যামান খান রহ. এবং হাফীযুল্লাহ রহ. (যাকে নদওয়াতুল উলামার মুহতামিম নিযুক্ত করা হয়েছিল) সে সময় ভর্তি হওয়া ছাত্রদের নাম উল্লেখ করে একে একে পেশ করেন। তারা সকলেই এক ধরনের পোশাক পরিহিত ছিল এবং খুবই গাম্ভীর্যপূর্ণ ও মার্জিত ভঙ্গিতে সালাম দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

মাওলানা আব্দুল আলী মাদারাযী রহ. ফার্সি, উর্দূ ও আরবি ভাষায় চারটি ঐতিহাসিক মানপত্রের কবিতা পেশ করেন। অতপর মওলানা শাহ সুলাইমান ফুলওয়ারী আলোচনা করেন। তাঁর আলোচনা চলাকালে সাধারণ মানুষ কোন আলোড়ন ছাড়াই দানফাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। যারা তাৎক্ষণিক চাঁদাদানে অপারগ ছিলেন তারা নিজেদের নাম তালিকভুক্ত করেন। আর এই কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রথম দিনের অধিবেশন সমাপ্ত হয়। দ্বিতীয় দিন পুনরায় অধিবেশন শুরু হয়। আর মাওলানা রহ. নিজের আলোচনা সমাপ্ত করেন। শেষলগ্নে কমবয়সী এক শিশু স্বেচ্ছায় একটি মুনাজাত পাঠ করে। আর এরই মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

শিক্ষকমণ্ডলী

সে সময় যাদের ওপর পাঠদানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় তারা হলেন, সদরুল মুদাররিস (প্রধান শিক্ষক) মাওলানা হাফিযুল্লাহ রহ. মুফতি আব্দুল লতিফ সাহেব রহ. মাওলানা আব্দুশ শাকুর কাকুরী রহ. মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই রহ.। শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হওয়ার কিছুদিন পর মাওলানা হাফীযুল্লাহ সাহেব কাউকে না জানিয়ে এবং দরখাস্ত না দিয়েই চলে যান। এতে পাঠদান ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। ধারাবাহিক যোগাযোগ রক্ষার পরও যখন তার পক্ষ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না তখন তা'লীমের সাময়িক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে মাওলানা মুহাম্মদ ফারুক চিরয়াকোটীকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়।

টিকা : মুফতি আব্দুল লতিফ সাহেব বিজনুর জেলার আফজল গড়ের অধিবাসী ছিলেন। ইলমে মা'কূল ও মানকূলে তিনি মাওলানা আহমাদ হাসান কানপূরী রহ. এবং মাওলানা লুৎফুল্লাহ আলীগড়ীর ছাত্র ছিলেন। নদওয়া প্রতিষ্ঠার পর তিনি নদওয়ার মুফতি হিসেবে নিয়োগ পান এবং বহুদিন এই খেদমত আঞ্জাম দেন। যখন মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. মুঙ্গেরে একাকি বসবাস শুরু করেন, তখন তিনিও তাঁর সাথে চলে আসেন এবং তাঁর হাতে বাইয়াতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। ১৩২৪ হিজরিতে মাওলানার সাথে হজে গমন করেন। মাদরাসায় সওলূতিয়্যার মুহতামিমের পীড়াপীড়িতে এবং মাওলানার নির্দেশে দুই বছর সেখানে দরস্ দেন। প্রত্যাবর্তনের পর খানকায়ে রাহমানিয়্যাতে লেখালেখির দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। ১৯১৭ খৃস্টাব্দে জামিয়া উসমানিয়া হায়দারাবাদের দীনীয়্যাত শাখার প্রধান নিযুক্ত হন। পাঠদান ও বুঝানোর এক অনন্য নৈপুণ্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। ফিক্বাহ ও হাদীস শাস্ত্রে তার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল এবং বিষয়ের ওপর তার রচনাবলী রয়েছে। আর সেখান থেকে অব্যাহতির পর কিছুকাল মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড়ের দীনীয়্যাত শাখার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আলীগড়েই থাকতেন। আর সেখানেই ইন্তেকাল করেন।

ছাত্রদের নিয়মানুবর্তিতা

ছাত্রদের যে সময়ানুবর্তিতা কার্যকর ছিল তাতে শৃঙ্খলা, সময়ের গুরুত্ব, নিয়মনীতির প্রতি শ্রদ্ধা, কৃষ্টি-সভ্যতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, তাহযীব-তামাদ্দুন এবং আচার-আচরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। সালাত আদায়, দৈনিক স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশন, বিরতি ও বিনোদন মোটকথা সকল বিষয়ের জন্য সময় নির্ধারিত ছিল। প্রতিটি কাজ যাতে যথাসময়ে সম্পাদন করা হয় এর পূর্ণ খেয়াল রাখা হয়েছিল। রুমের পরিচ্ছন্নতা, আচার-আচরণ, উঠাবসার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখা হতো এবং এর জন্য একজন মুরুব্বি ও পর্যবেক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। বাস্তব জীবনে দুটি ভাষার চর্চা করানোর চেষ্টা করা হতো। যাতে ছাত্রদের আরব-ইরানীদের মতো আরবি ফার্সি বলার যোগ্যতা অর্জন হয়।

সমালোচকদের আচরণ

বিভিন্ন যৌক্তিক কারণে- যার আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে- আগের বছর বার্ষিক অনুষ্ঠান সীমিত পরিসরে অনুষ্ঠিত হয়। ফলে নদওয়ার আশানুরূপ প্রচার-প্রসার হতে পারেনি। অপরদিকে সাধারণ মাহফিলগুলোর মতো অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়াও সম্ভব হয়নি। তৃতীয় আরেকটি বিষয় হলো সমালোচক ও ছিদ্রান্বেষীদের এই থমথমে পরিবেশ ও নীরবতা থেকে অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের এক বড় সুযোগ মিলে যায়। কিছু লোক এমন কথাও বলে বসল 'নদওয়া ভেঙ্গে গেছে'। এমনকি এই অভিযোগও উত্থাপন করল যে, নদওয়ার দীনী মাহফিল ও সাধারণ সভা-সমাবেশে কোন পার্থক্য নেই। আর খ্যাতি ও যশ ছাড়া তাদের কোন উদ্দেশ্য নেই। এ সকল কারণে সিদ্ধান্ত হলো, বার্ষিক সমাবেশ আড়ম্বরপূর্ণ করা হবে।

আরো শাখা প্রতিষ্ঠা

বিরোধিতার নানা প্রচেষ্টা, যার পেছনে ছিল পূর্ব বিরোধিতা ও শত্রুতার এক তিক্ত অভিজ্ঞতা তা সত্ত্বেও আঞ্জুমানে নদওয়াতুল উলামার আলোকবর্তিকা থেকে অন্যান্য প্রদীপও আলোকিত হচ্ছিল।

یک چراغیست دریں بزم کہ از پرتو آں

ہر کجامی نگری انجمنے ساختہ اند

নোট : নদওয়ার বার্ষিক অনুষ্ঠান নদওয়ার চিন্তা-চেতনার প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতার অনেক বড় মাধ্যম ছিল। আর নদওয়ার অধিকতর সাফল্য তার মাহফিলগুলোর অবদানের ফসল। আজ পর্যন্ত এর প্রয়োজন ও কল্যাণ আগের মতই স্বীকৃত; বরং পূর্ব থেকেও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিরোধিতার উৎপত্তির পাশাপাশি নদওয়া তার চেতনার সুষমা এবং প্রতিকূল পরিবেশে কর্মের কন্টকাকীর্ণ প্রান্তরে পদচারণা শুরু করে এবং দারুল উলূমের প্রাথমিক স্তরের পড়াশোনা শুরু হয়ে যায়। যার আলোচনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। এ ছাড়াও এ বছর তার কার্যক্ষেত্রে আরো কিছু সাফল্য অর্জিত হয় এবং কিছু শহরে তার শাখা খোলা হয়। পানিপথে একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয় যার প্রধান নিযুক্ত হন খাজা আল্তাফ হুসাইন হালী। দ্বিতীয় শাখাটি খোলা হয় পাটনার ইসলামপুরে এবং সেখানকার অধিকাংশ উলামা-মাশায়েখ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এর সদস্যপদ সাদরে গ্রহণ করেন। শাহজাহানপুর, জলন্ধর, গুজরানওয়ালা ছাড়াও আরো শহরে নদওয়ার শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

মাওলানা শিবলীর রহ. সাথে মতানৈক্য

মাওলানা শিবলী রহ. এবং নদওয়ার পরিচালকদের মধ্যকার মতপার্থক্যের সূচনা ও এর সঠিক দিন-তারিখ নির্ণয় যদিও সম্ভব নয়; তারপরও এই মর্মান্তিক বাস্তবতার কার্যত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২৬ রবিউস সানি ১৩১৬ হিজরিতে। সেদিন নদওয়ার কার্যনির্বাহী পরিষদের বৈঠকে তিনি অনুপস্থিত থাকেন। সেই বৈঠকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

এরপর ১৩১৭ হিজরির জুমাদাস সানি পর্যন্ত পরিচালনা পরিষদের কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও হয়। মাওলানা সেগুলোতেও অনুপস্থিত থাকেন। এমনকি দারুল উলূমের পাঠোন্নতি ও এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানও মাওলানার অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। শাহজাহানপুরের অনুষ্ঠানটিও (যার আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে) তার অনুপস্থিতিতেই অনুষ্ঠিত হয়। এমনকি যে তারিখে (১০ মার্চ ১৮৯৮) মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ. ও প্রতিনিধি দল দারুল উলূমের জন্য উপযুক্ত স্থানের অনুসন্ধানে লাখনৌ রওনা হয়েছিলেন, সেদিনও মাওলানা শিবলী রহ. ভূপালের نظارة المعارف (যা ভূপালের নবাব সাহেব আরবি মাদরাসার আধুনিক ব্যবস্থাপনা ও কর্মপন্থা সুবিন্যস্ত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন) এর মজলিসে শূরায় অংশগ্রহণের পর কর্মপন্থা বিন্যস্ত করায় ব্যস্ত ছিলেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং ২ মার্চ মাওলানা রহ. ওই কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আর ২ এপ্রিল একটি বিস্তারিত ডায়েরি (দিনপঞ্জি) প্রস্তুত করেন। এতে পাঠ্যসূচির খসড়া, ঘণ্টার সময় নির্ধারণী রুটিন, মাদরাসায় উপস্থিতি ও ছুটির নিয়মাবলী, ছাত্রদের পরীক্ষা এবং শিক্ষকদের বেতনসংক্রান্ত নীতিমালা প্রস্তুত করেন। প্রকৃতপক্ষে তা ছিল একটি দুঃখজনক বিষয়। আর এই মতানৈক্য মূলত ঐক্য ও মিলনের গুরুত্ববহ ও সদূরপ্রসারী ফলাফল অর্জনে (যা মুহাম্মদ আলীর রহ. মেধা ও দূরদর্শিতার

ব্যাপকতা, উদ্ভাবনী সূক্ষ্মদর্শিতা, শিক্ষা-দীক্ষা দিকনির্দেশনার উচ্চাসন, আর মাওলানা শিবলী রহ. ইলমী যোগ্যতা, তীক্ষ্ণ মেধা, গবেষণা শক্তির দুই বাহুর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল) অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। যার বাস্তবতা এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও একজন ঐতিহাসিক বা জীবনী লেখক অনুধাবন করতে পারে।

মাওলানা শিবলী রহ.-এর ইলমী ব্যস্ততা ও অসুস্থতা

এ সময়টি ছিল মাওলানা রহ. এর মেধাগত বিক্ষিপ্ততা ও আত্মপীড়নের কাল। সাইয়িদ মাহমুদের বদমেযাজ ও মিস্টার বেকের রাজনৈতিক নিপীড়নে অস্থির হয়ে (যার ধারাবাহিকতা অনেক দিন ধরেই চলছিল) পরিশেষে ১৮৯৮ সনের মে মাসে ছয় মাসের ছুটি নিয়ে পরবর্তী সময়ে ইস্তেফাপত্র পাঠিয়ে দেন। ১৮৯৮ সনের জুন মাসে আজমগড় প্রত্যাবর্তন করেন এবং 'আল-ফারুকের' অপূর্ণ কাজটুকু পূর্ণতাদানে সচেষ্ট হন। ১৮৯৮ ইংরেজি সনের সেপ্টেম্বর মাসে আজমগড় থেকে ইলাহাবাদ যান এবং সে মাসেই অসুস্থ হয়ে লাখনৌ চলে আসেন। গোলাগঞ্জে নদওয়ার অফিসেই থাকতেন। আর সেখানকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার 'মাদরাসা তাকমীলুত-ত্বীব' এর প্রতিষ্ঠাতা হাকীম আব্দুল আজীজ সাহেবের কাছে লাখনৌতে অবস্থান করে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি লাখনৌতে অবস্থান করেন। অতঃপর তার (বহুদিন যাবৎ) খবরাখবর ও কর্মতৎপরতার সন্ধান মিলে নি। তবে এতুটুকু জানা যায় তিনি আজমগড় ফিরে যান। কিছুটা আরোগ্য লাভ করলেও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেননি। ২৬ সেপ্টেম্বর নদওয়ার প্রাথমিক স্তর খোলা হয়। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে আনুমানিক ৩ অথবা ৪ তারিখ এর ঐতিহাসিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল কার্যক্রমে মাওলানা শিবলী রহ.-এর নাম কোথায় পাওয়া যায় না। মোটকথা তাঁর দার্শনিকসুলভ কর্মলিপ্ততার পাশাপাশি শারীরিক অসুস্থতার ধারাও অব্যাহত থাকে। কখনো বা সুস্থ আর কখনো অসুস্থ আবার কখনো পূর্ণ সুস্থতা অনুভব করতেন। ব্যবস্থাপনা কমিটির পরবর্তী কোন এক প্রস্তাবনা থেকে জানা যায় অসুস্থতার এই ধারাবাহিকতা আনুমানিক ১৮৯৯ সনের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে।

মনে হয় মাওলানা শিবলী রহ. এই দীর্ঘ সময় অনুপস্থিতির সময়ে তার মেধাগত বিক্ষিপ্ততা, অসুস্থতা এবং দার্শনিক কর্মলিপ্ততার কার্যকর ভূমিকা ছিল। তবে এ বিষয়টিকেই এর কারণ সাব্যস্ত করা ঠিক হবে না। মূলত এই মতানৈক্যের মূল অনেক গভীরে প্রোথিত ছিল। আর তার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল। যার ওপর ভিত্তি করে পরিশেষে স্ববিস্তর ও সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

বার্ষিক মাহফিলে অংশগ্রহণের জন্য দাওয়াত

১৮৯৯ সনে ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে এই প্রস্তাবনা গৃহীত হয় যে, বার্ষিক মাহফিলে মাওলানার অংশ গ্রহণের জন্য দাওয়াতনামা প্রেরণ করা হোক।' এই প্রস্তাবনা ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যবিবরণী দফতরে সংরক্ষিত আছে। নদওয়াতুল উলামার ব্যবস্থাপনা পরিষদের দফতরে লিপিবদ্ধ কার্যবিবরণীর ভাষ্য নিম্নরূপ–

মাওলানা শিবলী সাহেব অসুস্থতাহেতু মাহফিলে অংশগ্রহণ করতে না পারায় ব্যবস্থাপনা পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর নিকট চিঠি প্ররণ করা হোক। তার অসুস্থ্যতায় সমবেদনা প্রকাশ করে এই মর্মে পত্র লেখা হোক যে, 'আপনি বার্ষিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করুন এবং দারুল উলূম প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকুন। আর যদি স্বাস্থ্য এখনো সম্পূর্ণরূপে সুস্থ না হয় তাহলে চিকিৎসা এবং আবহাওয়া পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে লাখনৌ আগমন করুন। অধিকন্তু তাদের (সদস্যদের) সিদ্ধান্ত এই যে, আপনার নামের ঘোষণা আস্থার সাথে প্রচার করা হোক।

মাওলানা শিবলী রহ. এই চিঠির কী জবাব দিয়েছিলেন তা আমাদের জানা নেই; বরং মাওলানার অসুস্থতা এবং তার দার্শনিক কর্মব্যস্ততা ধারবাহিকভাবেই অব্যাহত ছিল। আর এই ভাবেই একটি সময় অতিবাহিত হয়ে যায়।

মতানৈক্যের কারণ

নদওয়ার প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে মাওলানার মতানৈক্যের মৌলিক কারণগুলোর পাশাপাশি পাঠ্যসূচি এবং ইংরেজি শিক্ষার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাওলানা শিবলী রহ. ইচ্ছা ছিল পুরাতন পাঠ্যসূচিতে যে পরিবর্তনগুলো অপরিহার্য তার সবগুলোই একসাথে কার্যকর করা হোক। পুরাতন পাঠ্যসূচি একরকম বিলুপ্ত করা হোক। আর ইংরেজির নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষাদানের পূর্ণ ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু মুহাম্মদ আলী রহ. এই তাড়াহুড়াকে ক্ষতিকর মনে করতেন। তিনি সহনীয় পদ্ধতিতে ধীরতার সাথে পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যান্য শিক্ষকমণ্ডলী ও যুগসচেতন ব্যক্তিরাও এই তাড়াহুড়া ও প্রান্তিকতাকে অপছন্দ করতেন।

এই অস্পষ্ট বিষয়টির ব্যাখ্যা আমরা এইভাবে করতে পারি, মাওলানা শিবলী রহ. মানতেক, দর্শন এবং তর্কশাস্ত্রের পাঠদানকে একত্রে বন্ধ করে দেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু মাওলানা মুহাম্মদ আলী রহ. এবং তার অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। যেহেতু এক দীর্ঘ সময় ধরে এই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা উলামায়ে কেরামের মন-মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাই বিভ্রম লেখার মত

নিশ্চিহ্ন করার দ্বারা অনেক সমস্যা ও কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এমতাবস্থায় এটাই অধিক উপযোগী ছিল যে, ওই সকল বিষয়ের কিছু উপকারী গ্রন্থাবলী ও নির্বাচিত অংশগুলো নেসাবভুক্ত রাখা।

মাওলানা মুহাম্মদ আলী রহ. প্রণিত পাঠ্যসূচিতে 'রশিদিয়্যা' (যা তর্ক শাস্ত্রেও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ)-কে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু মাওলানা শিবলী রহ. এর বিরোধী ছিলেন। তিনি তার প্রণিত পাঠসূচিতে -যা তিনি نظارة المعارف এর জন্য বিন্যস্ত করেছিলেন (তাতেও)- এই কিতাবের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

কর্মপন্থার এই মতবিরোধ, গবেষণার পন্থা এবং মেধা ও মেযাজের ভিন্নতা একত্রিত হয়ে ক্রমে ক্রমে তা তীব্র আকার ধারণ করে। আর অপ্রশস্ত প্রান্তর ধীরে ধীরে ব্যাপৃত হতে থাকে।

টিকা– গ্রন্থটি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত রাখার অন্যতম একটি কারণ ছিল, খৃস্টবাদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রের মোকাবেলায় কখনো কখনো বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দিত। যার কারণে এই কিতাবের সাথে সম্পর্ক রাখা প্রত্যেক মুসলিম জ্ঞানী এবং তালেবে ইলমের জন্য অপরিহার্য ছিল। 'পয়গাম্বরে মুহাম্মদী' নামক গ্রন্থে মাওলানা এই বিষটির প্রতি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছেন– 'হতাশা ও আশ্চর্যবোধ করি ওই সকল মহান আলেমে দীনের ব্যাপারে, যারা যুগের এই ক্রান্তিলগ্নে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টির প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেন না এবং এই বিজ্ঞান ও এর চর্চাকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখেন এবং অহেতুক কাজ মনে করেন।

শাহজাহানপুরের মাহফিল

শাহজাহানপুরে একটি ছোট মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে মাওলানা নদওয়াতুল উলামার প্রয়োজনীয়তা এবং তার গুরুত্বের ওপর ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই লেখায় মাওলানার বর্ণনাভঙ্গি এবং গবেষণার উন্নত কমনীয় রূপ স্পষ্ট প্রতিভাত হয়–

মানুষকে সঠিক পথের দিশা প্রদান ও হিদায়াতে ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ করুন! প্রতিটি যুগের আবিষ্কারের ওপর ক্রিয়া সৃষ্টির লক্ষে এবং রুচির আসক্তির প্রতি লক্ষ রেখে পাথেয়ের ভিন্নতা দৃষ্টিগোচর হয়। এক যুগে যাদুর প্রাবল্য ছিল; ফলে লাঠি ও শুভ্রহাত দিয়ে তা প্রতিহত করা হয়েছে। আবার অন্য যুগ ছিল চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি সাধনের যুগ। তাই أبرئ الأكمه و الأبرص و أحي الموتى (আমি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীর নিরাময় করি ও মৃতকে জীবিত করি) আয়াতের অপ্রতিরোধ্য দলীল দিয়ে শির নত করা হয়েছে।

আমাদের হযরত (আমার জীবন তাঁর জন্য উৎসর্গিত) সাহিত্যের এমন এক সুখময় যৌবনে আগমন করেন, যখন সাহিত্য ও বাগ্মিতার মহর অংকিত ছিল। আর আরব জাতি এতে বিভোর ছিল। ফলে তাঁকে এমন একটি মু'জিযা প্রদান করা হলো যা তাদের সকলের বাকশক্তি রুদ্ধ করে দেয়। ইরশাদ হয়েছে–

لو اجتمعت الانس و الجن علي أن يأتوا بمثل هذا القرأن لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا.

'যদি মানব-দানব (সকলে মিলে) একটি কুরআন লিখতে সমবেত হয়, তাহলেও তারা এমন একটি কুরআন আনতে পারবে না। যদিও তারা একে অপরের সহযোগী হয়।'

নবুওয়াতির ধারা সমাপ্ত হওয়ার পর মুজতাহিদীন ও মুজাদ্দিদীনের হেদায়াতের ধারা অব্যাহত থাকে। প্রতি যুগেই দৃঢ়চেতা মনীষীগণ তাদের সময়কার মানব সমাজকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন উপযোগী রকমারি পন্থায়। যখন গ্রিক দর্শনের প্রাবল্য ছিল তখন মুজতাহিদরা এর বিকল্প হিসেবে ইসলামী দর্শনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এতে এত সূক্ষ্ম বিষয়ের উন্মেষ ঘটিয়েছেন, যার ফলে সে যুগের লোকেরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। আর তাদের এ কথার বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, ইসলামী দর্শনের মোকাবেলায় গ্রিক দর্শন অসার বস্তু সদৃশ; সুতরাং এ যুগে আধুনিক দর্শন যেহেতু মন-মস্তিষ্কে মহর এঁটে দিয়েছে এবং নাস্তিকতা খোদাদ্রোহিতার প্রাবল্য বৃদ্ধিই পাচ্ছে। আর ওই সকল প্রচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, যেগুলো তা প্রতিরোধে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন গ্রিক দর্শন দিয়ে প্রতিহত করার প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে। আর এই পন্থায় প্রতিহত করার ব্যর্থ চেষ্টার ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে, যুগের দাবি আলেম সমাজ ও সাধারণ জনগণের মধ্যকার সম্পর্কে চিড় ধরিয়েছে এবং এই দুদলের মাঝে এমন ঘৃণা ও আতংকের দেয়াল প্রতিষ্ঠিত যার ফলে অপরিচিতি ও বিরোধিতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উলামায়ে কেরাম তাদেরকে কথা বলার উপযুক্ত মনে করেন না। আর সাধারণ মানুষ তাদের জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেয় না। দূর থেকেই কাঁদা ছোড়াছুড়ি হচ্ছে। ভুল বিবৃতির দরুণ এক দলের দৃষ্টিতে অপর দল অযোগ্য বিবেচিত হচ্ছে। যার ফলে না উলামায়ে কেরামের ওয়াজ নসীহতে নতুন প্রজন্ম উপকৃত হতে পারছে। আর না তাদের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম অবগতি লাভ করতে পারছেন। যার কারণে হযরত সা.–এর পবিত্র শরীয়ত তর্ক-বিতর্ক ঘৃণা-আতংকের চর্চাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

এই মাহফিলটি অনুষ্ঠিত হয় ১৩১৬ হিজরির ১৩, ১৪, ১৫ জিলক্বদে। এই মাহফিলের সভাপতিত্ব করেন হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব রহ. এর খলীফা মাওলানা আহমাদ হাসান কানপূরী রহ.। মাওলানা আহমাদ হাসান রাহ. একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর জলসার আদব পাঠ করে শোনান। যার দুটি নীতি নিম্নে প্রদত্ত হলো :-

১. উলামায়ে কেরামের এই পরিবেশে যে সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি অংশগ্রহণ করবেন, তাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, উলামায়ে কেরামের মান-মর্যাদা পরিপন্থী কোন বিষয় যেন প্রকাশ না পায়।

২. মাহফিল চলাকালীন কোন নেতা বা বিত্তবানের সম্মানে কোন আলেম উঠে দাঁড়াবেন না। কোন ধরনের রাজনৈতিক ইশতিহার পেশ করার অনুমতি নেই। তবে নদওয়াতুল উলামার পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হবে তার বিধান ভিন্ন।

অতঃপর মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল হাই রহ. বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন। মাওলানা শেরওয়ানী এবং মাওলানা শাহ সুলাইমান ফুলওয়ারীর বয়ানের পর প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

বিকেল পাঁচটায় সাধারণ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এত অধিক লোক সমাগম হয়েছিল যে, প্রশস্ত মাঠ তিন দিকের রাস্তা পর্যন্ত বহুদূর থেকেই লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। এই মাহফিলে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আলোচনা করেন। রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত উলামায়ে কেরামের একটি বিশেষ পরিচিতি অনুষ্ঠান হয়।

১৪ জিলক্বদ দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আব্দুল হাই রহ. দারুল উলূমের প্রথম রিপোর্ট উপস্থাপন করেন এবং এই বিষয়ের ওপর বিস্তর আলোকপাত করেন। আরবি মাদরাসার ছাত্রদের আলোচনাপূর্বক দারুল উলূমের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন–

আমরা চাই না ছাত্ররা 'মুতানাব্বী' অথবা 'মাকামাতের' মতো কিতাব পড়ার পর দুই লাইনে আরবি লিখতে ব্যর্থ হবে। বা লিখতে পারলেও পাঁচ মিনিট আরবিতে কথোপকথনে অক্ষম হবে। বা মানতেকে মহাজ্ঞানী-তো হবে বটে কিন্তু হিসাব বিজ্ঞান অথবা নির্মাণ শাস্ত্র সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ থাকবে। বা এই সকল জ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন করবে বটে, কিন্তু তাজবীদের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে না। আমাদের চাওয়া ও প্রাপ্তি হবে ছাত্ররা কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফের গভীর জ্ঞানার্জন করবে। এরপর প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত আরবি ভাষাজ্ঞানের খুব গুরুত্ব দেওয়া হবে। কেননা এই স্তরটি হলো উপরের স্তরগুলোর জন্য ভিত্তি

স্বরূপ। ভিত্তি যদি অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাহলে ঘর সর্বদা নড়বড়ে থেকে যাবে। এরপর মেধার তীক্ষ্ণতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা মানতেকের ও পাঠদান করব এবং প্রয়োজনমাফিক হিসাব ও নির্মাণ শিল্পেরও পাঠদান করব।

পরিশেষে মাওলানা একটি প্রশস্ত ও বৃহৎ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে রিপোর্টের ইতি টানেন। তারপর মাওলানা শেরওয়ানী তাঁর লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরিশেষে খান বাহাদুর মুন্সি আতহার আলী রহ. একটি কার্যকর রিপোর্ট উপস্থাপনের পর মূলধন বৃদ্ধির আবেদন করেন এবং এক বৃদ্ধার আলোচনা তুলে ধরেন যিনি দারুল উলূমের আলোচনা শুনে ১৫-২০ হাজার রুপি মূল্যের সম্পত্তি নদওয়ার জন্য ওয়াকফ করেছেন।

চাঁদা আদায়ে বিপুল আগ্রহ উদ্দীপনা

এই রিপোর্ট মাহফিলে উপস্থিত ব্যক্তিদের ওপর এত প্রভাব বিস্তার করে যে, যখন মাওলানা শাহ্ সুলাইমান বয়ান করার উদ্দেশ্যে দাঁড়ান তখন চাঁদা প্রদানকারীদের প্রবল আবেগ-উদ্দীপনা ও ভিড়ের দরুণ তার পক্ষে আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছিল না। একাধিকবার আলোচনা সাময়িকের জন্য বন্ধ রাখতে হয়। মাওলানা শেরওয়ানী ও মাওলানা আব্দুল হাই দাতাদের নাম-ঠিকানা লিখছিলেন। মাওলানা মাসীহুযযামান খান নাম লেখাচ্ছিলেন আর মাওলানা খলীলুর রহমান সাহারানপুরী টাকা উসূল করছিলেন। এত ভিড় ছিল যে কয়েকবার মাহফিলের কার্যক্রম স্থগিত রাখতে হয়। যার কাছে যা ছিল তাই মান্নত করছিল। টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড়, লোটা-বদনা, শাল, রুমাল, গাভী, যমীন-যিরাত, আসবাব-পত্র যার কাছে যা উপস্থিত ছিল তাই পেশ করছিলেন।

অপূর্ব দৃশ্য

শাহজাহানপুরের মহাজন মাওলানা আব্দুল হাই খান নকশেবন্দী সাহেব তার মালিকানাধীন 'খামরাপুর' মৌজার অর্ধেক স্থাবর সম্পত্তি নদওয়ার নামে দান করার ঘোষণা দেন। হাফেজ মুহাম্মদ ইসমাঈল ওকীল সাহেব এই দানের ঘোষণা দিয়ে বলেন 'আশা রাখি এর বাকি অর্ধেকও অতিসত্বর নদওয়ার মালিকানাধীন হবে। কিছুক্ষণ অতিবাহিত না হতেই মাওলানা মাসীহুযযামান সাহেবের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো তার মালিকানাধীন অবশিষ্ট অর্ধেক মৌজাও নদওয়ার খেদমতে উৎসর্গ করা হলো। সে সময় মাহফিলে এক অভূতপূর্ব অবস্থা বিরাজ করছিল। চতুর্দিকে একই আওয়াজ ভেসে আসছিল। আরেক মহাজন আহমাদ হাসান খান সাহেব মিসরীপুরের পাঁচশ রুপি মূল্যের রাজস্বমুক্ত জমি নদওয়ার নামে দান করেন। মাহমুদ খান সাহেব একটি জমি

ওয়াকফ করেন। এরপর নগদ মূল্যের অনেক দান উসূল শুরু হয়। আঞ্জুমানে মুঈনুন নদওয়ার বাঙ্কিপুরের পক্ষ থেকে এই মাহফিলে প্রতিনিধিত্ব করছিলেন ব্যারিস্টার মুহাম্মদ সুলাইমান। তিনি এই পরিবেশে ক্রিয়াশীল ও দরদমাখা এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তিনি বলেন 'নদওয়ার লক্ষ্য উদ্দেশ্যাবলী এবং তার কল্যাণকর দিকগুলো সম্পর্কে আমার তেমন জ্ঞান ছিল না আর জানার আসক্তিও ছিলনা। কিন্তু গত দুদিন ধরে যে দৃশ্য আমি উপভোগ করছি, তাতে আমার হৃদয়ে এক অপূর্ব অবস্থা আন্দোলিত হচ্ছে। আমি নিজের জীবনকে নদওয়ার উদ্দেশ্য সাধনে উৎসর্গ করছি। যেন আমাকে আমার উপযুক্ত কাজে ব্যবহার করা হয়।

সময় স্বল্পতার কারণে যদিও চাঁদা সংগ্রহ বন্ধ ঘোষণা করা হয় তারপরও দাতারা দানের জন্য প্রচণ্ড ভিড় জমায়।

সাধারণ মাহফিল

বিকেল পাঁচটা থেকে আবারো সাধারণ মাহফিল শুরু হয়। আর সেদিনও সভাস্থল কানায় কানায় ভরপুর ছিল। শ্রোতাদের ভিড়ের কারণে চতুর্দিকের রাস্তাঘাটে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সড়কগুলোর অবস্থা মনে হচ্ছিল, এক পাশ থেকে অন্য পাশে পৌঁছানো অসম্ভব। মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. এই মাহফিলের ব্যাপারে নিজের অভিব্যক্তি এভাবে পেশ করেন–

'কোন একটি সমাবেশে এতসংখ্যক মুসলমানকে দেখে কেমন আনন্দ অনুভূত হয়, তা শুধু তাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত যে স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করেছে।'

বিশেষ অধিবেশন

রাত ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। এতে উলামায়ে কেরাম ছাড়াও আঞ্জুমানে হিমায়াতে ইসলামের সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য সম্মানিত ব্যাক্তবর্গ অংশ নেন। ১৫ জিলক্বদ, ২৮ মার্চ এই অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, শাহজাহানপুর গৌরমট কলেজে দীনী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে এবং গভীর পর্যালোচনার পর এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, 'শাহজাহানপুরের নদওয়ার পরিচালক নিজ দায়িত্বে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করবেন।'

মাদরাসার প্রস্তাব

ইতোপূর্বে জলসায় চাঁদা দানকারীরা শুধু সোনা-রূপা, নগদ অর্থ-কড়ি, স্থাবর সম্পত্তি দান করছিলেন। কিন্তু এই মাহফিলে একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত এটাও গৃহীত

হয়েছিল যে, একটি মাদরাসাও নদওয়াকে দান স্বরূপ দেয়া হবে। বিশেষ মর্যাদার অধিকারী একজন মহান ব্যক্তি মাদরাসায়ে ইসলামিয়া বলরামপুরের মুহতামিম আহমাদুয যামান খান ঘোষণা করলেন, তিনি নিজ মাদ্‌রাসা নদওয়ার তহবিলে ও পরিচালনায় দিতে আগ্রহী। (ওই মাদরাসায় একশরও বেশি ছাত্র ছিল এবং দীনী শিক্ষার পাশাপাশি আঞ্জুমানে হিমায়াতে ইসলামের সিলেবাসও চালু ছিল।) তার এই প্রস্তাব নদওয়ার কর্ণধার ব্যক্তিবর্গ গ্রহণ করলেন এবং ওই মাদরাসার মালিকানা কৃতজ্ঞতার সাথে কবুল করেন।

পরিশেষে মাওলানা আব্দুল জব্বার উমরপুরী অতি সুমধুর কণ্ঠে স্বরচিত আরবি কবিতা শোনান এবং মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও নদওয়ার আলোচনার মধ্য দিয়ে কবিতা পাঠ শেষ করেন।

الله يسقيها و يعصم عزها * يزيد فيها حيرة العقلاء

و أدام عظمتها و ضاعف نورها * و أقامها في رونق وبهاء

وأعز ناظمها الجليل بفضله * و أراحه من كربة وعناء

وأطال مدة عمره وحياته * عافاه في الدنيا و دار بقاء

'মহান আল্লাহ তাআলা একে পরিতৃপ্ত করুন। এতে বিজ্ঞজনের বিস্ময় বৃদ্ধি করুন।

আর তার মর্যাদাকে করুন চিরন্তন ও আলোকেও করুন দ্বিগুন। ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্যে তা প্রতিষ্ঠিত করুন।

আর তার মহান পরিচালককে আপন মহিমায় করুন মর্যাদাবান। আর তাকে বিপদ-আপদ যাতনা থেকে স্বস্তি দান করুন।

আর আয়ুকালকে ও জীবনকে করুন সুদীর্ঘ। আর ইহকাল ও পরকালে তাকে প্রশান্তি দান করুন।'

এরপর মুম্বায়ের মহাজন হাকীম শাইখ আহমাদ সাহেব রচিত আরবি কবিতা কাযী আলী আহমাদ সাহেব বাদায়ূনী পাঠ করেন। আর নিযামী বাদায়ূনী স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান। যার কিছু পংক্তি নিম্নে প্রদত্ত হলো–

شاید بہار آئی اسلام کے چمن میں ☆ پھولے نہیں سماتے مومن جو چیر ہن میں

انصاف سے جو دیکھیں ان پر ابھی ہو روشن ☆ کیا فائدے ہیں پنہاں اس پاک انجمن میں

'হয়ত বসন্ত এসেছে ইসলামের বাগিচায়
মুমিন বার্ধক্যে ফুল শোভায় অবকাশ যাপন করে না।
নিষ্ঠার দৃষ্টিতে যে দেখবে সে তাতে আলো দেখতে পাবে।
এই পবিত্র মজলিসে লুকোচুরিতে কী কল্যাণ রয়েছে।'

নদওয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও তার সঙ্গীদের আলোচনায় তিনি এই কবিতা পাঠ করেন–

ڈالی بنائے ندوہ جس نے بحسن نیت ☆ برکت اسے خدا دے اس کوشش حسن میں
فرزانہ ویگانہ، وہ عبد حی، دانا ☆ ہیں عالم علوم دیں کے، کامل ہر ایک فن میں
یہ کے معالج حضرت مسیح دوراں ☆ ہیں شمع انجمن میں، اور پھول ہیں چمن میں

'উৎকৃষ্ট নিয়তে নদওয়ার এই ফুলের ডালি সাজিয়েছেন যিনি
তার এই কল্যাণময় প্রচেষ্টায় বরকত দাও প্রভু হে তুমি
জ্ঞানী ও নিকটতম ব্যক্তি সে আব্দুল হাই বিজ্ঞজন
দীনের বহুজ্ঞানে পূর্ণমানব সে (অনেকের) একজন
সে হলো জাতির হেকিম অতন্দ্র হযরত মসিহা
বাগানের ফুল ও মজলিসের এক আলোকবর্তিকা'

টাকার বর্ষণ

কবিতা আবৃত্তির পর শাহ সুলাইমান ফুলয়ারী গতদিনের অসমাপ্ত আলোচনা সমাপ্ত করার জন্য দাঁড়ান। তখনও মুসলমানদের আগ্রহ উদ্দীপনায় ভাটা পড়েনি। মূলত তিনি এ সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। ফলে আলোচনা শুরু হতেই টাকার বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা গুল মুহাম্মাদ রহ. অগ্রজ ভূমিকায় অবতরণ করেন। নিজের পকেট ঘড়িটি স্টেজের উপর রেখে নিজের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শুরু করেন। বেরেলীর ডেপুটি ইন্সপেক্টর হাফিজ গাফুরুদ্দীন নিজের মূল্যবান শালটি খুলে দান করেন। এরপর দানের ধারা শুরু হয়ে যায়।

শ্রমিকদের আত্মার মিলন ও ত্যাগ

এই ঘটনা থেকে মাহফিলের প্রভাব ও আকর্ষণের কিছুটা অনুমান করা সম্ভব। এই মাহফিলে যে সকল শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন তারা নিজেদের একদিনের পারিশ্রমিক নদওয়ায় দান করেন।

এক বক্তার অবস্থার পরিবর্তন

মওলভী আব্দুর রহীম নামক এক বক্তা নদওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন; বরং বলা চলে বিরোধীদের অগ্রনায়ক ছিলেন। তিনি মূলত নাদওয়ার বিরুদ্ধে পুস্তিকা বিতরণের উদ্দেশ্যে মাহফিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মাহফিলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। সভার এই অবস্থা দেখে তার চোখ খুলে যায়। সুতরাং ওইসব পুস্তিকা আঞ্জুমানের প্রধানের নিকট নিয়ে সেগুলো ছিঁড়তে শুরু করেন। মানুষের ভিড়ে এই ঘটনার গোমর ফাঁস হয়ে যায়। এরপর তিনি ভাষণ দেন এবং তার পূর্বের ধারণা থেকে ফিরে আসার ঘোষণা দেন। সূর্যের কিরণ এবং গরমের প্রচণ্ডতা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি চাঁদা আদায়ের অধিবেশন সমাপ্ত করতে চাচ্ছিলেন না। পরিশেষে সকল প্রস্তাবের ইতি টেনে অধিবেশন সমাপ্ত করা হয় এবং অত্যন্ত অনুনয় বিনয় ও আবেগের সাথে দুআ করা হয়। বিকেল ৫টায় সর্বশেষ সাধারণ মাহফিল অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাৎসরিক মাহফিল সমাপ্ত হয়।

শহরে মাহফিলের আবেদন ও উৎসাহ-উদ্দীপনা

বার্ষিক অনুষ্ঠানের শেষপর্যায়ে শহর থেকে ওয়াজ মাহফিলের আবেদন আসতে শুরু করে। শাহজাহানপুরের সর্দারগণ শহরে একদিন ওয়াজ মাহফিলের আয়োজনের জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করছিলেন। কিন্তু বার্ষিক অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার পর তারা এই অনুরোধ করতে শুরু করল যেন তাদের বসত-বাড়িতে পৃথক পৃথক জলসার আয়োজন করা হয়। যাতে নারীরাও এ থেকে উপকৃত হতে পারে।

নারীদের উদারতা

মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ খান সাহেবের বাড়িতে সর্বপ্রথম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। শাহ সুলাইমান ফুলয়ারী ওয়াজ করেন। ওয়াজ শেষে নারীরা নগদ অর্থকড়ি অলংকার ইত্যাদি দান করতে থাকেন। বাড়ি মালিকের সহধর্মিনী দারুল উলূমের জন্য সাত হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি ওয়াকফ করলেন। এ সময় 'গোন্ডের' ডেপুটি কালেক্টর হাজার হাজার টাকা সমমূল্যের মূল্যবান গ্রন্থাদি সমৃদ্ধ নিজ গ্রন্থাগারটি দারুল উলূমের জন্য ওয়াকফ করে দেন।

বেরেলীর উদ্দেশ্যে নদওয়ার প্রতিনিধি দল

বেরেলীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নদওয়ার পরিচিতির জন্য এক বিশেষ প্রতিনিধি দলের ওই এলাকা ভ্রমণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। যার ফলে ২৬ জিলক্বদ ১৩১৬

হিজরিতে মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. মাওলানা শাহ সুলাইমান রহ. মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল হাই রহ.সহ অন্যান্য উলামা হযরতের একটি দল বেরেলী গমন করেন। আর সেখানে একাধিক জলসাও অনুষ্ঠিত হয়। মানুষ অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনাসহ নদওয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো শুনেন।

এক মহাজনের আবেগপূর্ণ দান

৪ জিলহজ্ব প্রতিনিধি দল 'চান্দোসী' (মুরাদাবাদ) পৌঁছে। ৫ জিলহজ্ব দুটি জলসা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যার পর আলোচনা শেষে চাঁদা প্রদান শুরু হয়। চাঁদার পরিমাণ বিশাল অংকের ছিল না। কিন্তু মানুষ কত আগ্রহ-উদ্দীপনা ও উৎসাহের সাথে চাঁদা দেন তার অনুমান করা সম্ভব একটি ঘটনা থেকে– মুরাদাবাদের সরদার নবাব হাসান খান সাহেব জলসায় অংশগ্রহণের জন্য ঘোড়ায় চড়ে সভাস্থলে এসেছিলেন। তার মনে এমন ভাবের সঞ্চার হয়, যার ফলে নিজের বাহন ঘোড়াটি নদওয়ায় মান্নত করেন। মাহফিলে শেষে জানা গেল নবাব সাহেব ঘোড়া রেখে পায়ে হেঁটে চলে গেছেন।

মাওলান আব্দুল হাই রহ.–এর অকৃত্রিম খিদমতের স্বীকৃতি

এই দীর্ঘ সময়ে যা নদওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে স্বীকৃত। মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল হাই রহ. বাস্তবিক অর্থে মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. এর হাত ও বাহুর কাজ করেছেন। তিনি প্রতিটি বিপদ-আপদে ও সংকটপূর্ণ সময়ে মাওলানা মুহাম্মদ আলী রহ.কে সঙ্গ দেন এবং তাঁর মাধ্যমে মাওলানা মুহাম্মদ আলী রহ. অনেক শক্তি অর্জন হয়।

২৫ শাওয়াল ১২১৭ হিজরিতে মাওলানা রহ. ব্যবস্থাপনা পরিষদের কাছে একটি চিঠি পাঠান। আর তাতে মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই রহ. সম্বন্ধে যে সুধারণা পোষণ করেছেন এবং জোরালো ভাষায় তাঁর আলোচনা করেছেন, তা থেকে বোধগম্য হয়, তিনি মাওলানা আব্দুল হাই রহ. এর জ্ঞান, প্রচেষ্টা এবং যোগ্যতার অতি গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি কিছুদিন পারিশ্রমিক ছাড়াই কাজ করেছেন। এরপর তার জন্য ত্রিশ টাকা মাসিক ভাতা নির্ধারণ করা হয়। মাওলানা মুহাম্মদ আলী রহ. তা বৃদ্ধির সুপারিশ করে পত্র লিখেন–

'মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই সহকারী ব্যবস্থাপক প্রাথমিক কিছুদিন বিনা বেতনে কাজ করেছেন। ব্যবস্থাপক ও সদস্যবৃন্দ তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ত্রিশ

টাকা মাসিক ভাতা নির্ধারণ করেন। তার সহনশীলতা ও স্বল্পভাষী হওয়ার দরুণ তার অবস্থা পুরোপুরি বুঝে আসে না। কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে, আমাদের উলামায়ে কেরামের দলে তার মতো যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া বড় ভার। প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, সহনশীলতা, যোগ্যতা ও কার্যবিবরণীতে প্রশংসাযোগ্য ব্যক্তি।'

একটু পর লিখেন-

'যখন থেকে আমি দুর্বলতা ও অসুস্থতার দরুণ কাজ করতে পারছি না তখন থেকে আমার সকল কাজ তিনিই খুব সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। এই কাজের প্রতি তার আগ্রহও রয়েছে অনেক। আমার মতে তার বেতন বৃদ্ধি করে পঞ্চাশ টাকা নির্ধারণ করা খুবই প্রয়োজন।'

নতুন মুহতামিম

২১ মুহাররম ১২১৭ হিজরিতে ব্যবস্থাপনা পরিষদ মাওলানা মুহাম্মদ ফারুক চিরয়াকোটিকে দারুল উলূমের নতুন মুহতামিম এবং প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়। মাওলানা হাফিযুল্লাহ সাহেবের নাম নায়েবে মুহতামিম হিসেবে পেশ করা হয়। কিন্তু তিনি একদিন চিন্তা-ভাবনার পর অপারগতা প্রকাশ করেন।

মাওলানা শেরওয়ানীর রিপোর্ট

৭ ও ৮ জুমাদাস সানী ১৩১৭ হিজরি ব্যবস্থাপনা পরিষদের এক অধিবেশনে- যাতে মাওলানা শিবলী রহ.ও অংশগ্রহণ করেন- মাওলান শেরওয়ানী রহ. মাওলানা শিবলী রহ. মাওলানা মাসীহুযযামান এর সমন্বয়ে দারুল উলূম পর্যবেক্ষণের পর একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। যাতে শিক্ষকদের নিয়মপরিপন্থী কার্যক্রম এবং আলস্যপনার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। ওই অধিবেশনে এই রিপোর্ট পেশ করা হয়। পাশাপাশি এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যে সকল শিক্ষক দ্বারা এই অনিয়ম প্রকাশ পেয়েছে তাদের নিকট ব্যবস্থাপনা পরিষদের দস্তখত সম্বলিত একটি সতর্কীকরণ পত্র পাঠানো হোক এবং এতে তাদেরকে সতর্ক করা হোক।

টিকা : মাওলানা মাসীহুয যামান খান সে যুগের প্রসিদ্ধ নেতৃস্থানীয় আলেম ছিলেন। নেযামে হায়দারাবাদের উস্তাদ ও দীক্ষাগুরুও ছিলেন। শেষ বয়সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন। কিন্তু এ অবস্থায়ও নামাজের সীমাহীন পাবন্দ ছিলেন। মাওলানা উত্তম চরিত্র, বিনয়, সহনশীলতা, ধৈর্য. স্থিরচিত্ত এবং উচ্চ মনোবলের একটি দৃষ্টান্ত ছিলেন। বৈঠকে তার যে প্রভাব-প্রতিপত্তি, ও দৃঢ়তা ছিল তিনি তা সর্বদা অপরের জন্য ব্যবহার করতেন।

ইংরেজি ভাষা পাঠ্য তালিকাভুক্তকরণ

১৪ শাবান ১৩১৭ হিজরিতে ব্যবস্থাপনা পরিষদে প্রথম বারের মতো মাওলানা শিবলী রহ. মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ হুঁশিয়ারপুরীর সমর্থনে এই প্রস্তাব পাস করা হয়, দারুল উলূমে ইংরেজি ভাষা পাঠদান শুরু হোক। ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে মাওলানা মুহাম্মদ আলী রহ. এর সিদ্ধান্ত পূর্বে গত হয়েছে। তিনি কেবল ইংরেজি শিক্ষার পক্ষেই ছিলেন না বরং এর দাবিদারও ছিলেন। কিন্তু তা হবে ধীরে ধীরে এবং এই সীমারেখার পূর্ণ অনুসরণ করে যে তা মূল পাঠ্যসূচিতে কোনরূপ বিচ্যুতির কারণ হবে না, এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো। পাশাপাশি এই প্রশ্নটিও উত্থাপিত হলো, ছাত্রদের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়, দীনী পাঠ্যপুস্তক পড়ায় তার সঙ্গে ইংরেজি পাঠ্যসূচি মিলিত হলে দরসিয়্যাতেরও কোন ক্ষতি সাধিত হবে না আবার ইংরেজি মাধ্যমিক স্তরের যোগ্যতাও অর্জন সম্ভব হবে তো? এটি একটি বিদঘুটে বিষয় যার কার্যকর সমাধান এতটা সহজ ছিল না যতটা সহজ চিন্তার জগতে। তাই সিদ্ধান্ত হলো, প্রথমে এর একটি রূপরেখা অথবা খসড়া বিন্যস্ত করা হোক। আগামী বৈঠকে এর ওপর পর্যালোচনা হবে।

নদওয়ার সপ্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় পাটনায়। মাওলানা আব্দুল হাই রহ, বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন। এই অধিবেশনে মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. ঘোষণা করেন, 'দারুল উলূম ইংরেজি পাঠদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু এর পাঠদান কিভাবে হবে এবং এর সিলেবাসই বা কী হবে? এই সিদ্ধান্ত এখনো গৃহীত হয়নি। আর যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট খসড়া উপস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়ে কিছু বলা সহজ বিষয় নয়।

এ আলোচনা থেকে বুঝে আসে, এক বছর পরও এর কোন পাঠ্যসূচি তৈরি করা সম্ভব হয়নি।

দারুল ইফতার কার্যক্রম বন্ধ

পহেলা রবিউস সানী ১৩১৮ হিজরি মোতাবেক ২৯ জুলাই ১৯০০ খৃস্টাব্দে পরিচালনা পরিষদ -যাদের মাঝে মাওলানা শিবলী রহ.ও অংশগ্রহণ করেছিলেন- মাওলানা মাসীহুয যামান খানের ভূমিকায় ও শিবলী রহ. সমর্থনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, 'যেহেতু অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম নিজের পক্ষ থেকেই ফতোয়া লেখার কাজ সম্পাদন করেন এবং কিছু বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান এই কাজের জন্যই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তাই দারুল ইফতার ব্যয়ভার পরিচালনা করার প্রয়োজন নেই।' এই বৈঠকে মাওলানা ফারুক চিরিয়াকুটীর ইস্তেফাপত্র পেশ করা

হলো। আর তাকে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীকে নতুন মুহতামিম নিয়োগ এবং তরবিয়্যাহ ও নেগরানীর (শিক্ষাদীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের) দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় মাওলানা আব্দুল লতীফ সাহেবের ওপর।

সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয় আযীমাবাদ-পাটনায়

পাটনায় বার্ষিক মাহফিলের আলোড়ন ছড়িয়ে পড়েছিল মূলত ১৩১৩ হিজরিতেই। কিন্তু এর বাস্তবরূপ দেয়ার সুযোগ এলো ওই সময়। শাহজাপুরের মাহফিলের পর মাওলানা রাশিদুল হক ইমাদী এই আওয়াজ আরো জোরালো করেন এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে লিখিত দাওয়াতনামা নদওয়াতুল উলামা পরিচালকের কাছে প্রেরণ করেন। যা গৃহীতও হয়। ওই দায়ী'দের নিষ্ঠা ও আগ্রহের পরিমাপ বুঝে আসে তাদের এই কর্মের মাধ্যমে যে, তারা বহিরাঞ্চলের মুসলমাদের নদওয়াতুল উলামার আলোয় উদ্ভাসিত করার লক্ষ্যে পূর্ণ প্রচেষ্টা ব্যয় করেন। তাদেরই চেষ্টায় মুজাফফরপুর, দরভাঙ্গ, মুঙ্গের ও ভাগলপুরে নদওয়াতুল উলামার শাখা প্রতিষ্ঠা হয়।

মাহফিলের বাণী চিত্র

এই মাহফিল বড় জাঁকজমকপূর্ণ হয় এবং সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়। এভাবে বললেও অত্যুক্তি হবে না, এই মাহফিলের তুলনায় নদওয়ার মাহফিল এক ধরনের সীমাবদ্ধ ও বিশেষ শ্রেণির মাহফিলের মর্যাদা রাখে। এই মাহফিলগুলো সাধারণ ওয়াজ মাহফিলের মতও হতো না, আবার আধুনিক কনফারেন্সের মতও হতো না। এতে প্রাচ্যের সভ্যতার সুন্দর-শোভন বিষয়গুলোর পাশাপাশি আধুনিক কালচারের উপকারী ও কল্যাণকর মাধ্যম ও উপকরণগুলো দৃষ্টিগোচর হতো। এ কারণেই মাহফিলের কল্যাণ বহুগুণে বেড়ে যেত। আর তা মুসলমানদের নবজীবন ও উদ্দীপনা সৃষ্টিতে এক শক্তিশালী ভূমিকা পালন করত।

এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে মুসলমানদের সকল শ্রেণির মানুষের গবেষক শ্রেণির ব্যক্তিদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ বন্ধন তৈরি হয়েছিল। উলামায়ে কেরাম, আইনবিদ, ব্যারিস্টার, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী সকলেই এতে আগ্রহে অংশগ্রহণ করতেন। এটা ছিল নদওয়াতুল উলামার এক বড় সাফল্য।

সাধারণভাবে সকল মুসলমানের মাঝে, বিশেষত আলেম সমাজের মাঝে আবেগ-অনুভূতি ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টিতে এবং নিজেদের মধ্যকার অনৈক্য দূরীকরণে নদওয়াতুল উলামা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তাতে এই সকল মাহফিলের বৈশিষ্ট্যগুলোর বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান।

সপ্তম বার্ষিক মাহফিলে অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় এমন বিবৃতি প্রদান করা হয়েছে, যার লিখনীচিত্র দৃষ্টিসীমায় সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। এখনও তা পড়লে আমাদের ভেতর এক নব উদ্দীপনা ও কাজের স্পৃহা সৃষ্টি করে :

অনুষ্ঠানস্থলের দিকে যে সকল সড়কের মিলন ছিল, সেগুলোর মোড়ে মোড়ে ফুল ও সবুজ পাতা দিয়ে সুসজ্জিত তোরণ নির্মাণ করা হয়েছিল। কোন গেইটে বড় বড় অক্ষরে 'নদওয়াতুল উলামার সপ্তম বার্ষিক অনুষ্ঠান' লেখা ছিল। আর কোনটিতে লেখা ছিল "مرحبا مرحبا"।

সভাস্থলের পাশে "دار الفكه" (ইসলামী হোটেল) খোলা হয়েছিল। যাতে চা, বিস্কুট, আমরোদ, সেব, আনার, আঙ্গুর, তাজা তাজা ফল পাওয়া যেত। এখান থেকে চার পাঁচ কদম সামনেই ছিল মাহফিলের জাঁকজমকপূর্ণ ভবন। যার মূল ফটকের উপর একটি খুব সুন্দর মিহরাব নির্মাণ করা হয়েছিল। তাতে সোনালী জরির হরফে লিপিবদ্ধ ছিল "سلام عليكم طبتم فادخلوها"। বামপাশে বাঙ্কিপুরের ছাপাখানা, যা মাহফিলের প্রতিটি অধিবেশন সম্পর্কিত তথ্যাবলী ছাপানোর কাজে নিয়োজিত ছিল। মাহফিলে ঢুকতেই নির্ধারিত ছিল ছোটদের বসার স্থান। যার সামনে লাল রঙের একটি সুঁতা বাঁধা ছিল। শিশুদের সামনে আনুমানিক পাঁচশ চেয়ার সাজানো ছিল। বাম দিকে মূল চত্বরের কাছেই এক ফিট উঁচু আরো একটি চত্বর ছিল। যার তিন পাশেই লাল রঙের (ফিতা দিয়ে) বেষ্টনি ছিল। আর গালিচার উপর বিছানো ছিল ইরানি কার্পেট।

এরপর তিনি লেখেন–

একটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ভারতের বিভিন্ন খ্যাতনামা পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিকগণ। তারা এসেছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকা, বাহার নিউজ ভাগলপুর, ওয়াকিল-ই-অমৃতসর, পাঞ্জাব অবজারভার প্রভৃতি পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে। সেসব খ্যাতিমান সাংবাদিক সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করছিলেন। [ইজলাসে শশম, পৃষ্ঠা : ০৬]

এসব অনুষ্ঠানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় কিছু বিষয়ও অনুপ্রবেশ করেছিল। শুধু আবশ্যকীয় বিষয়াবলীর মাঝে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে নদওয়াতুল উলামার অন্যান্য সভা সাধারণত অপ্রয়োজনীয় বিষয় থেকে মুক্ত থাকতো। এরপরও গুটিকতক বিরুদ্ধবাদী এই সূত্র ধরে নদওয়াতুল উলামার বদনাম রটিয়ে থাকে। অথচ এসব ধারণাপ্রসূত

ক্ষতির তুলনায় তার অসামান্য ফায়দা ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিঃসন্দেহে লক্ষণীয় ছিল।

এসব মজলিস উলামায়ে কেরাম ও আমজনতা, নবীন ও প্রবীন সকলের মাঝে দূরত্ব কমিয়ে আনার পাশাপাশি নদওয়ার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও চিন্তা-দর্শনের ভাষ্যকার হিসেবে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তা কোনোভাবেই অস্বীকার করার মতো নয়।

প্রথম মজলিস

১০ রজব সকালে প্রথম মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন মাওলানা আহমাদ হাসান কানপুরি। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মজলিসের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন মাওলানা শাহ সুলায়মান। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নকারীদের সম্বোধন করে তিনি বলেন–

'আল্লাহর শোকর, এই মজলিসে এবং আমাদের এই শহরে উভয়পক্ষের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ উপস্থিত আছেন এবং তাঁরা সবাই সবার বক্তব্য ও মতামত শুনতেও যথেষ্ঠ আগ্রহী। তাই আমার মতে, এখানে যুগ-যুগান্তরের সম্মেলন ঘটেছে এবং সেকাল ও একালের মানুষের মাঝে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। কবির ভাষায়–

للہ الحمد میان من او صلح فتاد

حوریاں رقص کناں نعرۂ مستانہ زدند

'শোকর খোদার, মিলন হইলো

আশেক মাশুকের মাঝ

হুরপরীরা নৃত্য করিছে

শুনিয়া সানাইয়ের আওয়াজ।'

এরপর মাওলানা শাহ সুলাইমান সাহেব এবং প্রদেশের নামকরা হাকিম আব্দুল হামিদ আজিমাবাদ এর নদওয়াতুল উলামার উন্নতি ও অগ্রগতি সম্বন্ধে লিখিত একটি দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করেন। মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব নদওয়াতুল উলামার বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন। মাওলানা শেরওয়ানি সাহেব নদওয়াতুল উলামা এবং এর গুরুত্ব প্রসঙ্গে স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ছাত্রদের পরীক্ষা

মজলিসে ব্যারিস্টার শরফুদ্দীন সাহেব (বাংকিপুর)-এর ইচ্ছায় নদওয়ার প্রথম দিকের কয়েকজন ছাত্রের পরীক্ষা নেয়া হয়, যারা এক দেড় বছর শিক্ষা গ্রহণের পর এ মজলিসে উপস্থিত হয়েছে।

এই মহতি মজলিসে সেসব নবীন শিক্ষার্থীরা যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছে, তা ছিল তাদের উন্নত মেধা এবং যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ।

দেখতে দেখতে এই মজলিস পরীক্ষার হলে পরিণত হলো। মজলিসের শুরুতে এক তালিবে ইলম কুরআনে কারীম থেকে তেলাওয়াত করে, তার তেলাওয়াত এতই শ্রুতিমধুর ছিল যে, পুরো মজলিসজুড়ে মারহাবা এবং নারায়ে তাকবিরের ঝড় উঠেছিল। এরপর সাইয়িদ শরফুদ্দীন সাহেব ছাত্রদেরকে ভগ্নাংশ বিশিষ্ট সংখ্যার একটি গুণ অংক করতে দেন। তখনকার পরিস্থিতিতে ভুলের সম্ভাবনা বেশি ছিল। কিন্তু অনুসন্ধানী কলম লেখে যে, 'ছাত্ররা তৎক্ষণাৎ চক-শ্লেট চালানো শুরু করলো। ঝটপট সবার অংক কষা শেষ। আর খোদার ফযলে সবার উত্তরই সঠিক হয়েছিল।

মজলিসে উপস্থিত সবাই ছাত্রদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। এরপর এখানেই শেষ হলো না। মাওলানা শাহ সুলাইমান সাহেব একটি উর্দু চিরকুট দিলেন, যা এই মজলিস সম্বন্ধে রচিত হয়েছিল। তিনি ছাত্রদেরকে সেটা আরবিতে ভাষান্তর করতে বলেন। সেখানে তখন ইবতেদায়ী (প্রাথমিক) স্তরের সাতজন ছাত্র উপস্থিত ছিল। তারাও তড়িৎগতিতে সে রচনাটি আরবিতে রূপান্তরিত করে দিল। অধিকাংশ ছাত্রের তরজমাই সুন্দর হয়েছিল।

মুহাম্মাদ খালেদ নামের এক ছাত্র স্বরচিত আরবি প্রবন্ধ পাঠ করে শোনায়। এটা সে নিজে লেখার পর কারো কাছে সংশোধনও করায় নি। এতে আরবি ক্রিয়াপদের সংযোগ-অব্যয় সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি থাকলেও সামগ্রিক বিচারে প্রবন্ধটি ছিল প্রশংসাযোগ্য।

বিকাল পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত জামে মসজিদে আম মজলিস অনুষ্ঠিত হয়; যা গঙ্গা নদীর উঁচু তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। মসজিদের আশপাশে অবস্থিত পুরানো ও বিরান বাড়িগুলো সাক্ষ্য দেয়, কোনো এক যুগে এটি একটি প্রসিদ্ধ দরসগাহ ছিল। একজন আলেম লিখেছেন, আল্লামা মহিবুল্লাহ বিহারী দীর্ঘদিন যাবত এই মাদরাসায় দরস দিয়েছেন। [রোয়েদাদ-ই-ইজলাস, পাটনা, পৃষ্ঠা : ২৪]

এই মসজিদটিও মাদরাসার সঙ্গে বিরান হয়ে গিয়েছিল, মাওলানা শাহ আমানাতুল্লাহ-এর প্রচেষ্টায় এটি পুনরায় আবাদ হয়। এর মনোমুগ্ধকর দৃশ্য সম্পর্কে রোয়েদাদ-লেখকের বর্ণনা।

'ঝাড়বাতির ঝলমলে আলোয় পুরো মসজিদ আলোকিত হয়ে থাকতো। রাতের পৃথিবীতে আলোর বিচ্ছুরণে সাগরের ঢেউয়ের মুহূর্ত ও গর্জনে, জলযানের অবিরাম যাতায়াত এবং বক্তাদের হেদায়েতমূলক ওয়াজ-নসিহতের মর্মভেদী আওয়াজে এমন এক অপার্থিব দৃশ্যের অবতারণা হতো যা কলমের ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।' [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৫]

দ্বিতীয় মজলিস

১১ রজব দ্বিতীয় মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে এবারও দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার তালিবে ইলম হাফেজ ওয়াজেদ আলী কুরআন তেলওয়াত করে। ওয়াজেদ এর এই শ্রুতিমধুর তেলাওয়াতে শ্রোতাদের মাঝে যেন ওয়াজদের হালত (আনন্দের আতিশয্যে আত্মহারা হওয়ার অবস্থা) সৃষ্টি হয়ে গেল। বেনারস-এর মহাজন হাফেজ মুহাম্মাদ আহসান সাহেব স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের গায়ের পশমী রুমাল ওয়াজেদ আলীর দিকে ছুঁড়ে দেন। এরপর চাঁদা তোলার সময় ওয়াজেদ আলী রুমালটি নদওয়ার তহবিলে জমা করে দেয়।

সাইয়িদ ফযলে হক আজাদ সে সময় অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন এবং মজলিসের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য তাতে তুলে ধরেন। তার কবিতার কয়েকটি পংক্তি–

زمانہ جس سے روشن، چشم بد دور ایسے منظر سے

فروغ رونق اسلام ہے ہر سو، جدھر دیکھو

وحید عصر دیکتائے زماں ہے فرد فرد اس کا

جسے دیکھو، اسے گنجینۂ علم وہنر دیکھو

جنید(رح) و شبلی (رح) و عطار (رح)، دیکھو یہ وہ مجمع ہے

جو سالک ہو تو اس حلقہ میں آجاؤ، خضر دیکھو

نکل آئیں نہ باہر پتلیاں مشتاق آنکھوں سے

غضب ہے دیکھنے والو، نہ اتنا لوٹ کر دیکھو

'যার আলোয় যুগ-যুগান্তর হলো আলোকিত
এমন দৃশ্যে কোনো কালিমা স্পর্শ না করুক
যে দিকে তাকাও, শুধুই দেখতে পাবে
ইসলামের আলো ঝলমলে অবয়ব
এর প্রত্যেক ব্যক্তিই যুগের এক একজন
ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ
যাকেই দেখো, সে-ই তো
এক একটি জ্ঞানভাণ্ডার
এখানে দেখতে পাবে
জুনাইদ, শিবলী ও আত্তারের সমাগম
খোদাকে পেতে চাও যদি, এখানে এসো
খিজির আ.-কেও এখানে পাবে
একটুখানি বাইরে এসে তো দেখো
নয়নের পুতুলিতে নাকি গচ্ছিত আছে
ক্রোধের দাবানল, হে দর্শক
একটু খানি চেয়ে তো দেখো।'

আজিমাবাদে নদওয়াতুল উলামার এই ঐতিহ্যবাহী মজলিসের জমকালো দৃশ্য এবং এখানকার অধিবাসীদের আগ্রহ-উদ্দীপনা ও জাগ্রত চেতনার বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন—

کنول دل کے کھلے، گل سے شگفتہ ہو گئے عارض
رخ احباب پر وہ رنگ اڑاتی فرحتیں آئیں
دلوں میں بہر استقبال دینی ولولے آئے
کمر باندھے، پئے مہماں نوازی ہمتیں آئیں

عرق افشانیاں کہتی ہیں نورانی جبینوں کی

حمیت کو حیا، مہر و وفا کو غیر تیں آئیں

عظیم آباد میں اے دوستو! ندوہ نہیں آیا

خدارا اوج پر اسلامیوں کی قسمتیں آئیں

'পদ্মপাঁপড়ির মতো হৃদয় আর
প্রস্ফুটিত পুষ্পের মতো অবয়ব
বন্ধুদের চিত্তে বিচ্ছুরিত হচ্ছে
বিচিত্র রঙের বাহার
হৃদয় কাননে বইছে দীন ইসলামের
আগমনী বাসন্তী সুবাতাস
মেজবানেরা নেমেছে সবাই কোমর বেঁধে
আপ্যায়নে সবাই উঠেছে মেতে
ঘাম ঝরানো পরিশ্রমী লোকেরা সেসব
দ্বীপ্তিময় ভাগ্যবান লোকদের বলে
দৃঢ় সংকল্পের প্রতিশ্রুতি আর
বিশ্বস্ততা ও ওয়াফাদারির আত্মমর্যাদা আগমন করেছে।
এই আজিমাবাদে হে বন্ধু!
নদওয়া তো আসে নি;
'কসম খোদার। মর্যাদার মুকুটধারী
ইসলামপন্থীদের ভাগ্য নির্ধারক এসে গেছে।'

এই মজলিসে ব্যারিস্টার সাইয়িদ শরফুদ্দীন সাহেব দীর্ঘ বক্তৃতা পেশ করেন। তিনি এমন ভাষায় দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার প্রশংসা করেন, যার দ্বারা সে যুগের সেই দারুল উলূম আমাদের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে। ভাবতে অবাক লাগে, মাত্র দেড় বছর সময়ে দারুল উলূম নদওয়া কীভাবে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের এত উঁচু মাকাম হাসিল করল, যা দেখে প্রত্যেক বিজ্ঞ ও বিশিষ্টজনেরাও বিস্মিত না হয়ে পারেন না। এইসব সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দারুল উলূম

নদওয়াকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, দারুল উলূম সে সময়ই এমন এক আকর্ষণ ক্ষমতা লাভ করেছিল যার ফলে সে এমন অভিজাত শ্রেণির ব্যক্তিবর্গকেও কাছে টেনে নিয়েছিল। সাইয়িদ শরফুদ্দীন বলেন– 'এক মাস যাবৎ আমি লাখনৌতে ছিলাম। দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা পরিদর্শন করলাম। লাখনৌ সফরের পূর্বে ভেবেছিলাম, সেটা কোনো জীর্ণ-শীর্ণ ঝুপড়ি-টুপড়ি হবে। কমপক্ষে তার ঘরবাড়িতে মলিনতার ছাপ তো অবশ্যই থাকবে। কিন্তু মাশাআল্লাহ! সেখানে গিয়ে দেখলাম, দশ হাজার ছাত্রের বসবাস উপযোগী এক বিরাট দালান ক্রয় করা হয়েছে। যাতে ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়া, পঠন-পাঠন এবং যাবতীয় সব কাজকর্মই সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা যায়।

ক্লাসরুম ও বোর্ডিং হাউস দেখলাম। এর দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন উলামায়ে কেরাম। ছাত্রাবাসের প্রতিটি কক্ষের দেয়ালে আলমারী লাগানো ছিল, যাতে ছাত্ররা নিজেদের বইপত্র আলাদা করে রাখতো। এক পাশে ছিল ঔষধপথ্য।

এই যে শিক্ষা-দীক্ষার এক বিশাল জগৎ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হক কথা হলো, এই আল্লাহ ওয়ালা আলেমগণ এখানে শুধু একটি দারুল উলূমই খোলেননি, বরং ইলমে দীনের একটা দাওয়াই তৈরি করে পানিতে মিশিয়ে ছাত্রদের খাইয়ে দিচ্ছেন। আমি এখানকার ছাত্রদেরকে সুস্থ-সবল ও প্রাণচঞ্চল দেখতে পেয়েছি। (পরিস্থিতির এই প্রতিকূলতায়) এটাকে কারামত ছাড়া আর কী বলা যায়? [রোয়েদাদ-ই-এজলাস পাটনা, পৃষ্ঠা- ৪৪]

সাইয়িদ শরফুদ্দীন তাঁর আলোচনায় মাদরাসার জন্য চাঁদা তোলার প্রতি উৎসাহিত করেন। তিনি এত জোশের সঙ্গে শ্রোতাদের উদ্বুদ্ধ করছিলেন যে, মাওলানা ওয়ারিস হাসান সাহেব (শিক্ষক মাদরাসায়ে ইসলামিয়া বেনারস) নিজের মাথার পাগড়ি যা ছিল মাওলানা হাজি এমদাদুল্লাহ রহ.-এর, পরবর্তীতে তাঁর এক মুরিদের মাধ্যমে মাওলানা ওয়ারিস সাহেব তা লাভ করেন। সেটি খুলে চাঁদার জন্য জমা করে দেন। ওদিকে মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানি তৎক্ষণাৎ পাগড়িটি পঞ্চাশ রুপি দিয়ে নিয়ে নেন। মুহূর্তের মধ্যে চারো দিকে চাঁদা প্রদানের ধুম পড়ে গেল। লোকেরা খুবই আগ্রহের সাথে দাতাদের তালিকায় নাম লেখাতে লাগলো। উদ্দীপনা ও উচ্ছ্বাসের এই তরঙ্গায়িত সরোবরে মাওলানা শাহ সুলাইমান ফুলওয়ারী (যাকে নদওয়ার জন্য নিবেদিত প্রাণ কর্মী বলা হতো) গলা ছেড়ে দিয়ে গেয়ে উঠলেন–

وقت آں آمد کہ من عریاں شدم

'এমনই লগন, মাতিলো ভূবন

মনে চায় যেন হায়

প্রেমাস্পদের চরণেতে মোর

সবকিছু দিয়া যাই।'

তবে সাইয়িদ শরফুদ্দীন যখন দেখলেন, মানুষেরা চাঁদা দেওয়ার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে আসে নি। তাই আর বেশি চেষ্টা করায় তেমন ফায়দা হবে না। তখন চাঁদা উঠানো বন্ধ করলেন।

এক তরুণ ব্যারিস্টারের বক্তৃতা

এরপর এক তরুণ আইনজীবী মৌলভী নাসিরুদ্দীন (বাংকিপুর) বক্তৃতা করছিলেন, সে দৃশ্য কিছুতেই ভোলার নয়। মজলিসের সবখানে কান্নার রোল পড়ে গিয়েছিল। সবাই ছিল অস্থির ও বেকারার। বক্তৃতার ভাষা ছিল খুবই সাদাসিধা। কিন্তু যে অকৃত্রিম আন্তরিকতার সাথে তিনি বলে যাচ্ছিলেন, তা হৃদয়ের গভীরে রেখাপাত করছিল।

انچہ از دل خیزد بر دل ریزد

'দিল থেকে বের হয় যা

দিলেই আঘাত করে তা।'

মাত্র কয়েকটি সরল সোজা কথা পুরো জলসাকে বেচাইন করে দিয়েছিল। সবাই যেন নিজেদের সবকিছু উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত! মজলিসের উপস্থিত আলেমদের কথা আর কী বলবো! তাদের রুমাল ছিল অশ্রুজলে সিক্ত। চোখ ছিল রক্তবর্ণ। অত্যাধিক কান্নাকাটির ফলে তাঁরা প্রায় আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। [রোয়েদাদ-ই-এজলাস পাটনা-৪৮]

তরুণ ব্যারিস্টার তাঁর বক্তৃতার পর নিজের হাতের মূল্যবান ঘড়িটি নদওয়ার চাঁদা তহবিলে জমা করে দেন।

তিনি ছিলেন আনসারী। 'বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'আমি সেই সব আনসারী সাহাবীদের সন্তান, যাঁরা দীনের জন্য নিজেদের জান-মাল অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। বক্তৃতা করার মাঝেই তিনি নিজের পরিহিত কোট এবং জ্যাকেট পর্যন্ত দিয়ে বললেন– 'ইসলামের মহব্বত ও ভালোবাসা কতটুকু বাকি আছে, তা বাস্তবে প্রমাণ করার জন্য এসেছি।'

তিনি আরো বলেন, 'অভাবের তাড়নায় আমাদের অভিভাবক উলামা হযরতের মাথা থেকে পাগড়ি নেমে যাবে আর আমরা দামি দামি পোশাক পরে থাকবো'?

এর কিছুক্ষণ পর তিনি বলেন, 'আমাদের অভিভাবকেরা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বের হবেন, আর আমরা চেয়ে চেয়ে দেখবো? ভাইসব! এখনো বুঝুন, এখনো জাগ্রত হোন। তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করে দিন। ইসলামের এই দানপত্রে দুহাত ভরে দান করুণ, যাতে আপনার পর আর কারো কাছে ধর্ণা দিতে না হয়। হায় আফসোস! আমরা তো দেশ জয়ের জন্য মদিনা থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে নয়। আমরা তো ইসলামের শান-শওকত এবং বিত্ত ও আভিজাত্য নিয়ে বেরিয়েছিলাম, ভিক্ষা করতে বের হইনি।'

আর যখন এই নওজোয়ান বললেন, 'আমাদের যেন এ দৃশ্য দেখতে না হয় যে, এই সব নূরানী চেহারার মানুষেরা আমাদের দারোয়ানের কাছে হাত পাতছে। আর তা আমাদেরই জন্য! তখন তো পুরো মজলিসে কান্নার রোল পড়ে গেল। কেউই স্থির থাকতে পারলো না। -রিপোর্ট লেখকের বক্তব্য

জুব্বা, পাগড়ি, হাতঘড়ি এবং টাকা-পয়সা যেন বৃষ্টির মতো বর্ষিত হতে লাগল। এক মহিয়সী বোন তো তাঁর নিজের পায়ের অলঙ্কার পর্যন্ত খুলে দিয়ে দিলেন!

এরপর মির্জা কামালুদ্দীন সানজার তেহরানি স্বরচিত ফার্সী কবিতা ইরানী ভঙ্গিতে আবৃত্তি করে শুনালেন। তাতে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার সাফল্য বর্ণনা করে তিনি বলেন-

خوشا بر حال ایں دانشوران ندوہ اے مردم

کہ دارایند جملہ دانش و عرفان و ایقاں را

نہ ہر کس دعویٰ دانش تواندر کرد در گیتی

سلیمانی نہ زیبد در جہاں البتہ دیواں را

الٰہی زندہ و خرسندہ ماند ناظم ندوہ

اسد ایں خدمت او با ہزاراں مجد پایاں را

'হে মানুষ! এই নদওয়ার জ্ঞানীদের

দেখে আনন্দিত হও

এদের সবাই ইলমের একেকটি ভাণ্ডার

তাঁদের মতো জ্ঞান-গরিমা

যার তার ভাগ্যে জোটে না

যেমন সুলাইমান আ.-এর রাজত্ব

সবার নসিবে হয় না।

হে আল্লাহ! এই নদওয়া যেন

চিরকাল থাকে সজীব ও সতেজ

তাঁদের খেদমতের মর্যাদা ও সম্মান

যেন বৃদ্ধি পায় হাজার গুণে।'

এরপর ব্যারিস্টার শাইখ আব্দুল কাদের লাহোরবাসীর পক্ষ থেকে বিহারবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বক্তব্য পেশ করেন। [যিনি পরবর্তীতে স্যার আব্দুল কাদের নামে প্রসিদ্ধ হন]

দ্বিতীয় মজলিসে আব্দুল কাদের সাহেব পাঠাগারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে সারগর্ভ আলোচনা করেন। ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলছিলেন–

'সেই সৎ সাহসী বীর সন্তানেরা কোথায়, যারা নিজেদের মাটিচাপা পড়া ইতিহাসকে খুঁড়ে বের করে আনবে? ইসলামের সেসব বিখ্যাত কালজয়ী মহাগ্রন্থ– যা মহামূল্য মণি-মুক্তার চেয়েও বেশি মূল্যবান– দুনিয়ার সামনে পেশ করবে? নিজেদের প্রাচীন কিতাবগুলোকে বিস্মৃতির আলমারি থেকে নামিয়ে এনে তার উপর জমে থাকা ধূলার আস্তর সাফ করে দেবে? সেসব মহামূল্যবান কিতাবের সঙ্গে তো আর মলাটের কোনো চিহ্ন নেই; অথচ সেগুলো উন্নতমানের মলাটে মলাটবদ্ধ হওয়া আমাদের পোশাক-পরিচ্ছেদ পরিধানের মতোই জরুরি ছিল। [রোয়েদাদ-ই এজলাস, পাটনা- ৫৮]

এই মজলিসের মাধ্যমে এই সহজ কথাটি সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, আলেম সমাজ ও সাধারণ শিক্ষিত প্রজন্মের মাঝে দূরত্ব ও ব্যবধান কেবল ভুল বোঝাবোঝির ফল। বাস্তবে শুধু বাহ্যিকভাবেই কিছু মতানৈক্য রয়েছে, উভয় শ্রেণির চিন্তা ও দর্শনের মাঝে কোনো বৈপরিত্য নেই। ভুল বোঝাবুঝি, ভুল শিক্ষা পদ্ধতি এবং পরিবেশ-প্রতিবেশ তাদের মাঝে এমন এক পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে, যার ফলে খুবই কাছের বস্তুকেও বহুদূরের বলে মনে হয়। এই পর্দা সরিয়ে ফেললেই দেখা যায়, উভয় শ্রেণির প্রত্যেকেই পরস্পরের কত নিকটে।

মজলিসে উপস্থিত উলামায়ে কেরাম, ব্যারিস্টার সাইয়িদ শরফুদ্দীন সাহেব, ব্যারিস্টার মৌলভী নাসিরুদ্দীন প্রমুখ এর বক্তব্যে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, উলামায়ে কেরাম সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত প্রজন্মের প্রতি কতটা দরাজ দিল এবং

এরাও আলেমগণের প্রতি কী পরিমাণ ভালোবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা লালন করেন, এ কথাটি মজলিসের প্রত্যেকে খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। শাইখ আব্দুল কাদেরও তার আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন–

বদ্ধ কপাট খুলে যেতে দেখেছেন, কিন্তু নামধারী ব্যক্তির মাঝে আত্মপ্রসাদের প্রভাব ছিল। কিন্তু সাহেব! কথা তো সোজা-সাপ্টাই। ঘটনা তো এই ছিল যে, গ্রহণ করার যোগ্যতা সেসব সমালোচিত ইংরেজি শিক্ষিত লোকদের মাঝে বিদ্যমান ছিল।

ওইসব বিশিষ্টজনদের মাঝে উলামায়ে কেরাম-এর যথোপযুক্ত, অকৃত্রিম আন্তরিকতাপূর্ণ এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী নসিহতমালা আবে হায়াতের মতো কাজ করেছে–

نمک زد شوخی اندر جان و تو کرد

جراحت ہا کہ در بنیاد بود ست

'প্রাণ সঞ্চারকে মৃতদেহে ফুঁকে দিল প্রাণ বায়ু

ফিরে এলো প্রাণ আর সতেজ হলো জখমিও।'

মোটকথা এই আবে হায়াত কার্যকারী হলো, পুরনো জখমও তাজা হলো। দিলের মাঝে দরদ পয়দা হলো, চোখও হলো অশ্রুসিক্ত। এখন তো দেখছি প্রিয়তমের মায়ায় ক'ফোঁটা খুনও ঝরে কী না! [প্রাগুক্ত]

এরপর মাওলানা শাহ মুহাম্মদ সুলাইমান সাহেব আলোচনা করেন এবং নদওয়াতুল উলামার শানে স্বরচিত আরবি কাসিদাও পাঠ করেন, যার প্রথম ক'টি পংক্তি এই–

لروض العلم قد عاد الشباب * واهل العلم طاب لهم مآب

الايا ندوة العلماء طرا * لنت من شأنك العجب العجاب

لأنك قد دعوت المسلمينا * لنشر العلم فيهم فاستجابوا

وكان الجهل متسع الفيافى * ووجه العلم كان له النقاب

'নিশ্চয়ই ইলমে দীনের বাগিচায় ফের

যৌবনের সুবাতাস বইতে শুরু করেছে

আহলে ইলমের জন্য প্রস্তুত হয়েছে
খুব সুরত এক শানদার মসনদ
হে নদওয়াতুল উলামা!
তোমার আজব শান দেখে তো আমরা বিস্মিত
কারণ, তুমি তো মুসলিমদের আহ্বান করেছো
তাদের মাঝে ইলমের সৌরভ ছড়িয়ে দিতে
আর মুসলিমরাও দাঁড়িয়ে গেছে লাব্বাইক বলে
অথচ জাহালাতের আঁধারে দিগন্ত ছেড়ে গিয়েছিল
আর ইলমের অবয়ব অবগুণ্ঠিত ছিল নেকাবে।'

দ্বিতীয় বক্তৃতার পর জোরেশোরে চাঁদা তোলা শুরু হলো। সে সময় যার কাছে যা ছিল সব নদওয়ার তহবিলে দিয়ে দিল। এমন কী এক গরিব লোকের কাছে ছিল মাত্র দু'টি পয়সা, সেটুকুই নদওয়ার হাওয়ালা করে দিল। এছাড়াও মোটা অঙ্কের অনুদানও সংগৃহীত হয়েছিল।

আধুনিক শিক্ষিতদের শ্রদ্ধানিবেদন

চতুর্থ বৈঠকে বাংকিপুরের ভলন্টিয়ার ম্যানেজার জনাব আবুল খায়ের মুহাম্মাদ ইসহাক সাহেব সাধারণ শিক্ষিত ছাত্রদের পক্ষ থেকে নদওয়াতুল উলামার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তাঁদের প্রতি নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

'আমরা সর্বদা পার্থিব জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত থাকি, তবুও উলামায়ে কেরাম নিজেদের সচ্চরিত্রের গুণে বরাবরই আমাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণে এবং আমাদের সঠিক নির্দেশনা দানে বিন্দুমাত্র কসুর করেন না। আমরা তো তাঁদেরই অনুগত খাদেম মাত্র। আমরা যতই তাঁদের খেদমত করি, [তাঁদের বিরাট অনুগ্রহের তুলনায়] বাস্তবে তা সামান্যই হবে।'

ব্যারিস্টার সাইয়িদ শরফুদ্দীন সাহেবের বক্তৃতাও এই বিষয়ে ছিল যে, সাধারণ শিক্ষিতরা উলামা হযরতের সঙ্গে এবং উলামা হযরত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা কতটা আবশ্যক। তিনি এই শ্রেণির লোকদের দুর্বল দিকগুলো এক এক করে তুলে ধরেন এবং বলেন, 'এদের প্রতি উলামায়ে কেরামের অনাগ্রহ সৃষ্টির কারণ এগুলোই।'

বক্তৃতার শেষে তিনি উলামায়ে কেরামের রাহনুমায়ী ও পথ নির্দেশনা চেয়ে বলেন–

'আপনারাই আমাদের জীবনতরীর মাঝি! আমাদেরকে সাগরজলে ডুবিয়ে দিতে পারেন আবার নিরাপদে তীরেও পৌঁছে দিতে পারেন।'

হাজি মুহাম্মদ নুরুর রহমান সাহেব ছদরে আঞ্জুমান-এর অনুমতি নিয়ে এক তেজোদীপ্ত কাসিদা পাঠ করেন। তিনি এতে বিরুদ্ধবাদীদের কিছু নিন্দা করেন। তাই ছদরে আঞ্জুমান তাকে কবিতা আবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করেন। মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই সাহেব বলেন, 'এসব কথাবার্তা আমাদের কাম্য নয়, আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা যা খুশি বলুক। আমরা তাদের কথা শুনতেও চাই না, জবাবও দিতে চাই না। [প্রাগুক্ত, রোয়েদাদ-এ]

হাজী এমদাদুল্লাহ্ রহ.-এর ওফাতে শোক প্রকাশ

শেষ মজলিসে হযরত মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ রহ. এবং মাওলানা মুহাম্মাদ নাঈম ফিরিঙ্গি মহল্লি রহ.-এর ওফাতে শোক প্রকাশ করা হয়। নদওয়াতুল উলামার সঙ্গে হযরত হাজী সাহেবের যে ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তাঁর কাছ থেকে নদওয়া যে পরিমাণ ফায়দা হাসিল করেছিল তা অকপটে স্বীকার করা হয়। মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব বিগত বছরের রিপোর্ট লিখতে গিয়ে এ সম্পর্কে বলেন–

'তিনি ছিলেন ভারত বর্ষের উলামা-মাশায়েখ-এর শিরোমণি এবং একই সঙ্গে নদওয়াতুল উলামা'র মুরুব্বি ও মুর্শিদ। তিনি এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত অত্যন্ত আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সঙ্গে-এর জন্য কল্যাণকর বিষয়াবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। তিনি সবসময় নদওয়ার খবরাখবর পাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। যদি কখনো তাঁর কাছে নদওয়ার চিঠি পৌঁছতে দেরি হতো, তিনি নিজেই নদওয়াকে চিঠি লিখে পাঠাতেন। এ থেকেই বোঝা যায়, নদওয়ার সঙ্গে তার কত গভীর সম্পর্ক ছিল!'

সবশেষে মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানি নদওয়াতুল উলামার পক্ষ থেকে মজলিসের আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন–

'আজিমাবাদের সম্মানিত অধিবাসীগণ! যে বেদনাদায়ক মুহূর্ত আসার আশঙ্কা ছিল। যে হৃদয়বিদারক পরিস্থিতি পয়দা হওয়ার আন্দিশা ছিল, তা এসে গেছে। আমাদের এই মিলনমেলার বিদায় ঘণ্টা বেজে উঠেছে অথচ আমাদের দিলে এর মহাব্বত এখনো তাজা রয়েছে। আমাকে বলে দেওয়া হয়েছে যেন আপনাদের

শুকরিয়া জানাই। আমি তো নদওয়ার শুরু থেকেই এর খাদেমদের মাঝে শামিল আছি।

তাই সেই যাত্রা শুরুর দিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত লাখনৌতে যত সভা-সমাবেশ হয়েছে, সবগুলোতেই আমি শরিক ছিলাম। নদওয়ার সভা ছাড়াও অন্যান্য সংস্থার সভা-সমিতিতে আমি অংশ নিয়েছি। বহু শিক্ষামূলক সম্মেলন দেখেছি। এ জন্য এ জাতীয় সভা-সমাবেশ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা একেবারে কম নয়। কোনো রকম লৌকিকতা ছাড়াই বলছি, 'আজ আমার অন্তরে আনন্দের যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে, তা আর কোনো দিন হয়নি। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১০১]

সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। শ্রোতাদের চোখে বিদায়ের অশ্রু। বহুকালের আত্মার বন্ধন যেন আজ টুটে যাচ্ছে।

دم رخصت زباں تو کھل نہ سکی

دل باتیں ہو گئیں نگاہوں میں

'ব্যথাতুর হৃদয় ভেঙ্গে চুর চুর হয়ে যাচ্ছে

মুখে কথা নেই, সব বিরহ জমা হয়েছে চোখের তারায়।'

দারুল উলূম সম্পর্কে মাওলানা রহ.– একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি

মাওলানা তখন দরভাঙ্গা এলাকায় ছিলেন। হজ্বে যাবার ইচ্ছা ছিল। তবে একথা তিনি গোপন রাখতে চাচ্ছিলেন। এই চিঠির শেষে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন–

'সম্ভবত চার-পাঁচ দিন পর মুঙ্গের এ যাবো, তারপর কানপুর এ যাওয়ার ইচ্ছা, তারপর অন্য কোথাও।'

মাওলানা সাহেব তাঁর অনুপস্থিতিতে নদওয়াতুল উলামা কীভাবে চলবে এ নিয়ে ফিকির করেছেন। সে সময় নদওয়া যে পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিল, তাতে এর প্রতিটি শাখার তত্ত্বাবধান অত্যন্ত দূরদর্শিতা, ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে করা অপরিহার্য ছিল। সেই সঙ্গে নদওয়ার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিপরীত কোনো বিষয়ের অবতারণা যাতে না ঘটে এ ব্যাপারেও সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা আবশ্যক ছিল। এ কারণেই এ গুরুদায়িত্ব অর্পণের জন্য তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল, মাওলানা আব্দুল লতিফ এবং মাওলানা আব্দুল হাই সাহেবের প্রতি। ২৮ রজব ১৪১৮ হিজরীতে তিনি উভয়ের নামে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। যাতে এসব শাখা-প্রশাখাগত বিষয়াবলীর ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। এ

চিঠিটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ– এতে মাওলানার চিন্তা ও দর্শন যেভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অন্য কোনো চিঠিতে তা দেখা যায়নি। ত্রিশ পৃষ্ঠার এ সুদীর্ঘ চিঠি যাকে একটি পুস্তিকা বলাই সমীচীন। যা ছিল দারুল উলূমের ভবিষ্যত কার্যপ্রণালীর বিশদ বিবরণ। এতে তিনি নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা, অভিজ্ঞতা, সচেতনতা, সাংস্কৃতিক মনোবৃত্তি, চিন্তা-দর্শন, একনিষ্ঠতা, নদওয়ার প্রতি তাঁর মহব্বত ও তড়প এবং ভালোবাসা ও ব্যাকুলতা এবং মনের গহীনে লুক্কায়িত সব আবেগ-উচ্ছ্বাসের এমন সম্মিলন ঘটিয়েছেন যে, তার প্রতিটি নির্দেশনার মাঝে নিহিত বহুমুখী উপকারিতা এবং অবশ্যম্ভাবী কল্যাণ তার বক্তব্যের অকৃত্রিমতা ও সরলতার মতোই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানসপটে এক অসাধারণ চিন্তার রেখাপাত ঘটে।

তাঁর এই চিঠির সতেরোটি মূল্যবান নির্দেশনার মাঝে চারটি বিষয়ে তিনি অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন–

এক. পার্থিব ও বৈষয়িক কাজকর্মের প্রতিও গভীরভাবে লক্ষ্য রাখা এবং এ সম্পর্কে কার্যকর জ্ঞান রাখা, যা একজন সফল ও অভিজ্ঞ নেতৃত্বের জন্য আবশ্যক।

দুই. বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা।

তিন. ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও যথাযথ মূল্যায়নের যোগ্যতা।

চার. কুরআনের ইলম এবং আরবি সাহিত্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান।

শুধু নেসাব ও সিলেবাস, শিক্ষাপদ্ধতি ও দাপ্তরিক বিষয়াবলী নিয়েই নয়, নদওয়ার জন্য নতুন স্থাপনা নির্মাণ বিষয়েও তিনি যথেষ্ঠ নির্দেশনা প্রদান করেছেন। যার মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। একই সাথে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশস্ততারও পরিচয় পাওয়া যায়। চিঠির এক জায়গায় তিনি লেখেন–

'জানি না নির্মাণ সংক্রান্ত কাজকর্মের কী অবস্থা। মৌলভী আব্দুল হামিদ সাহেব যদি পূর্ণ মনোযোগসহ পর্যবেক্ষণে থাকেন এবং এতে দিনের সবটুকু সময় ব্যয় করেন তো ভালো, নয়তো হাকিম সাহেবকে এই দায়িত্ব দিতে হবে। তিনি এ বিষয়ে যেমন ভালো জ্ঞান রাখেন তেমন আগ্রহীও। মুন্সি জহিরুদ্দীন সাহেবও সবসময় কাজকর্ম দেখাশোনা করবেন। খেয়াল রাখতে হবে, মাঝের কামরাটি যেন ওই সময় নির্মাণ করা হয়। এর পূর্ব দিকে একটি দরজা হবে, সে দেয়ালে পূর্ব দিকের মুখোমুখি স্থানটুকু আলমারীর জন্য রাখা হবে এবং ভিতরের দিকটা

পরিষ্কার থাকবে। এটা নির্মাণের সময় যেন ভালোভাবে খেয়াল রাখা হয়। টাকা-পয়সা যেন অযথা নষ্ট না হয়। ওভারসিয়ার যিনি মুসলমান তার সাথে কোনো এক সময় ডেকে এনে পরামর্শ করতে হবে।

দারুল উলূমের সিলমোহর সম্বন্ধে শুধু বিস্তারিত বলেই ক্ষান্ত হননি, চিঠিতে সিলের নকশাও একে দিয়েছেন। সনদ বা সার্টিফিকেটের বিষয়ে তিনি বলেন– 'সনদের জন্য উন্নত মানের কাগজে সুন্দর নকশা করে ছাত্রদের বোধগম্য ভাষায় লিখবে এবং ছাপাবে। খেয়াল রাখতে হবে, সনদের ভাষা যেন সহজবোধ্য হয়, দুর্বোধ্য না হয়। ছাত্ররা যাতে বুঝতে পারে। সনদের ভাষা যেন তালিবে ইলমের সত্যিকার যোগ্যতা প্রকাশক হয়। নয়তো এ সনদ শুধু কাগজ কলমেই সনদ রয়ে যাবে।

ইলমের সঙ্গে দীনদারী ও সচ্চরিত্রের আবশ্যকতা

চিঠিতে দ্বিতীয়ত যে বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় তা হলো, মাওলানার দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা। তাঁর মতে নিছক ইলমে দীন অর্জনেই যথেষ্ট নয়; বরং দীনদারী এবং সচ্চরিত্র অর্জনও অত্যাবশ্যক। শিক্ষক নির্বাচনে তিনি বিশেষভাবে কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন এবং কয়েকজনের নাম নিয়ে সুপারিশও করেছেন। তবে সবক্ষেত্রেই তিনি লক্ষ্য রেখেছেন যাতে ইলমে দীনের সঙ্গে দীনদারী ও উত্তম চরিত্রের সমন্বয় ঘটে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল চিঠির প্রাপক যেন এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা পেতে পারেন।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, তাঁর চিঠিতে কোনো রকম নিন্দা, সমালোচনা, কিংবা কারো প্রতি আঘাত করে বলা কোনো কথাই ছিল না। তিনি চিঠির এক স্থানে বলেন– শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। আমার মনে হয় মৌলভী সাইফুর রহমান এ দায়িত্ব পাবার উপযুক্ত। তিনি যোগ্য দীনদার, পরহেজগার, সচ্চরিত্রবান এবং সুস্থচিন্তার অধিকারী। একাধিকবার তিনি মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা লুৎফুল্লাহ সাহেবের কাছেই তিনি অধিকাংশ কিতাব পড়েছেন। মাওলানা রশিদ আহমাদ সাহেবের কাছে দুই বছর থেকে হাদিস পড়েছেন।

অন্য এক ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, কী ধরনের দায়িত্বের জন্য কেমন ব্যক্তি তিনি পছন্দ করতেন। তিনি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করেন– 'তিনি সৎ, সহনশীল, বুদ্ধিমান এবং আধুনিক মনস্ক ব্যক্তি। তাঁকে এখন পরিচালনা বিষয়ের পরামর্শ কমিটিতে রাখা উচিত।

শারীরিক সুস্থতা এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ

মাওলানা তার চিঠির ছত্রে ছত্রে তালিবে ইলমদের দীনদারী ও সচ্চরিত্রের বিষয়টি লক্ষ্য রাখার জন্য জোর তাকিদ দিয়েছেন। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলোঃ শুধু একটি বিষয়েই দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ রাখা যথেষ্ট নয়। বরং এসব গুণাবলী অর্জন করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করাও অপরিহার্য। এ বিষয়টি অনুধাবন করেই মাওলানা লিখেছেন– 'তালিবে ইলমদের সুস্বাস্থ্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখবেন। শারীরিক সুস্থতা ও কর্মশক্তি যদি না থাকে, তো ইলমের জন্য তারা মেহনত করবে কীভাবে? এতে আপনারা কোনো লজ্জাবোধ করবেন না। পরামর্শক্রমে এর কোনো ভালো ব্যবস্থা করবেন।'

এরপর তিনি লেখেন–

'সবসময় তাদের উপর এমনভাবে চড়াও হয়ে থাকবেন না, যাতে তাদের মেধা বিকশিত হতে বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। মোটকথা, তারা যেন এমন অশিষ্ট ও বেআদব না হয়ে যায়, যেমন হয়ে থাকে স্কুলের ছাত্ররা, যারা বড়দেরকে কিছুই মনে করে না; আবার এমন ভীরু-কাপুরুষও না হয়ে যায়, যাতে স্বাভাবিক প্রাণচঞ্চলতা ও কর্মোদ্যম বিনষ্ট হয়ে যায়। খেয়াল রাখতে হবে, তারা যেন সভ্য-শিষ্ট ও প্রাণোচ্ছ্বল থাকে।

জীবনের পাঁচটি উপাদান

আসল কথা হলো যতক্ষণ পর্যন্ত দীনদারী, ইলমে দীন, সচ্চরিত্র, সুস্থতা এবং বিকশিত মেধা-মনন এ পাঁচটি উপাদান জীবনের সঙ্গে যুক্ত না হবে ততক্ষণ জীবন তার নিজস্ব গতিময়তায় আলোকজ্জ্বল রাজপথে উঠে আসতে পারবে না। সে জীবনের মাঝে অন্য জীবনকে প্রভাবিত করা এবং অনুগত করার যোগ্যতা সৃষ্টি হবে না। মেধা-মননের সুস্থতা বুঝতে মাওলানা যে শব্দটি ব্যবহার করছেন (বা বিকাশ)। আমার মনে হয়, এ অর্থ প্রকাশের জন্য এ শব্দটির চেয়ে উপযুক্ত কোনো শব্দ পাওয়া দুষ্কর হবে। এটা মাওলানার সুস্থ চিন্তাশক্তি ও ভাবপ্রকাশের সৌন্দর্যের প্রমাণ বহন করে।

উর্দু সাহিত্য

মাওলানা সাহেবের চিন্তাজগত থেকে উর্দু সাহিত্যের কথাটিও বাদ যায়নি। চিঠির এক জায়গায় তিনি বলেন– বর্তমানে যে রীতিতে সাহিত্য রচিত হচ্ছে তা তালিবুল ইলমদের দেখার নির্দেশ দিবেন। উর্দু ভাষারীতির রচনা ও প্রবন্ধ লেখার অনুশীলন করাবেন। যদি এতে তাদের ভুলক্রুটি শুধরে নাও দেন তবুও এক

সময়ে তারা নিজেরাই অন্যদের অনুশীলন করানোর যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে।'

বক্তৃতা ও ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন– 'প্রতিমাসে কমপক্ষে দুই বার তাদেরকে দিয়ে বক্তৃতা করাতে হবে। বক্তৃতার সময় আপনারা কাগজ-কলম নিয়ে বসে যাবেন। তাদের ভুলগুলো কাগজে লিখে নিবেন। যখন একজনের বক্তৃতা শেষ হবে কিংবা সবার বক্তৃতা শেষ হবে তখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে যে ছাত্র যতটুকু প্রশংসার হকদার, ততটুকু প্রশংসা করে এবং যার যে ভুল হয়েছে সেগুলো উল্লেখ করে সংশোধন করে দিবেন। এই পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়া শুধু বক্তৃতা করানোতে ফায়দা খুব সামান্যই। আরেকটি বিষয়– ছাত্রদের উচ্চস্বরে বক্তৃতা করতে নির্দেশ দিবেন। যদি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করে শোনায় তবে যেন মুখস্থ পড়ার মতো আটকে যাওয়া ছাড়াই শোনায়। এ ব্যাপারে জোর তাকিদ দিবেন।'

ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তাধারা এবং যথাযোগ্য মূল্যায়ন

পুরো চিঠি জুড়ে ইনসাফপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে। আরবি সাহিত্যের গুরুত্ব মাওলানার অন্তরে সর্বদা জাগ্রত ছিল। তিনি নিজের সহকর্মী ও অধঃস্তন ব্যক্তিবর্গকে একাধিকবার জোর দিয়ে বলেছেন– 'যেন তারা উর্দু ভাষায় আরবি ভাষার জটিল শব্দ এবং দুর্বোধ্য বাক্যরীতি ব্যবহার করা পরিহার করেন। যেন এমন সহজ-সরল রীতি অবলম্বন করেন, যা হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং মনের গভীরে রেখাপাত করে। একই সঙ্গে তিনি সুন্দর হস্তাক্ষর এবং বিশুদ্ধ লেখ্যরীতি অনুসরণের ব্যাপারেও যথেষ্ট তাকিদ দিয়েছেন।'

এ সব বিষয়ের মাঝে একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো মাওলানা সাহেব চিঠিতে খুবই মাপজোখ করে শব্দ ব্যবহার করেছেন। যে বিষয় যতটুকু গুরুত্ববহ তাকে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণ করার প্রবণতা এতে অনুপস্থিত। তিনি ওইসব চতুর, ধীমান ও একরোখা লোকদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, যারা যে বিষয়ের পক্ষে কথা বলতে অবতীর্ণ হয়, তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করে, আর অন্যান্য বিষয়কে থোড়াই কেয়ার করে। এর অনিবার্য ফল এই যে, তারা কোনো এক বিষয়ে সমস্ত চিন্তাশক্তি ও মেধা ব্যয় করে তাতে শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করে বটে, কিন্তু এর বাইরের বিষয়গুলিতে যদিও সেগুলো এর চেয়ে বহুগুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়, একদম বকলম থেকে যায়। সেক্ষেত্রে তাদের মেধা ও যোগ্যতা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। মাওলানা সাহেব তার ইনসাফপূর্ণ বিবেচনাবোধ, সুস্থ মননশীলতা এবং পূর্ণ মানবিক গুণ দ্বারা চেষ্টা করেছেন, যেন কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও

বাদ না পড়ে যায় এবং কোনো রকম সংকীর্ণতা সীমাতিরিক্ত উদারতা, বাড়াবাড়ি কিংবা ছাড়াছাড়ি ব্যতীতই প্রতিটি বিষয়ের হক আদায় করা যায়।

কুরআনের ইলম ও আরবি সাহিত্য

দীনীয়াত এবং কুরআন মজিদের গুরুত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন– 'প্রাথমিক স্তরের তালিবে ইলমদের ক্ষেত্রে দীনীয়াত বিষয়ে খুব খেয়াল রাখবেন। পাঠ্যক্রমে এ বিষয়ের উপযুক্ত কিতাব রাখতে হবে। আকিদা-বিশ্বাসের বিষয়গুলো ভালোভাবে তালিম দিতে হবে। তবে তা হবে এভাবে যাতে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হয়। 'কুরআন মাজিদ'–এর প্রতি খুব বেশি লক্ষ্য রাখতে হবে। এত গুরুত্ব দিতে হবে যাতে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রদেরও কুরআনের তরজমা করতে বেগ পেতে না হয়। কুরআন শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক–

এক. মুফাসসিরগণের রীতি অনুযায়ী কুরআনের কোনো আয়াত নসখ বা রহিত হয়ে যাবার বিষয়ে জোর না দেওয়া উচিত। যতদূর সম্ভব কুরআনের আয়াতের উপর নসখ হওয়ার হুকুম দেওয়া পরিহার করতে হবে। আল ইতকান কিতাবে বিশটি আয়াত এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. তিনটি বা পাঁচটি আয়াত মনসুখ হওয়ার কথা বলেছেন। আর সিদ্দিক হাসান খান তাঁর ইফাদাতুশ শুয়ুখ গ্রন্থে বিষয়টি নিয়ে ভালোভাবে আলোচনা করেছেন।

দুই. কুরআন মাজীদের অর্থ বয়ান করার ক্ষেত্রে ভালোভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কুরআন মাজিদের শব্দ থেকে এ পরিমাণ অর্থ বোঝা যাচ্ছে এবং এ পরিমাণ অর্থ মুফাসসিরগণ হাদিস বা আছার এর ভিত্তিতে বৃদ্ধি করেছেন। অধিকাংশ সময়ই এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। কুরআনের শব্দ বহির্ভূত অর্থ এত বেশি প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছে যে, বেপরোয়াভাবে সেগুলো কুরআনের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া হচ্ছে। গভীরভাবে লক্ষ্য করার পর বোঝা যায় যে, এ অর্থটুকু সরাসরি কুরআনের নয়।

তিন. কুরআনের সমস্ত শব্দই যদি একাধিক অর্থ বিশিষ্ট হয়, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এ নিয়ে আপনি নিজে আগে চিন্তা করে দেখুন এবং এরপর এ বিষয়ে তালিবে ইলমদের সচেতন করতে থাকুন। সেই সঙ্গে যে অর্থ কুরআন থেকে সরাসির বুঝা যায়, ব্যাখ্যানির্ভর এবং আপত্তিকর না হয়, এমন অর্থই তাদের শেখাবেন। উদাহরণস্বরূপ–

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ.

এবং

نَسُوْاللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ.

আয়াত দুটি। এখানে مكر এবং انسا এর কয়েকটি অর্থ আছে।

এমন অর্থও আছে (যা এ মুহূর্তে আমার মনে আসছে না) যে অর্থ আল্লাহ তাআলার দিকে সম্বন্ধ করলে কোনো রকম আপত্তি সৃষ্টি হয় না।

ব্যাখ্যা করা ছাড়াই এই অর্থ পাওয়া যায়। এ ধরনের অর্থ আরবি ভাষায় প্রচলিত ব্যবহারে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। মৌলভী মুহাম্মাদ ফারুক সাহেবের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করে নেবেন।

কুরআন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য বিশেষ পুরস্কার

চিঠির আরেক স্থানে মাওলানা সাহেব ছাত্রদের পুরস্কার প্রদান প্রসঙ্গে বলেন–

'বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্ররা বক্তৃতা করবে। যারা ভালো করবে তাদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে কুরআন মজিদ এবং ফিকাহ বিষয়ক বক্তৃতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। এর জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ইলমে তাজবিদ এর বিষয়েও তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেন– 'কেরাআতের প্রতি বিশেষ নজর রাখবেন। আপনারা খেয়াল করেছেন কী না জানি না। হাফেজ ওয়াজেদ আলীর তেলাওয়াতে কী বিরাট প্রভাব পুরো মজলিসে ছড়িয়ে পড়েছিল। [হাফেজ ওয়াজেদ আলী নদওয়ার একজন ছাত্র...]

যদি আপনারা এই এক হাফেজকে দিয়ে প্রতি বছর তেলাওয়াত করান তবে এর একটা কুপ্রভাব সৃষ্টি হবে। সারকথা, এর মতো আরো হওয়া চাই।

প্রথম থেকেই আরবি সাহিত্যে গভীর জ্ঞান অর্জন এবং এ ভাষায় লেখালেখি ও বক্তৃতার ব্যাপারে মাওলানার বিশেষ নজর ছিল। এ চিঠিতে একজন শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেন–

'এ ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। তিনি খুবই অল্প সময়ে ছাত্রদের আরবি কথাবার্তা এবং কুরআনের তরজমা করা শিখিয়েছিলেন।'

একস্থানে তিনি লেখেন–

'তালিবে ইলমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনী অবশ্যই মুখস্থ রাখবে। পরিশেষে কলমকে আপন গতিতে ছেড়ে দেন। 'এই কাজ

(নদওয়াতুল উলামা) আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে চালু হয়েছে এবং এর সঙ্গে আমার নাম যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এখন যতই চাই যে, এর খেদমতে জানপ্রাণ সঁপে দিয়ে নদওয়াতুল উলামা ও দারুল উলূমকে পরিচালনা করে দেখাবো এবং এ কাজে প্রাণ উৎসর্গ করে দেব কিন্তু শারীরিক দুর্বলতা এবং হিম্মতের কমতি এর পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিনের শূন্যঘরে একটি কথাই প্রতিধ্বনি হচ্ছে–

مردے از غیب بروں آید وکارے بکند

'অদৃশ্যের পর্দা ছিঁড়ে
আসবে শেষে কেউ
হাল ধরবে ভাঙ্গা নায়ের
তুলবে আবার ঢেউ।'

আল্লাহর হাজার শোকর, আমার মন বলে, মৌলভী আব্দুল হাই সাহেব এবং আপনিই সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি হবেন, যাঁদের মাধ্যমে বিরাট খেদমত হওয়ার আশা করছি। আল্লাহ তাআলা আপনাদের হায়াতে তারাক্কি ও বরকত দান করুন।'

এরপর লেখেন– এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, হয় তো আল্লাহ তাআলা আপনাদের হাতে এই কিস্তিকে তীরে পৌঁছাবেন এবং এই মহাসাফল্যের কীর্তিগাঁথা আপনাদের জীবনীতে লেখা হবে। [মাজমুয়ায়ে খুতুতে কালামী]

মাওলানার প্রথম হজ্জের সফর

ছোটবেলা থেকেই মাওলানা হজ্বে বাইতুল্লাহর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। জীবনের প্রথম দিকে একবার বাড়ি-ঘর বিক্রি করে হজ্বে যাবার জন্য কাফেলায় শরিক হয়ে যান। কিন্তু–

عاشق صبر طلب اور تمنا بیتاب

'আশেক সে তো ইশকের আগুনে
পুড়ে হয় ছারখার
মাশুকের পথে চেয়েই না দিল তার।'

তাই সেবার এই আশা অপূর্ণই রয়ে গেল। হয়তো এর মাঝে আল্লাহ তাআলা কোনো কল্যাণ নিহিত রেখেছিলেন।

মাওলানা সাহেব ১৫ শাবান ১৩১৮ হিজরীতে কানপুর থেকে মুঙ্গের এ পৌঁছান। এক মাসের মতো সেখানে অবস্থান করেন। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন তাঁর একজন খাদেম আব্দুস সামি, মাওলানা বাশারত হুসাইন দরভাঙ্গারী, মাওলানা নূর মুহাম্মাদ পাঞ্জাবী এবং মাওলানা গোলাম হুসাইন।

পাথেয় শুধুই তাওয়াক্কুল

১১ রমযান ১৩১৮ হিজরীতে মুঙ্গের থেকে রওনা হন। তাঁদের এ আজব সফরের সঙ্গীসাথী ছিলেন মোট পাঁচজন। আর রাহা খরচা ছিল মাত্র চল্লিশ রুপি। তাঁদের সফরের কথা আর কেউ জানত না। এদিকে এক দুঃসংবাদ এসে হাজির! কেউ একজন খবর দিল যে, এ বছর কালেক্টর সাহেবের পক্ষ থেকে হজ্বে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে। কিন্তু এসব বাঁধা বিপত্তির কোনো পরোয়া না করে সফরের সিদ্ধান্তেই তাঁরা অটল থাকলেন।

'কামালাত' গ্রন্থকার বলেন–

একজন চট্টগ্রাম থেকে এসেছিল, তিনি তাঁদের অবস্থা জানতে পেরে বললেন, 'আমারও এবার হজ্বে যাবার এরাদা ছিল। এজন্যে চট্টগ্রামে গিয়েছিলাম কিন্তু কোনো সুযোগ পেলাম না। আমাকে এই বলে ফেরত দেওয়া হলো যে, এ বছর শুধু একটি জাহাজ যাবে। হজ্বের যাত্রী এতো বেশি ছিল যে, যে-ই যাচ্ছিল, তাকেই ফেরত আসতে হচ্ছিল।'

মাওলানা বললেন– 'সেখান থেকে যদি ফেরত পাঠিয়েই দেয় তবে চলে আসবো।'

কানপুরে তখন মহামারীর প্রাদুর্ভাব থাকায় সে পথ দিয়ে না গিয়ে গোয়ালন্দ হয়ে চট্টগ্রামে পৌঁছলেন। রেলগাড়ি থেকে নামতেই লোকজন বলতে শুরু করলো– 'এখন তো আর হজ্ব যাত্রীদের নেওয়া হচ্ছে না। আপনাদের এই কষ্ট করে আসা বেফায়দা হয়ে গেলো।' রাতে তাঁরা সেখানেই থাকলেন। পরের দিন বন্দরে গিয়ে পৌঁছলেন। খোদা তাআলার কী কুদরত দুই হাজার লোককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যে দিন তাঁরা সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন, সে দিনই হজ্বযাত্রীদের হজ্বে যাওয়ার সরকারী অনুমতি হয়ে গেল। [কামালাতে মাহমুদিয়া, পৃষ্ঠা : ২৮]

২২ শাবান তাঁরা জাহাজে চড়ে পড়লেন। মাওলানা সাহেবের জন্য যে জায়গাটি বরাদ্দ ছিল, তা ছিল খুবই সংকীর্ণ। ওই স্বল্প জায়গা বরাদ্ধ হয়েছিল পঞ্চাশ ষাটজন যাত্রীর জন্য। অধিকাংশই ছিল বাঙালী। তবে একদিন একরাত পর এর চেয়ে ভালো জায়গার ব্যবস্থা হয়ে গেলো।

ইশকে ইলাহিতে আত্মহারা

জায়গার সংকীর্ণতা এবং যাত্রীদের হৈ চৈ শোরগোলে মাওলানা মানসিকভাবে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। কিন্তু কুদরতিভাবে এমন ব্যবস্থা হয়ে গেল যে, ওই দিন ও রাতের অধিকাংশ সময়ই নিরিবিলি কাটানোর সুযোগ হয়ে গেল। 'কামালাত' গ্রন্থকার লেখেছেন–

'এশার নামাযে কোনো এক কারী সাহেব উচ্চ উওয়াজে এবং সুমিষ্ট স্বরে কুরআন তেলাওয়াত করেন। তেলাওয়াত শোনামাত্র মাওলানা সাহেবের এক বিশেষ হালত সৃষ্টি হলো। প্রথমে আহাজারি এরপর স্বাভাবিক চেতনা হারিয়ে ফেলেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই সংজ্ঞাহীন অবস্থায়ই এশার নামাজ পূর্ণ করেন। তাঁর সফরসঙ্গীদের বর্ণনা 'তিনি এশার নামাজ শেষ করার আগেই সংজ্ঞাহীন হন। এই অবস্থায় কখনো আহাজারি করছিলেন, কখনো নীরব থাকতেন। আবার কখনো কথা বলতেন। আহাজারির প্রভাব কিছুটা কমে এলে তিনি বললেন, আমরা কি এশার নামাজ পড়েছি? লোকের বলল, পড়িনি। তিনি ওজু করলেন এবং জামাতের সঙ্গে ফরজ, সুন্নত ও বেতের সবই পড়লেন। সঙ্গীরা তাঁর দেখাশোনা করছিলেন। নামাজের পর আবার আগের অবস্থার সৃষ্টি হলো– কখনো কাঁদেন, কখনো নীরব থাকেন। মাঝ রাত পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল। এরপর তিনি শুয়ে পড়েন। পরের দিন দুপুর পর্যন্ত এ হালত জারি ছিল। তবে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাতের মতো তত প্রবল ছিল না। বিকেলে সেখানকার এক দারোগা সাহেব এলেন। নাম অলিউল্লাহ। বললেন– 'হযরত! এখানে আপনার অনেক কষ্ট হবে। অন্য জায়গায় চলুন।' তিনি তাঁকে এমন স্থানে নিয়ে গেলেন, সেখানে কোলাহলের চিহ্নমাত্র ছিল না। ডেকের জায়গা ছিল প্রশস্ত। সামনে ছিল খোলা চত্বর।'

চট্টগ্রামে ব্যাপক সাড়া পড়ে গেল

মাওলানা সাহেবের আগমনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই চতুর্দিক থেকে লোকজন আসা শুরু করল। বন্দরের অফিসার ছিলেন একজন বাঙালি ডাক্তার। লোকেরা তাঁর কাছে এসে তোষামোদি করে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইত। [কামালাত : ২৮৭]

কোনোভাবে চেষ্টা-তদবির করে তারা তাঁর কাছে হাজির হতো এবং বাইয়াত হয়ে সৌভাগ্য লাভ করত। বিশেষ করে তালিবে ইলমরা বেষ্টনীর বাইরে অনুমতির অপেক্ষায় দুই তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতো। মানুষের ভিড়ের কারণে ডাক্তার

সাহেব অপারগ হয়ে বললেন– 'আমরা এমন এক ব্যক্তিকে ভেতরে নিয়ে গিয়েছি যিনি আমাদের পেরেশান করে ছেড়েছেন।'

শেষমেশ তিনি সাক্ষাতপ্রার্থীদের বললেন– এভাবে নিয়ম ভঙ্গ করে আপনাদের আর অনুমতি দিতে পারছি না। তবে যদি কেউ অনুমতি না নেওয়ায় ধরা পড়ে যায়, তাকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

সারকথা যারা ক্যাম্পের কোনো কর্মকর্তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতো বা কারো পক্ষ থেকে সুপারিশ আনতে পারতো, তারাই ভেতরে প্রবেশের সুযোগ পেত। এদের অধিকাংশই বাইয়াত গ্রহণ করে ধন্য হতো।

এমন কি চট্টগ্রামের বাইরে থেকেও বহু লোক এসেছিল এবং বাইয়াত গ্রহণ করেছিল। [কামালাত : ২৮৭]

লোকেরা বাইআতের আবেদন করত আর তিনি বাইআত করতে চাইতেন না। বলতেন, 'এই ক্যাম্পে আরো কয়েকজন আলেম আছেন। আমিও এক মোল্লা। আমার মাঝে আপনারা এমন কী দেখেছেন যে, এতদূর থেকেও মুরিদ হতে চাচ্ছেন? তারা জবাবে বলত– আমরা অত কিছু জানি না।'

চারদিকে একটা খবর ছড়িয়ে গেল যে, ভারত থেকে একজন বুযুর্গ এসেছেন। মাওলানার সঙ্গে আরো তিনজন আলেম ছিলেন; কেউ কোনো মাসআলা জানতে চাইলে তিনি এই তিনজনের প্রতি ইশারা করে বলতেন– 'এরা বড় আলেম, এদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন।' এতসব কিছুর পরও লোকেরা তার কাছেই পড়ে থাকত। কেউ কেউ বলল– হযরত, যদি আপনি দশ পনের দিন চট্টগ্রাম শহরে থাকতেন তবে শহরের দুই তৃতীয়াংশ মানুষ আপনার হাতে বাইআত হয়ে যেত। [প্রাগুক্ত]

মাওলানা সাহেবের জাহাজ শাওয়ালে এডেন পৌঁছে। তিনি নিজের এক মুরিদ মিঁয়া খোদাবখশকে তার চিঠির জবাবে লেখেন–

'তোমার চিঠি চট্টগ্রামে পৌঁছেছিল। তুমি উপদেশ চেয়েছ। আগে যা কিছু বলে দেয়া হয়েছে, তা-ই পালন করো। সেটাই নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে। এখন আমি বলছি– আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে কখনোই উদাসীন থাকবে না। হাতে কাজ করো। চোখে দেখো। কিন্তু অন্তর যেন আল্লাহর দিকে থাকে। আর এটার ওপর যেন আমল হয়।

جان جائے تو بلا سے پر تر ا دھیان نہ جائے

'বিপদে জীবন চলে গেলেও তোমার খেয়াল যেন না যায়।'

আল্লাহই যথেষ্ট তারপর কামনা এখন জাহাজ এডেন পৌঁছেছে। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা এখান পর্যন্ত অত্যন্ত সুন্দরভাবে পৌঁছেছি। [কামালাতে মুহাম্মাদীয়া, পৃষ্ঠা : ২৪১]

আল্লাহর শান দেখুন! মাত্র ৪০ টাকা ও পাঁচ সাথী নিয়ে হজ্বে রওয়ানা হয়েছিলাম। এত সহায়সম্বলহীন হওয়া সত্ত্বেও সফর আরামে সম্পন্ন হয়েছে। বরং এমন স্বস্তি ও স্থিরতা লাভ হয়েছিল, যা ধনীরা বাড়িতে থেকেও পায় না।

১১ শাওয়াল মক্কা মুয়াজ্জামায় পৌঁছেন। এক চিঠিতে তা উল্লেখ করে বলেন–

১১ রমযান শরীফ জাহাজে আরোহণ করেছিলাম এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে ১১ শাওয়াল মক্কা মুয়াজ্জামা পৌঁছে যাই। আল্লাহ তাআলার দয়া ও মেহেরবানীতে পথে অনেক অসাধারণ ও বিরল ঘটনা ঘটেছে। এখানে বায়তুল্লাহর কাছে বাড়ি ভাড়া নিয়েছি। ভাড়া ৭০ টাকা। খুব আরামে দিন কাটছে। যত দিন আল্লাহ পাকের হুকুম না হয় আসা হবে না। –কামালাতে হাম্মাদীয়, পৃষ্ঠা : ২৪১

নদওয়ার স্মৃতিচারণ

মাওলানার হিজাজে অবস্থানকালে নদওয়ার জন্য কী পরিমাণে চিন্তা ছিল, তা সেই সব চিঠি থেকে অনুমান করা যায়, যেগুলো তিনি মক্কা থেকে মাওলানা আব্দুল হাই-এর নামে লিখেছেন। তিনি এর সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যে গুরুত্বের সাথে স্মরণ করেছেন এবং এর উন্নতির জন্য যে কর্ম পরিকল্পনা করেছেন, তা থেকে তার গভীর সম্পর্কের ছোঁয়া পাওয়া যায়। হিজাজ পৌঁছে মাওলানার মনে এই খেয়াল উদিত হয় যে, নদওয়াতে পাঠদানের জন্য এখানকার কোনো আলেম যদি পাওয়া যেত তাহলে তাঁর দ্বারা আরবি সাহিত্য চর্চার প্রতি ছাত্রদের মাঝে অনেক আগ্রহ সৃষ্টি হত এবং বিষয়টি অনেক সহজ হত। মাওলানা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এ বিষয়টি নিজের চিঠিতে উল্লেখ করেন।

নদওয়ার বিরুদ্ধে যেসব ফতোয়া, পত্র-পত্রিকা ও বই পুস্তকের ধারা তখনও জারি ছিল, সেগুলো বন্ধ করার জন্য মাওলানা চাইতেন হারামাইনের উলামায়ে কেরামের কোন ফতোয়া নিয়ে হিন্দুস্তানে প্রচার করতে। মক্কার আমীরকে নদওয়ার উপদেষ্টা বানানো মাওলানার চিন্তায় এসেছিল। এ বিষয়ে তিনি মাওলানা আব্দুল হাইয়ের সাথে মত বিনিময় করেন। ১২ জিলহজ্ব মক্কা মুকাররমা থেকে মাওলানা আব্দুল হাই-এর প্রতি প্রথম যে পত্র লেখেন তাতে মাওলানা ঐ সব বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এক স্থানে তিনি লেখেন– এখানে আসার পর এমন এক অবস্থা বিরাজ করছে যে, বাইতুল্লাহর দৃশ্য দেখা ছাড়া কোন কাজ হতে পারে না। একটি আবশ্যকীয় লেখার বিষয় এই যে, আর একজন পশ্চিমা

আলেমকে এখানকার আমীর আহ্বান করেছিলেন। কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের কারণে তিনি এখানে থাকতে পছন্দ করছেন না। তিনি হিন্দুস্তানে যেতে ইচ্ছুক। তিনি নওজোয়ান আলেম-অনলবর্ষী বক্তা। আমি তাঁকে দরস দিতেও দেখেছি। তিনি অত্যন্ত চমৎকার পাঠদান করেন। আরবি সাহিত্য খুব ভালো জানেন। দারুল উলূমে তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হলে খুব ভালো হবে। মাদরাসার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে এবং কাজও চলবে। আমার মতে, যদি তাঁকে কোন বিষয়ে পাঠদানের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং লেখালেখি করানো হয় তাহলে অনেক ভালো হবে। আমার ধারণা তিনি মাসায়েলের বিশ্লেষণ বিশদ বর্ণনা করবেন এবং তা আরবি ভাষায় করবেন। এতে আরবি ভাষারও চর্চা হয়ে যাবে। পরামর্শ করে আমাকে অবহিত করা হোক।

দ্বিতীয়ত, মক্কার আমীর যদি নদওয়ার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন, তাহলে কোন ক্ষতি হবে না। যদি উপযুক্ত মনে হয়, তাহলে চেষ্টা করা হবে। এতে বিরোধিতা থমকে যাবে এবং হারামাইনের উলামায়ে কেরামের একটি ফতোয়া তৈরি হতে পারে।

তৃতীয়ত, একজন মিসরী আলেম এসেছেন শায়খ আলী হারাবী। তিনি অত্যন্ত ভদ্র ও সুবক্তা। মিসরে 'মাকারিমে আখলাক' নামে যে মজলিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তিনি তার সদস্য। তিনি মুসলমানদের মাঝে ঐক্য সৃষ্টির অন্যতম আহ্বায়ক ও কর্মী। আমি তার দুটি বয়ান শুনেছি, যা খুবই আকর্ষণীয়। তিনি নির্দিধায় সাহিত্যপূর্ণ আরবি ছন্দময় ভাষায় বক্তৃতা করেন, তিনি আমাকে অনেক মহব্বত করেন। তাঁকে সম্মানিত রুকনদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হোক এবং তাঁর সাথে চিঠি পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখুন। যদি রোয়েদাদ ছাপা হয়ে থাকে তাহলে তাঁর নামে পাঠানো হোক।

এই চিঠির উত্তর পাওয়ার অপেক্ষা মাওলানার জন্য কঠিন হয়ে যায়। তাই তিনি তিন দিন পর আরেকটি চিঠি লেখেন যাতে এই সব বিষয়ের উল্লেখ বেশি ছিল। মাওলানা আব্দুল হাই এর একটি চিঠি তিনি পেয়েছিলেন কিন্তু সেটি তাঁর চিঠির উত্তর ছিলনা। এজন্য লেখার প্রয়োজন আরো তীব্রতর হয়ে যায়। তিনি লেখেন–

হজ্ব তো হয়ে গেছে। আল্লাহ কবুল করুন। আমীন! আপনার অনুরোধ পূর্ণ হয়েছে। আরাফায় জাবালে রহমতের নিকট আপনার জন্য বিশেষ করে অনেক দুআ করেছি। বাহ্যত তা অত্যন্ত ভালো অবস্থা ছিল কিন্তু আমার মত গোনাহগারের দুআ...।

شاہاں چہ عجب گر بنوازند گدا را

মন আসতে চাচ্ছেনা, পাথেয়ও নেই। সরকার যখন সুযোগ দেন, আমি তার মেহমান, যদিও অনুপযুক্ত, গোনাহগার। যখন আমি বাইতুল্লাহর নিকটবর্তী হই, তখন অনিচ্ছায় মুখ থেকে এই কবিতা বেরিয়ে আসে–

نہ لائق در پہ عجب آنے کے نہ قابل منہ دکھانے کے

امید مغفرت لیکر ترے دربار میں آئے

'নালায়েক আপনার সামনে মুখ দেখানোর কী অধিকার রাখে?

ক্ষমার আশা নিয়ে আমি তার দরবারে হাজির।'

এরপর পশ্চিমা আলেম সম্পর্কে লেখেন, তাকে নদওয়ায় আহ্বান করা হোক। সম্ভবত একশত রুপিয়া মাসিক বেতনে তিনি আসবেন। পরিশেষে, তিনি লেখেন– কলকাতায় মাহফিল হলে, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য জায়গায় যেন বক্তা পাঠানো হয়। চট্টগ্রামের অনেক লোক জেনে গেছেন।

ইস্তাম্বুলের একটি চিঠি

মক্কা মুকাররমায় পৌঁছার কিছুদিন পরেই মাওলানার কাছে ইস্তাম্বুল থেকে একটি দাওয়াতনামা পৌঁছে। এটা ছিল হাসান আফিন্দির চিঠি। তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের জজ বদর উদ্দিন তায়্যিবজির শ্যালক। চিঠিতে তিনি মাওলানাকে ইস্তাম্বুলে আগমনের ও সেখানকার খলিফাতুল মুসলিমীনের সাথে সাক্ষাতের দাওয়াত দিয়েছিলেন। মাওলানাও নদওয়ার স্বার্থে ঐ সফরের প্রতি কিছুটা আগ্রহী ছিলেন। তাই তিনি ২৬ জিলহজ্ব তারিখে সাইয়িদ মাওলানা আব্দুল হাই-এর নিকট একখানা পত্র লেখেন–

আমার এখানে আগমনের খবর ইস্তাম্বুলে পৌঁছে গেছে। এক ব্যক্তি দাওয়াতনামা পাঠিয়েছেন– আর তিনি হচ্ছেন হাসান আফিন্দী; মোম্বাই হাই কোর্টের জজ বদর উদ্দীন তাইয়্যেব সাহেবের শ্যালক। তিনি লিখেছেন, 'যদি আসার খরচ আপনার কাছে থাকে, তাহলে অবশ্যই খলিফাতুল মুসলিমীনের সাথে সাক্ষাত করুন।' ইচ্ছা হয় কিন্তু যাওয়ার খরচ নেই, আপনার রায় কী? যদি সাক্ষাত হয় তাহলে নদওয়ার আর্থিক উপকার হওয়ার আশা আছে। কিন্তু মনে হচ্ছে আর্থিক সঙ্কটের কারণে এ সফর নাও হতে পারে।

সুলতানের প্রতিনিধির ভক্তি ও শ্রদ্ধা

সুলতান আব্দুল হামীদ খানের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে আবদুর রহমান পাশা হজ্বের জন্যে এসেছিলেন, একজন মুহাজিরে মক্কী তাঁর বাসস্থানে এক মাহফিলের

আয়োজন করেন এবং বয়ানের জন্যে শায়খ আলী হারাবীকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি মিসরের একজন বড় আলেম ও ভালো বক্তা। মাওলানাকেও দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। তিনি সেখানে আগমণ করেন। ঐ মাহফিলে পাশার সাথে মাওলানার পরিচয় হয়। পরে পাশা মাওলানাকে দাওয়াত দেন এবং নিজের নিষ্ঠা ও ভক্তি প্রকাশ করেন এবং দামেস্ক ও কুস্তুনতুনিয়া (ইস্তাম্বুল) সফরের দাওয়াত দেন। 'কামালাত'-এর লেখক এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন।

'ঐ মজলিসে পাশাও দাওয়াতী মেহমান ছিলেন, যিনি সুলতান গাজী আবদুল হামীদ খান এর পক্ষ থেকে প্রতি বছর হারমাইন আসেন, পাঁচ হাজার সৈন্যও তাঁর সাথে আসে। জলসার আয়োজক ওয়াজ শেষ হলে তুর্কি ভাষায় তাঁর সাথে কিছু কথা বলেন। অতঃপর পাশা আমাদের হযরতের দিকে মনোনিবেশ করেন। আরবিতে বললেন, 'আপনি আমাদের দাওয়াত কবুল করলে আমরা অনেক গর্বিত হবো। একথাও বললেন যে, আমরা পূর্ণ আনন্দিত তখন হবো যখন আপনি দামেস্ক আগমণ করবেন। আমরা আপনার ইস্তেকবাল করবো, আমাদের দেশে নিয়ে যাবো– সেখান থেকে আপনাকে কুস্তুনতুনিয়া নিয়ে যাব। তিনি তাঁর দাওয়াত কবুল করলেন এবং দ্বিতীয় দিন রাতে তাঁর অবস্থান স্থলে তাশরীফ রাখলেন। পাশা অত্যন্ত সম্মান ও ইজ্জতের সাথে তাঁকে নিয়ে গেলেন এবং অত্যন্ত সম্মানিত আসনে বসতে দিলেন। শোনা যায়, তুর্কিদের মেহমানদের বসার কামরা প্রশস্ত হয়। প্রস্থের দিকে উঁচু করা হয়- তার ওপর দামী ও উন্নত গদি ও বালিশ লাগানো থাকে। কামরার বাকি তিন দিকে চেয়ার সাজানো থাকে। উঁচুস্থানে মজলিসের প্রধান মেহমান বসেন, অন্যরা মঞ্চের সামনের চেয়ারে বসেন। পাশা হযরতকে মঞ্চের উপর বসালেন এবং নিজে একটি ছোট্ট চেয়ারে হযরতের সামনে বসে গেলেন এবং বললেন, 'এখন আপনি আমাকে ধন্য করলেন এবং ঐসব বাক্যই বললেন যা প্রথম সাক্ষাতে বলেছিলেন- তথা পূর্ণ গৌরবান্বিত আমি তখনই হব যখন আপনি দামেস্কে তাশরীফ আনবেন, আমরা আপনাকে ইস্তেকবাল করব, আপনাকে কুস্তুনতুনিয়া নিয়ে যাব ইত্যাদি।' উত্তরে হযরত কিছুই বললেন না। দাওয়াতের পর পাশা একটি ছোট কোট ও একটি পাগড়ী নাযরানা স্বরূপ হযরতের সামনে পেশ করলেন, যাকে সুলতানের উপঢৌকন বলা উচিৎ। হযরত ফিরে এলেন, পুনরায় হযরত কখনো তার সাথে সাক্ষাতের চিন্তাও করেন নি। মদিনা মুনাওয়ারা যাওয়ার পথে তিনি ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন যে, হযরত আমাদের সাথে চলেন, সবধরণের সুবিধা হবে কিন্তু তিনি তা মঞ্জুর করেননি।

মক্কার আমিরের চিঠি ও সাহায্যের আবেদন

সে সময়েই মক্কা শরীফের আমীরের সাথীরা ইচ্ছা করলেন যে, হযরত মক্কা শরীফের আমিরের সাথে সাক্ষাত করেন কিন্তু তিনি তাতে সম্মতি দিলেন না। এর কিছু দিন পরে স্বয়ং মক্কার আমীরের একটি চিঠি হযরতের কাছে পৌঁছল। চিঠিতে আমীর মাওলানাকে উলামায়ে কেরামের মুকুট, সম্মান ও মর্যাদার লক্ষ্য বস্তু এ ধরনের শব্দের দ্বারা সম্বোধন করেন।

এ চিঠি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হিজাজে মাওলানার কী ধরনের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রসিদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। সেখানে কি পরিমাণ সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে হযরতকে দেখা হত।

সুলতান আব্দুল হামিদ খান এর ইচ্ছা ছিল, জেদ্দা থেকে মদিনা এবং সেখান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ করার। এ বিশাল কাজের জন্য অঢেল অর্থের প্রয়োজন ছিল। আমীর সাহেব ঐ চিঠিতে অত্যন্ত স্পষ্ট করে অর্থনৈতিক সাহায্যের আবেদন করেন এবং মাওলানার কাছে আবেদন করেন যে, তিনি নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে এ কল্যাণকর কাজে সাহায্য করবেন। তার কি কোনো খবর ছিল যে, এ ফকির দাতার কাছে হিজাজ থেকে ফেরার পয়সা পর্যন্ত নেই। কিন্তু অন্তর এত বিশাল ছিল যে, বাদশাহ-মন্ত্রিরাও তার কাছে সাহায্যের আবেদন করত। আল্লামা ইকবাল সম্পূর্ণ সঠিক বলেছেন।

اپنے مالک کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک

اور پہچانے تو پھر تیرে گدا دارا و جم

'নিজের মালিককে যদি না চেন তাহলে সমস্ত বাদশাহের মুখাপেক্ষি,

আর যদি মালিককে চেন তাহলে তোমার মুখাপেক্ষী হবে পারস্যের সম্রাট।'

এ চিঠি জুমাদাল উলা ১৩১৫ হিজরীতে লেখা। কামালাতের 'লেখক এ চিঠিটি পূর্ণ নকল করেছেন।

মাওলানা শিবলীর ব্যাপারে 'লর্ড মেকডোনাল' এর কু-ধারণা

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে লর্ড মেকডোনাল যিনি অন্ধ্র প্রদেশের লেফটেনেন্ট গভর্নর ছিলেন এবং মুসলমানদের প্রতি তার বিশেষ সহানুভূতি ছিল, মাওলানা শিবলির প্রতি তার কুধারণা হয়ে যায়। তার সাথে মুনশী আতহার আলী সাহেব কাকুরভীর সাথেও অযোধ্যার তালুকদারদের সংগঠনের কিছু জটিল বিষয় নিয়ে

কু-ধারণার সৃষ্টি হয়। এ কু-ধারণা ও অসন্তুষ্টির প্রভাব শুরুতে এ দুই ব্যক্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীতে তা নদওয়া পর্যন্ত পৌঁছে।

কিছু দূরদর্শী হযরতের উপর এ বিষয়টির এমন প্রভাব পড়ে যে, তারা কেবল এ প্রদেশ নয় বরং ব্রিটিশ হিন্দুস্তানকেও পরিত্যাগ করেন। এ কথার ব্যাখ্যা এই যে, মাওলানা শিবলী ও মুনশী আতহার আলী সাহেব দুজনই হায়দারাবাদ চলে গেলেন এবং লর্ড মেকডানাল এর বদলী না হওয়া পর্যন্ত তারা ফিরলেন না।

'শিবলীর জীবনী' লেখক ঐ সফরের কারণের দিকে নিম্নোক্ত শব্দগুলোর মাধ্যমে ইশারা করেছেন।

'সম্ভবত ঐ সফরের তাড়াহুড়া ও হায়দারাবাদকে নির্বাচন করার পরামর্শে কিছু রাজনৈতিক কারণে পরাধীন হিন্দ থেকে দূরে যাওয়ার উপযোগিতা উপকারিতাও শামিল আছে।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী সে সময়ে হিজাজে ছিলেন। আর মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী নাযেমে নায়েব হিসাবে কাজ করছিলেন। কিন্তু এক বছর পরেই ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯০০ সনে তিনি দিল্লি থেকে স্বীয় ইস্তফা পত্র পাঠিয়ে ছিলেন। তাতে তিনি নিজের পারিবারিক প্রয়োজনের কারণে নাযেমের কাজ আঞ্জাম দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন।

বিরোধীদের উপদ্রব, প্রশাসনের অসন্তোষ এবং মাওলানা মুহাম্মাদ আলীর অনুপস্থিতির পর আবার অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও দুর্বলতা নদওয়ার জন্য এক বড় আঘাত ছিল যা সামলানো সহজ ছিল না। এ সময় নদওয়ার যাবতীয় দায়-দায়িত্বের বোঝা কেবল নিম্নোক্ত চার ব্যক্তির কাঁধে ছিল–

১. মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই।

২. মাওলানা মছিহুয যামান।

৩. মাওলানা খলিলুর রহমান সাহারানপুরী।

৪. মুনশী ইহতেশাম আলী সাহেব।

নদওয়া এ সময়ে যে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন ছিল সে দিকে লক্ষ্য করে এমন কথা বলা ভুল হবে না যে, এ চারজন আত্মনিবেদিত প্রাণ যদি ঐ নাযুক পরিস্থিতিতে তাদের খেদমতের জন্য সর্বদিক থেকে উদ্বুদ্ধ ও প্রস্তুত না থাকতেন, তাহলে নদওয়া সেই দিনই শেষ হয়ে যেত।

শাবান ১৩১৯ হিজরী মোতাবেক ডিসেম্বর ১৯০১ কলকাতায় ৬ষ্ঠ জলসা

মতানৈক্য, গোলযোগ, কু-ধারণা ও ভুল বোঝাবুঝির ঐ পরিবেশে নদওয়ার ৬ষ্ঠ জলসা ডিসেম্বর ১৯০১ সনে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধিতার যে ধারা বেরেলভী জলসা থেকে শুরু হয়েছিল তা এ সময়ে আরো বেগবান হয়েছিল। সাধারণ সাধারণ কথা ও পরিভাষায় খুঁত অন্বেষণ ও বিতর্কের যে মেজাজ মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল সে কারণে নদওয়ার বার্ষিক জলসার বয়ানের উপর 'কথা চর্চা' জারী ছিল।

তাছাড়া ঐ বিরোধীদের পক্ষ থেকে কিছু বক্তা ও মুবাল্লিগ ঐ পুরো এলাকায় ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, যারা প্রত্যেক মানুষের সাথে এমন ধরনের কথাবার্তা বলত যাতে নদওয়ার প্রতি তাদের কু-ধারণা সৃষ্টি হয়।

বোম্বাইয়ে ব্যবসায়ীদের কাছে তারা বলত যে, নদওয়ার রুকনগণ ওয়াহাবী, পীর-মাশায়েখকে মানে না। উলামা ও আলিয়া মাদরাসার ধারক বাহকগণ বলতেন এরা সবাই প্রকৃতিবাদী, মাহফিল শুধু এ উদ্দেশ্যে করে যে, ধর্মীয় শিক্ষার মূলোৎপাটন করবে এবং এখানেও আলিয়া মাদরাসার উপর হামলা করতে এসেছে। নতুনদের বলত নদওয়াতুল উলামা মুসলমানদের পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে সরিয়ে 'কালা-আকুলুতে' (তর্কাতর্কি) ফাঁসাতে চায়। হানাফীদের বলত নদওয়াতুল উলামা লোকদেরকে তাকলীদের গণ্ডি থেকে মুক্ত করার জন্যে এ তামাশা দাঁড় করিয়েছে।

এইসব অভিযোগ ও ফিতনা উদ্রেককারীদের উপদ্রব এখন না থাকলেও এর ধারা একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি। ৬ষ্ঠ জলসার বিবরনীতে মূল প্রতিবেদনের পূর্বে নিম্নোক্ত ঘোষণা সম্বলিত একটি কাগজ লাগানো হয়েছিল।

'প্রতিবেদন ঐ সকল কার্যবিবরণীর সমষ্টি যা বার্ষিক জলসায় হয়, এটা না কোলো ফিকাহর কিতাব, না কোন আকিদার কিতাব, যার থেকে সাধারণ মুসলমানরা কোন মাসআলা বা আকিদা উদঘাটন করবে। হকপন্থীদের জন্য আবশ্যক হলো ইসলামের খাতিরে দীন ও দিয়ানতের দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথার এমন অর্থ বের করা ও বয়ান করা, যা শুদ্ধ, সঠিক ও সহজ।

এ লেখা থেকে ঐ ভয়াবহতা ও কঠিন পরিস্থিতি স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে আহলে নদওয়া যার শিকার ছিল। বাস্তবতা হলো এই যে, এটা অত্যন্ত নাজুক, কঠিন ও হিম্মত হারাবার অবস্থা ছিল। নদওয়ার ইতিহাসে ওই সব মনীষীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে যারা ঐ প্রতিকূল সময়ে কোন তিরস্কার, ভয়-ভীতি এবং কোন

সমালোচনা ও নিন্দার পরওয়া না করে, সেই পবিত্র দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক মাশগুল ছিলেন।

কলিকাতায় ওই বিরোধীরা পরিবেশ খারাপ করার অনেক চেষ্টা করেছে, মাওলানা হিজাজে থাকা সত্ত্বেও নদওয়ার জন্য সীমাহীন চিন্তাগ্রস্ত ও বিচলিত ছিলেন। মাওলানা আব্দুল হাইকে ২ জিলহজ্ব ১৩১৮ হিজরী তারিখে এক চিঠিতে লেখেন–

'কামালুল ইরশাদ প্রকাশ করা হোক, কলিকাতায় যে বিরোধীরা মন্দ প্রভাব ছড়াচ্ছে তাদের জন্য অনেক উপকারী হবে। শুধু তাদের মিথ্যা ও ধোকা সম্পর্কে একটি রিসালা প্রচার করা হোক। এতে তাদের প্রভাব অনেক কমে যাবে।' ঐ বিরোধীরা হারামাইনে আলেমাদের থেকে যে ফতওয়া সংগ্রহ করেছিল, তার সম্পর্কে মাওলানা লেখেন–

ফতওয়ার উপর যাদের সিলমারা ছিল তারা গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গ নন বরং তারা অধিকাংশ ইলমহীন, যদি আপনি একটি ভালো ভূমিকা বৃদ্ধি করে প্রকাশ করেন তবুও উপকারী হবে।

বিরোধীদের সাথে মাওলানার আচরণ

মাওলানার ধারণা ছিল যে, বিরোধীদের তৎপরতার মোকাবেলায় অমনোযোগী ও বেপরওয়া হয়ে থাকা ঠিক না বরং সাধারণভাবে তাদের প্রশান্তিমূলক জওয়াব দেওয়া উচিত। এক চিঠিতে লেখেন–

প্রথম থেকেই আমার অভিমত এই যে, বিরোধীদের তৎপরতার মুকাবেলায় এমন উদাসীন হয়ে থাকা ঠিক নয়, যেমন সাইয়িদ আহমদ নিজের বিরোধীদের থেকে ছিলেন। তিনি প্রশাসনকে সাথে নিয়ে নিজের কাজ হাসিল করেছেন। আপনার সাথে তো প্রশাসন থাকতে পারে না। আর সাধারণ ধনী ব্যক্তিবর্গের কিছু তো প্রশাসনের ভয়ে আর কিছু বিরোধীদের তৎপরতায় পৃথক হয়ে যাবে এবং হচ্ছে। তাদের মিথ্যা-ধোঁকা ও নিজের মৌলিক দাবী উত্তম পদ্ধতিতে প্রকাশ করা জরুরি।

খোদার ইচ্ছা এমন হলো যে, ওই বিরোধিতার দ্বারা নদওয়ার এক ধরনের লাভই হলো। ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে বিরূপ করার জন্য এরা বিশেষ চেষ্টা করেছিল তারা নদওয়া সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে গেল এবং তাদের অন্তরে এই আগ্রহ সৃষ্টি হলো যে, ওই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানা যাক যার বিরোধিতায় ডাক-ঢোল বাজানো হচ্ছে।

এ জলসায়ও মাওলানা শিবলী শরিক হতে পারলেন না। তিনি অপারগতার চিঠি লিখলেন এবং ঘোষণা করলেন আগামী জলসায় তিনি অবশ্যই শরিক থাকবেন।

মাওলানার প্রত্যাবর্তন, অসুস্থতা ও কলকাতায় উপস্থিতি

জলসা অনুষ্ঠিত হওয়ার দুই-তিন মাস পূর্বে সম্ভবত জুমাদাল উলা ১৩১৯ হিজরীতে মাওলানা হিজাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মুঙ্গেরে অবস্থান করেন। জলসা থেকে (যা শাবান ১৩১৯ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হয়) কয়েক দিন পূর্বে মূত্রাশয়ের প্রচণ্ড ব্যথা ছিল (এটা মাওলানার পুরনো রোগ ছিল, কখনো তা বেড়ে যেত এতে তার দুর্বলতা অনেক বেড়ে যেত) কিন্তু তা সত্ত্বেও মাওলানা কলকাতা তাশরীফ আনেন। ফলাফল এই হলো যে, এ সফরের ক্লান্তির কারণে দুর্বলতা এই পরিমাণ বেড়ে গেল যে, পরিশেষে তিনি জলসায় শরীক হতে পারলেন না। মাওলানা আব্দুল হাই নিয়ম মোতাবেক রিপোর্ট পাঠ করে শুনালেন।

তৃতীয় জলসায় দারুল উলূমের রিপোর্ট পেশ করেন মাওলানা হাফিজুল্লাহ যিনি তখন দারুল উলূমের মুহতামিম ছিলেন। (উল্লেখ থাকে যে, মাঝে মাওলানা ফারুক 'চিরিয়াকোটি' মুহতামিম হয়ে গিয়েছিলেন) দারুল উলূমের সংবিধানের উন্নয়ন ও রদ-বদলের জন্য আঠার সদস্যের এক কমিটি বানানো হয়। এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, নব্য প্রয়োজনাদির খাতিরে ঐ সংবিধানে রদ-বদল ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ জন্য এ উদ্যোগ নেয়া হয়। এ কমিটিতে নদওয়ার যে সব সদস্য শামিল ছিলেন তাদের মধ্যে মাওলানা শিবলির নামও দৃষ্টিগোচর হয়।

ছাত্রদের পরীক্ষা

এ জলসাতেও ছাত্রদের পরীক্ষা নেয়া হয় এবং তা ছিল পূর্বের চেয়ে অনেক কঠিন। মাওলানা আবুল খায়ের সিদ্দিক কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসর আরবি ইবারতের অনুবাদ করতে দেন। ছাত্ররা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তার অনুবাদ করে।

এরচেয়েও কঠিন বিষয় এই ছিল যে, চার পংক্তির একটি ফার্সী কবিতা আরবি পরিভাষাসহ একটি কবিতার অনুবাদ করতে দেয়া । উর্দু কবিতা ছিল এই–

پڑے ہوئے تھے ہزاروں پردے کلیم دیکھو تو جب بھی غش تھے

ہم اس کی آنکھوں کے ہائے صدقے کہ جلوہ یوں بے حجاب دیکھا

যাদের অনুবাদের সাথে ন্যূনতম সম্পর্ক আছে তারাই কেবল বুঝতে পারে যে, পরিভাষাসহ এ কবিতার অনুবাদ কী পরিমাণ কঠিন কাজ। কিন্তু নদওয়ার ঐ দুঃসাহসী নওজোয়ান মেধাবী ছাত্ররা অনেক সহজভাবে খুব দ্রুত অনুবাদ করে দেয় এবং বেশ ভালো অনুবাদ করে।

পুরস্কার বিতরণী

চতুর্থ অধিবেশনে পরীক্ষা আবারো গতিশীল হয়, হাদীস ও তাফসীর সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করা হয়। পরে পুরস্কার বিতরণ করা হয়– ছাত্রদের স্বর্ণপদক রৌপ্যপদক ও সনদ দেয়া হয়।

এ অধিবেশনে শায়খ আব্দুল কাদের এক ভাষণ দেন, তিনি এতে লর্ড মেকডানলের এর সন্দেহ সংশয়ের উপর আলোকপাত করে অত্যন্ত আফসোস প্রকাশ করেন।

আরেকটি বয়ানের পর এ পর্ব সমাপ্ত হয়। মিযবানের অনেকই জার জার করে কাঁদছিলেন এবং এ কবিতা পড়ছিলেন।

حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد

روئے گل سیر ندیدیم و بہار آخر شد

লাখনৌতে প্লেগ এবং দারুল উলূম স্থানান্তর

১৯০৩ সালে লাখনৌতে প্লেগ দেখা দেয়। এতে দারুল উলূমের ছাত্ররা খুব দ্রুত বাড়ি ফিরতে থাকে। যেহেতু নতুন বছর শুরু হয়েছিল, এ জন্য দারুল উলূম বন্ধ করাটাও সমীচীন মনে হলো না। শায়খ মশির হুসাইন সাহেব আবেদন করলেন যে, বাদশাহ নগর স্টেশনে মেইনরোড সংলগ্ন তার বাসায় মাদরাসা স্থানান্তর করা হোক। ২২ জিলহজ্ব ১৩২০ হিজরী সনে দারুল উলূম সেখানে স্থানান্তর করা হলো এবং আড়াই মাস পর আবার মাদরাসা লাখনৌতে এসে গেল। সে দিকে লক্ষ্য করে ব্যবস্থাপনা কমিটির অধিকাংশ সদস্য চাচ্ছিলেন যে, মাদরাসা শাহজাহানপুর স্থানান্তর করা হোক। পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত হলো যে, লাখনৌর দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ মাদরাসার এ বিষয়টির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এর যাবতীয় খরচাদি এবং দারুল উলূমের নির্মাণের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করবেন। বেশ কিছু দিন এ বিষয়ে আলোচনা চলছিল। ১৭ শাবান ১৩২১ হিজরীতে মুনশী আতহার আলী সাহেবকে দারুল উলূমের ফয়সাল বানানো হলো এবং সিদ্ধান্ত হলো দারুল উলূম লাখনৌতেই থাকবে।

নতুন স্তরের উদ্বোধন

শাওয়াল ১২১৯ হিজরী মোতাবেক ফেব্রুয়ারি ১৯ এ দারুল উলূমের ৪র্থ স্তর মাধ্যমিক প্রথম বর্ষ নামে খোলা হলো।

এরপর দ্বিতীয় বর্ষ খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এই স্তরগুলো খোলার সাথে সাথে নিসাব নির্ধারণের বিষয়টিও সামনে এসে গেল ১৩১৯ হিজরীতে এ কাজের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। যাতে মাওলানা মুহাম্মাদ ফারুক চিরিয়াকোটি ও মাওলানা আবদুল্লাহ টুংকির মত অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ শরীক ছিলেন। মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানীকে এই কমিটির প্রধান করা হয়।

ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা

ওই সময়ে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজির একটি ক্লাস খোলা হয়। এর জন্য আলাদা একজন ইংরেজি টিচার নিয়োগ দেয়া হয়। ১৬ রবিউস সানী ১৩২০ হিজরীতে নির্বাহী কমিটির মিটিং হয় এবং জরুরি বিষয়াদি ছাড়া 'আন নদওয়া'-এর সম্পাদনার বিষয় চূড়ান্ত হয় মাওলানা হাবিবুর রহমান খান শেরওয়ানীকে এর সম্পাদক বানানো হয়। আর মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাইকে তার উপদেষ্টা ও সহযোগী করা হয়।

সরকারের আচরণে পরিবর্তনের প্রভাব

নবাব ভিকারুল মুলক বাহাদুর মামালিকে মুত্তাহিদা লেফটেনেন্ট গভর্নর আগ্রা ও অযোধ্যা থেকে ১৩ মার্চ ১৯০২ ইং সনে আলীগড়ে সাক্ষাত করে নদওয়াতুল উলামার সঠিক অবস্থান সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। তিনি বিস্তারিত শুনে বললেন, 'আমার আর কারো প্রতি কোনো সন্দেহ নেই।'

কলকাতার বার্ষিক মাহফিলেও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাদের সামনে কথাবার্তা উন্মুক্তভাবে হয়েছিল। এছাড়া বড় কথা হলো লর্ড মেকডোনাল যিনি নিজেকে মুসলমানদের ভাগ্যের চাবী হিসেবে উন্মুক্তভাবে উপস্থাপন করেছিলেন, তিনি এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। কু-ধারণার কুয়াশা কিছুটা বিদূরিত হয়েছিল, নদওয়াতুল উলামার পক্ষ থেকেও বার বার ঘোষণা করা হয়েছিল যে, এটি নিছক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাজনীতির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র বা বিক্ষোভ সৃষ্টির কোনো প্রশ্নই উঠে না।

শাহজাহানপুরে নদওয়ার অফিস

শাহজাহানপুরে নদওয়ার জন্য বেশ কিছু জায়গা ওয়াক্ফ করা ছিল এবং তা ব্যবহারের কোনো পদ্ধতি পাওয়া যাচ্ছিল না। এ জন্য নদওয়াতুল উলামার দপ্তর শাহজাহানপুরে স্থানান্তর করা হলো। এ সময় মাওলানা মছিহুয যামান ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন।

অমৃতসর-এর মাহফিল ও মাওলানা শিবলীর আগমন

১৩২০ হিজরী সনে রজব মাস মোতাবেক ১৯০২ ইংরেজিতে অমৃতসরে নদওয়ার নবম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা শিবলীও শরীক হলেন। তিনি যখন নিজের ফার্সী কবিতা পড়ছিলেন তখন শ্রোতাগণ অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে শুনছিলেন।

اے کہ پرسی چہ کسانیم وچہ ساماں داریم ☆ آنچہ باہیچ نیرزد یہاں آں داریم

মাওলানা শেরওয়ানী নদওয়াতুল উলামার লক্ষ্য উদ্দেশ্যের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি জনসাধারণের সন্দেহ-সংশয় দূর করেন। তিনি বিরোধীদের বিভিন্ন অভিযোগের জওয়াব দেন।

৮ রজব পঞ্চম অধিবেশনে মাওলানা শিবলী নদওয়াতুল উলামার প্রয়োজনের উপর আলোচনা করেন। মাওলানা চাচ্ছিলেন যে, শুধু এ বিষয়ের উপরই আলোচনা ক্ষান্ত করবেন কিন্তু উপস্থিত জনতার অনুরোধে খতমে নবুওয়াতের উপরও আলোচনা করেন।

এ বয়ানটি মাওলানার বিশেষ ও নির্বাচিত বয়ানসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নদওয়ার কার্যবিবরণীতে ঐ বয়ানের আলোচনা নিম্নোক্ত শব্দাবলী দ্বারা করা হয়েছে। এ বয়ান অক্ষরে অক্ষরে লিখে রাখার উপযুক্ত ছিল কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আফসোস! উর্দুতে তখনও রেকর্ডিং-এর সিস্টেম আবিষ্কৃত হয়নি। এ জন্য এমন চিত্তাকর্ষক বয়ান ওই সময় পর্যন্ত চলে বক্তা যতক্ষণ পর্যন্ত তা বলতে থাকে।

শিক্ষা কমিশনে মাওলানা শিবলীকে মনোনয়ন

১৫ রবিউস সানী ১৩২০ হিজরী সনে যে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল তাতে মাওলানা শিবলীর নাম ছিলো না। মাওলানা শিবলী তখন হায়দারাবাদে ছিলেন। বিষয়টি মাওলানার বেশ ভালো জানা ছিল। তখন তিনি যেসব চিঠি মাওলানা শেরওয়ানীর কাছে লিখেছিলেন তাতে ঐ বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। অমৃতসরের

মজলিসের ২য় দিনই পরিচালনা পরিষদ শিক্ষা কমিশনে মাওলানাকে মনোনীত করেন।

মাদরাজের বৈঠক ও সমঝোতার শেষ প্রচেষ্টা

১৩২১ হিজরী সনের শুরুতে মাদরাজেও নদওয়ার একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। শহরের বিখ্যাত উলামা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এর সদস্যপদ গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছু আলেম তখনও ছিলেন যারা শুধু এর সদস্যপদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ক্ষান্ত হননি বরং ইতোমধ্যে এর বিরোধিতাও শুরু করেছিলেন। যখন মাদরাজে নদওয়ার সম্মেলনের সিদ্ধান্ত হলো তখন নদওয়ার একটি প্রতিনিধি দল মাদরাজে পাঠানো হয় এ উদ্দেশ্যে যে, তারা নদওয়ার চিন্তা-ভাবনা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রচার প্রসার করবেন এবং বিরোধীদের মুখ বন্ধ করার উপায় তালাশ করবেন। বিরোধিতা এমন প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে যে, প্রতিনিধি দল জেলাগুলোর সফর বাদ দিয়ে শুধু মাদরাজ শহরে নিজেদের প্রচেষ্টা নিবদ্ধ রাখেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলীর মাদরাজ সফর

পরিস্থিতির নাযুকতার দিকে লক্ষ্য করে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী স্বয়ং মাদরাজ সফর করতে বাধ্য হন। ৩ শাওয়াল ১৩২১ হিজরী সনে নদওয়ার আরো কয়েকজন সদস্যের সাথে মাদরাজ সফরে রওনা হন। যদিও মাওলানা মাদরাজ সম্মেলনের কিছুদিন পূর্বেই নাযেমের পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন তথাপি নদওয়ার সাথে তার সম্পর্ক ও মহব্বতের মধ্যে তিল পরিমাণও ফারাক সৃষ্টি হয়নি। নদওয়ার শুভানুধ্যায়ীরা স্টেশনে মাওলানাকে অনন্দের সাথে অভর্থনা জানান।

শুরুতে দু চার দিন বেশ প্রশান্তির সাথে অতিবাহিত হয়। বিভিন্ন স্থানে জলসা অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধীদের পক্ষ থেকে ঐ সব জলসা বানচালের কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বিশেষ কোনো ষড়যন্ত্র বা চক্রান্তও দৃষ্টিগোচর হয়নি। কিন্তু এরপর বিরোধিতা আবার উজ্জীবিত হয় এবং একটি অংশ এমন স্থির করেছিল ছিল যে, নদওয়ার সদস্যগণ ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে শহর ছেড়ে চলে যান কিন্তু মাওলানা ও তার সাথীগণ তার কোনো পরওয়া না করে নিজেদের কাজ অব্যাহত রাখেন।

নদওয়ার এই দশম সম্মেলন ১৪, ১৫, ১৬ শাওয়াল ১৩২১ হিজরী সন মোতাবেক ৩, ৪, ৫ জুন ১৯০৪ ঈসায়ী মাদরাজের স্প্রিংস গার্ডে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ইতোপূর্বে কংগ্রেসের বার্ষিক সভা হয়েছিল। ঐ বিশাল প্যাণ্ডেলে 'হাউজের' একটি বড় অংশ ছাড়াও সাত হাজার মানুষ চেয়ারে বসতে পারত। সভাপতির আসন অলংকৃত করার জন্য মাওলানা আবু মুহাম্মদ আব্দুল হক

দেহলভী সাহেবের নাম প্রস্তাব করা হয় তিনি সভাপতির আসন অলংকৃত করেন এবং ঘণ্টাব্যাপি নদওয়ার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ওপর বিশদ আলোচনা করেন। ঐ সব সন্দেহ-সংশয় দূর করেন যা নদওয়ার ব্যাপারে মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হচ্ছিল।

নাযেমের পক্ষ থেকে মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই গত বছরের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন এবং ভূমিকা বয়ান করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, এটা প্রথম সুযোগ যে, উত্তর ভারতের উলামা মাশায়েখের একটি জামাত মাদরাজে একত্রিত হয়েছেন এবং মাদরাজের উলামা-মাশায়েখের এক বিশাল অংশ উজ্জীবিত হয়েছে। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আপনাদের এ বিষয়টি বিশ্বাস করানোর ব্যাপারে কোনো চিন্তা করতে হবে না। কেননা এটা নদওয়াতুল উলামার বরকত যে এটা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের উলামা ও মাশায়েখদের ৩টি স্থানে জমা করেছে। এরপর মাওলানা অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠা, প্রচার-প্রসার ও উন্নতি ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পেশ করেন যা পরে নদওয়াতুল উলামার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সারসংক্ষেপ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি তা ৫ ভাগে ভাগ করেন। যথা–

১. শিক্ষার উন্নতি;

২. শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার;

৩. পরস্পর মতপার্থক্য দূর করা;

৪. নৈতিকতা বিনির্মাণ;

৫. মুসলমানদের সাধারণ কল্যাণ।

এরপর উপরোক্ত পাঁচটি পয়েন্টে এমন অর্থবহ ও নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা দেন যে, এত দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও তা সেই সজীব সত্য ও বাস্তব মনে হয় এবং লেখকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সুষ্ঠু চিন্তার স্বীকারোক্তি দিতে হয়।

অমৃতসরে নদওয়ার নবম জলসায় কুপ্রথা বন্ধ করণের ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তার সম্পর্কে প্রস্তুতি এবং সংখ্যা গণনা পেশ করতে গিয়ে মাওলানা বলেন যে, 'এ বছর ২৪ জন সম্মানিত আলেম ৬১টি স্থানে উল্লিখিত বিষয়টি বাস্ত বায়নে চেষ্টা করেন। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং মাঝে মধ্যে তার নেগরানীও করেছেন। কেউ কেউ তো অনেক মনোযোগ দিয়েছেন আবার কেউ অল্প। কিন্তু আল্লাহর শোকর এ প্রচেষ্টা বিফল হয়নি।

উদাহরণস্বরূপ মুরদানের পীর আহমদ আলী শাহ্ যার প্রভাব বলয় অনেক প্রশস্ত ছিল ঐ এলাকার সমস্ত মহিলা এবং গণ্যমান্য লোকদের থেকে অঙ্গিকার নেন।

শুধু একজন নেতা অঙ্গিকার ভঙ্গ করে কিন্তু পরে তাকেও তওবা করে পীর সাহেব থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হয়েছে। কয়েকটি ঘটনা এমন হয় যে, অনেক সামর্থবান ব্যক্তি যারা নিজেদের মাল অনুপযুক্ত স্থানে খরচ করছিল তারা তা ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাকে দিয়ে দিল। এ ছাড়াও নদওয়ার 'প্রতিনিধিগণ' ও মুবাল্লিগীন বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে অনেক কাজ করেছেন। কায়েমগঞ্জের নিকট ফযরআবাদ জিলার এক গ্রামে মুসলমানগণ সরাসরি মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ঐ প্রতিনিধি দলের প্রচেষ্টায় তারা তওবা করে এবং মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলে দেয়।

ঐ জলসায় অস্ট্রেলিয়ার মাস্টার চারলস শিরাওয়াইট যার ইসলামী নাম মুহাম্মদ আব্দুল হক তিনি ইংরেজিতে বয়ান করেন নিজের ইসলাম গ্রহণের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করেন। স্যার আব্দুল কাদের তার উর্দু অনুবাদ করেন। মাওলানা শাহ সুলায়মান ঐ জলসায় তাসাউফের (আত্মশুদ্ধির) উপর এমন জ্বালাময়ী বয়ান করেন যে, তিনি নিজেও কাঁদছিলেন অন্যদেরকেও কাঁদাচ্ছিলেন। পরিশেষে এই বলে বয়ান শেষ করেন যে, ভাইসব! এখন হুঁশ জ্ঞান ঠিক নেই, সুযোগ পেলে পরে আবার কখনো বয়ান করব।

জনাব হাসান নিজামীর আকর্ষণীয় বয়ান

তারপর জনাব হাসান নিযামী বয়ানের জন্য দাঁড়ান। তিনি বললেন যে, আজ এক গালিনামা প্রচার হয়েছে তাতে নামে-বেনামে নদওয়াতুল উলামার শরীকদের গালি দেয়া হচ্ছে। আমি মনে করেছিলাম তাতে আমার নামও হয়তো আছে। আমি তালাশ করে দেখলাম আমার নাম নেই। এতে আমার বদনছীবীর জন্য আফসোস হলো। এজন্য আমি সদস্যের জন্য দুই রুপিয়া চাঁদা দিচ্ছি যাতে আমার নাম যদি এ কারণে বাদ দেয়া হয় যে, আমি নদওয়ার সদস্য নই, তাহলে এখন শামিল করে নেয়া হোক।

৫ জানুয়ারী নির্বাহী পরিষদের জলসায় মাওলানা শিবলী বেশ সানন্দে অংশগ্রহণ করেন এবং অধিকাংশ প্রস্তাবের তিনিই উপস্থাপক ছিলেন।

মাওলানার অব্যাহতির স্বীকৃতি

ঐ দিন সকালবেলা মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী প্রস্তাব হিসাবে মাওলানা মুহাম্মাদ আলীর অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করে ঘোষণা করেন যে, তিনি অব্যাহতি গ্রহণ করেছেন। এ জলসা তার অব্যাহতি মঞ্জুর করছে এবং মাওলানা মসিহুযযামানকে তিন বছরের জন্য নাযেম হিসেবে মঞ্জুর করছে।

৬ জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন। মাওলানা শিবলী স্যার আব্দুল কাদের সাহেবের আলোচনার পর সভাপতির ভাষণ দেন। আলোচনায় তিনি 'নদওয়াতুল উলামা' প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর সারগর্ভ বক্তব্য দেন। পূর্বে তিনি শিরোনাম টুকে রেখেছিলেন, তার আলোকেই বক্তব্য রাখছিলেন। আলোচনা শেষে এ প্রস্তাব রাখলেন যে, দারুল উলূমের একটি কামরা শুধুমাত্র আলেমদের আর্থিক সাহায্যে নির্মিত হবে। এই সুবাদে কিছু নগদ কালেকশনও হয়ে যায়।

মাদরাজে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারের একটি বড় লাভজনক দিক এই ছিল যে, মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী ও মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাইসহ নদওয়ার সদস্যবৃন্দের সরাসরি আলোচনার সুযোগ হয়। আর এতে করে পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝিগুলোরও অবসান হয়।

উক্ত জলসা অনুষ্ঠিত হওয়ার দুমাস পূর্বে মাওলানা শিবলি-এর নাম নদওয়া পরিচালনা কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। [হায়াতে শিবলীতে রয়েছে তার নাম ঐ সময় কমিটির তালিকায় ছিল। অথচ বাস্তবতা এর বিপরীত। তখনও তার নাম কমিটিতে যোগ হয়নি।] তাই তাদের সাক্ষাতের দৃশ্যটি খুবই মনোরম ছিল। পারস্পরিক সাক্ষাত ও কথোপকথন দ্বারা কু-ধারণার কালো মেঘ ও পরিবেশের ধূসরতা ভেদ করে আকাঙ্ক্ষার প্রভাব উষার চোখ-ধাঁধানো আলো আরেকবার চমকিয়ে উঠল। তবে দুঃখজনক হলেও বাস্তব যে, এ পরিবেশ বেশি সময় রইল না। মতানৈক্যের ভিত অটুট রয়ে গেল। এত কিছুর পরও 'নদওয়া' তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সংকটাপূর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করেই চলছিল।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ও মাওলানা শিবলী রহ.

মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. শারীরিক দুর্বলতা ও দুরারোগ্য ব্যাধির পাশাপাশি পরিচালনা কমিটির পরস্পর মতানৈক্য ও টানাটানির কারণে তো দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির জন্য কয়েকবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পরিষদের পীড়াপীড়িতে দায়িত্ব ছাড়তে পারলেন না। অবশেষে ১৩২১ হিজরী সনে তার পদত্যাগনামা গৃহীত হয়।

সমস্যার বিস্তারিত বিবরণ

সমস্যাগুলো বুঝার জন্য মাওলানা মুঙ্গেরী রহ. ও মাওলানা শিবলী রহ. বুযুর্গদ্বয়ের মধ্যকার সম্পর্ক এবং নদওয়া পরিচালনা কমিটির দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া প্রকৃত অবস্থা ভালোভাবে উপলব্ধি অসম্ভব।

উক্ত বুযুর্গদ্বয়ের পারস্পরিক প্রথম মুলাকাত ঐ সময় হয়, যখন মুঙ্গেরী 'নদওয়া'-এর কোনো এক সভায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে কানপুর যান। তখন মাওলানা শিবলী রহ.-এর মধ্যে ইতিহাস জ্ঞান, সাহিত্যভাব, তত্ত্ব-গবেষণার প্রকৃতি দেখে, তাকে অতি উপযোগী ব্যক্তিত্ব মনে করেন এবং খুবই উষ্ণতা ভরে তাকে অভিবাদন জানালেন এবং তার মনতুষ্টির জন্য সার্বিকভাবে চেষ্টা করলেন। অবশ্য তার কিছু ব্যতিক্রম চিন্তাধারার কারণে এক শ্রেণির আলেমগণ তাকে অপছন্দও করতেন এবং তিনি তাদের কাছে অনেকটা অপরিচিতও ছিলেন। এ জন্যে মুঙ্গেরী রহ. এ চেষ্টা করতে লাগলেন যে, আলেমদের সাথে তার দেখা সাক্ষাত হোক। এতে তার প্রতি আলেমদের কাপালিকতা-ভুলধারণার নিরসন হবে। এ জন্য নদওয়াতুল উলামার বিভিন্ন সভা-সেমিনারে তাকে আলোচনা করার সুযোগ দিতেন। যাতে তিনি স্বীয় চিন্তা-চেতনা মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারেন।

'নদওয়াতুল উলামায়' যে সব ব্যক্তির সহিত সর্ব প্রথম মাওলানা শিবলী সাহেবের মতভেদ সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন এলাহাবাদী ও মাওলানা আব্দুল হক হক্কানীও ছিলেন। তাদের দৃষ্টিতে মাওলানা শিবলী সাহেবের মধ্যে এমন কিছু দুর্বলতা দেখা যায়, যেগুলোর উপস্থিতিতে তার দ্বারা কোন সহযোগিতা নেওয়া কঠিন। দুর্বলতা হলো- সীমাতিরিক্ত আত্মসম্মানবোধ। উক্ত বুযুর্গদ্বয় এ বিষয়টি নিয়ে মাওলানা মুঙ্গেরী রহ.-এর সাথে আলোচনা করে তাকে এ কথা বুঝাবার চেষ্টা করলেন, এহেন পরিস্থিতিতে মাওলানা থেকে বেশি দিন সহযোগিতাও নেয়া যাবে না, উপকৃতও হওয়া যাবে না। তবে আপস করার এক পদ্ধতি হতে পারে যে, তার চিন্তাধারা ও পলিসি গ্রহণ করে নেওয়া।' তাহলে এমনিতেই এই টানাটানি-মতানৈক্যে স্থবির হয়ে যাবে।

কিন্তু এ কৌশলটি নদওয়ার চিন্তাধারা ও মুখ্য উদ্দেশ্যের জন্য বড় ক্ষতিকর। আধ্যাত্মিকতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি, তথা ঈমানী-চেতনা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করা। তার সাথে আপস, নদওয়ার এ ভিত দুটির মূলে কুঠারাঘাত হানবে এবং এ সংকটপূর্ণ ও স্পর্শকাতর অবস্থা স্থায়ী হবে না। এ ছিল উক্ত বুযুর্গদ্বয়ের চিন্তা।

অন্য দিকে মাওলানা মুঙ্গেরী রহ. ভাবছেন, পৃথিবীর কোনো মানুষই ভুল ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। তাই বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতার দাবী হলো সেসব দুর্বলতাকে দৃষ্টির অগোচরে রেখে তার গুণাগুণ ও সৌন্দর্য দ্বারা উপকার নেওয়া। দারুল উলূমের অন্য একজন শিক্ষকের বেলায়ও তিনি অনুরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিলেন। তার ব্যাপারেও কারো কারো আপত্তি ছিল। হযরত মুঙ্গেরী রহ. মাওলানা আব্দুল

লতীফ ও সাইয়িদ আব্দুল হাই সাহেবদ্বয়ের নামে লিখিত এক যৌথ চিঠিতে তার মনোভাব এভাবে তুলে ধরেছিলেন–

'যেহেতু কাজের লোক দুষ্প্রাপ্য; বরং না থাকার মতই। এ পরিস্থিতিতে আমি যখনই কারো মধ্যে কোন যোগ্যতা প্রত্যক্ষ করি, তাকে সে হিসেবে মূল্যায়ন করতে আমি কুণ্ঠাবোধ করি না এবং তার দ্বারা লাভবান হওয়ার চেষ্টা করি। যদি তার মধ্যে কোন ত্রুটি থাকে, তখন ভাবি যে, তার বিচ্যুতির অনিষ্টতা থেকে সতর্কভাবে বেঁচে থেকে তার যোগ্যতা ও গুণ দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। কেননা পৃথিবীতে (নবী-রাসূল ছাড়া) এমন একজন লোকও মিলবে না; যার মধ্যে কেবল গুণ আর সৌন্দর্য্য রয়েছে, কোনো অসুন্দর ও ত্রুটি নেই।

আমার মতে এ ধরনের সহিষ্ণুতা ছাড়া এই কাজ করা সম্ভব নয়। এরূপ মন্তব্য তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রেই করতেন। এর দ্বারা তার রীতি-নীতি ও কর্মপন্থা দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে যায়।

তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যদি কারো মধ্যে সামান্যতম যোগ্যতা থাকে এবং কোন ডিপার্টমেন্টে তাকে উপযোগী মনে হয়, তখন তার অন্যান্য দুর্বলতাকে পাশে ঠেলে দিয়ে ঐ যোগ্যতা ও গুণের স্বীকৃতি উদার মনে দেওয়া উচিত এবং তার প্রাপ্য সম্মানে বিন্দুমাত্র ত্রুটি না করা উচিত। এ উদার মানসিকতা ও উন্নত চরিত্রের কারণেই তিনি মাওলানা শিবলী সাহেবের সহিত উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করতেন এবং অধিকাংশ সময় তার মতকে অগ্রাধিকার দিতেন এবং বিভিন্ন উপায়ে তাকে নদওয়ার ঘনিষ্ঠ থেকে আরো ঘনিষ্ঠ করার তৎপরতা অব্যাহত রেখেছিলেন।

আর এ কারণে মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন এলাহাবাদী নদওয়া থেকে সরে যান। তবে মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী তখনও কমিটিতে ছিলেন। কিন্তু পূর্বের মত তৎপরতা দেখাতেন না।

ভুল ধারণা

কিন্তু মাওলানা শিবলী সাহেব মুঙ্গেরী রহ.-এর আচরণকে যা শুধুমাত্র আন্তরিকতা ও ভালোবাসার ভিত্তিতে ছিল, দুর্বলতা ও তার ব্যক্তিত্ব দ্বারা স্বার্থ চরিতার্থ করছেন বলে মনে করেছেন। কেননা মাওলানা মুঙ্গেরী রহ. প্রায়শঃ তার মতকে অন্যদের মতের উপর প্রাধান্য দিতেন এবং তার পরামর্শ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শুনতেন। মাওলানা শিবলী সাহেব মনে করেছেন, তাকে নদওয়ার খ্যাতি ও প্রচার-প্রসারের জন্য পাবলিশার ও ভেঁপু হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর চেয়ে বেশি তার কোন দাম নেই।

তার মনে এ ভুল ধারণা জন্মানোর আরেকটি কারণ ছিল। তিনি নদওয়ায় আসার পূর্বে আলীগড় মহামেডান কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তখন থেকেই তিনি কঠোর সাধনা ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দিয়ে আসছিলেন।

তখন তিনি সমাজে একজন ইসলামী চিন্তাবিদ ও মহান সংস্কারক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। (তাই তিনি ভেবেছিলেন, নদওয়া তার ব্যক্তিত্বকে ব্যবহার করতে চাচ্ছে।)

মাওলানা মুঙ্গেরী রহ.-এর ইচ্ছা ছিল, জনমনে মাওলানা শিবলী সাহেবের ব্যাপারে যে ভুল ধারণা জন্মেছে তা দূর হয়ে যাক। কেননা এছাড়া না তিনি জনগণের কোনো উপকারে আসবেন, না নদওয়ার জন্য কোনো কল্যাণকর হিসেবে পরিগণিত হবেন। আলহামদুলিল্লাহ! নদওয়ার বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মতৎপরতায় তার উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণে উক্ত লাভটি অনেকটাই অর্জিত হয়েছিল। জনগণের ভুলধারণাগুলো দূর হতে শুরু করে এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ তাদের উল্টো ধারণা পাল্টাতে বাধ্য হয় এবং জ্ঞানী মহলও তার তুখোড় মেধা, জ্ঞান, সাহিত্যভাব ও চিন্তা-গবেষণার মূল্যায়ণ করতে শুরু করে।

তিনি আজমগড় ও আলীগড় থাকাবস্থায় বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু একজন দায়ী ও সংস্কারক হিসেবে তার যশখ্যাতি শুরু হয় নদওয়াতে আসার পর থেকে। এ পরিবেশ দেখে তিনি মনে মনে নিজেকে তাদের আবশ্যক একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তি ধারণা করতে শুরু করেন এবং নদওয়ার সদস্যদের প্রতি এ কু-ধারণা করে বসেন যে, তারা তাকে ঢোলকের মত ব্যবহার করতে চাচ্ছে। তার ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করছে।

তার মনে জন্ম নেওয়া এ ভুল ধারণার প্রকাশ ঘটে তারই লেখা এক চিঠির ভাষ্যে। যা তিনি ১৯০২ সালে মাওলানা শেরওয়ানীকে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন। চিঠির এক বাক্যতেই পূর্ণ ঘটনা লুকায়িত ছিল। জ্ঞানী মাত্রই তা পাঠ করলে বুঝতে পারবেন যে, এ বাক্যের আড়ালে কী প্রেক্ষাপট লুকায়িত থাকতে পারে?

তিনি লিখেছিলেন– আমি এখন নদওয়া থেকে নিস্কৃতি চাই। আমাকে ঢোলের মত ব্যবহার করা হচ্ছে। আরে এ হীনস্বার্থ উদ্ধারের জন্য তো আরও লোক ছিল। দুঃখ পেলাম মুসলমানদের মনে স্বার্থপরতা রয়েই গেল। তারপর তাদের মধ্যকার এ বিরোধ আরও বেগবান হয়। যা বহু আগ থেকেই চলে আসছিল।

বিরোধের মৌলিক কারণ

তাদের মধ্যকার বিরোধগুলোকে মৌলিকভাবে তিনটি ভাগে বণ্টন করা যেতে পারে।

* মানসিকতা ও স্বভাব-প্রকৃতির ভিন্নতা।

* শিক্ষা-দীক্ষা ও পরিবেশের বৈচিত্র।

* মনোভাব ও চিন্তাপদ্ধতির ভিন্নতা।

প্রাথমিকভাবে এ বিশ্লেষণ কিছুটা অতিরঞ্জন ও আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে সকল বিরোধের কারণ উক্ত তিনটি বিষয়। শুধু এ ব্যক্তিদের বেলায় উক্ত নীতি সীমাবদ্ধ নয়। বরং পৃথিবীতে যত বিরোধ বিশৃংখলা হয়েছে, হচ্ছে, তার পিছনে এ তিনটি জিনিসই মূলত কারণ। তবে সবচেয়ে বড় কার্যকর ও নগদ কারণ ছিল মেজাজের ভিন্নতা।

১. মেজাজের ভিন্নতা–

মাওলানা শিবলী ছিলেন অত্যন্ত কঠোর মেজাজের। এ ব্যাপারে সাক্ষী তারাই, যারা তার লেখা সেইসব পত্র অধ্যয়ন করেছেন, যেগুলো তিনি বিভিন্ন সময়ে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী, মাওলানা সাইয়িদ আবদুল হাই বা অন্যান্যের কাছে লিখেছিলেন। মেজাজের এই কঠোরতা বা স্বভাবের তীব্রতা কোন চারিত্রিক দোষের ফল ছিল না। বরং তা তিনি নিজের মাতাপিতা থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন রাজপুত্র এবং তার মধ্যে ওই বংশের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রাকৃতিকভাবেই বিদ্যমান ছিল।

তার বংশীয় মেজাজ বুঝার জন্য তারই পরদাদা শেওরাজ সিং-এর ইসলাম গ্রহণের উপাখ্যানটি সহায়ক হবে। তারপর দাদা সম্পর্কে এ ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একদিন তিনি গ্রীষ্মকালের দ্বি-প্রহরে প্রচণ্ড উত্তাপের সময় কোথায় থেকে জানি আসলেন এবং খুব পিপাসায় কাতর হয়ে সোজা রন্ধনশালায় চলে গেলেন! পায়ের পাদুকা খোলার কথাও মনে ছিল না। অবস্থা দৃষ্টে তার বড় ভাবী বিদ্রোহী কণ্ঠে বলে উঠলেন– এতো দেখি তুর্কী (মুসলমান) হয়ে গেছে। [তুর্কী বলতে তখন মুসলমানই বুঝানো হত। কেননা তুর্কীয় মুসলমান ছিল এখানে তিরস্কারের জন্য। শত্রুর নাম দ্বারা তাকে বিদ্রুপ করা হয়েছে। -অনুবাদক] জুতা পরেই রান্না ঘরে চলে এসেছো, সব আহার ভরেছে পেটে? শিবরাজ সিং ভাবীর অত্যুক্তি শুনে গর্জে ওঠে বললেন– আমাকে তুর্কী হওয়ার অপবাদ দিয়েছে? দাঁড়াও! আমি সত্যি সত্যিই তুর্কী হয়ে যাব।

যেই কথা সেই কাজ। তৎক্ষণাত ঘর ত্যাগ করে এলাকার মসজিদে চলে আসলেন এবং স্থানীয় দরবেশের হাতে ইসলামের অমীয় সুধা পান করে দুনিয়ার সকল তৃষ্ণার অবসান ঘটালেন।

পূর্ব পুরুষদের এই ছাপ মাওলানা শিবলীর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তার মেজাজের মধ্যেও অনরূপ ক্ষীপ্রতা ও প্রখরতা এবং শ্লাঘার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল।

অন্যদিকে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ. ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম স্বভাবের অধিকারী। বাল্যকালে তার স্বভাব-আকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে স্বগোত্রের কোনো কোনো বুযুর্গ এ মন্তব্যও করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা তার মধ্যে যেন কোনো ক্রোধই সৃষ্টি করেননি। মাওলানা শাহ্ কারামাত আলী রহ. যার থেকে তিনি যৌবনের প্রারম্ভে দীক্ষা লাভ করেছেন। তিনি তাকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার বিশেষ উপদেশ দিয়েছিলেন। আমরণ তিনি এ উপদেশের উপর অটল ছিলেন। মাওলানা মুঙ্গেরী রহ. এ স্বভাবের কারণেই মাওলানা শিবলী রহ.-এর সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ অব্যাহত রেখেছিলেন।

২. শিক্ষা-দীক্ষা ভিন্নতার রূপ

উক্ত বুযুর্গদ্বয়ের প্রতিপালন ও দীক্ষাঙ্গনের মাঝে বিস্তর ব্যবধান ছিল। মাওলানা শিবলী রহ.-এর চিন্তা ও মেধা বিকাশে আলীগড়ের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। তিনি আরনলড-এর শিষ্য ছিলেন এবং স্যার সাইয়েদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিলেন, যদিও উভয়ের মাঝে চিন্তা-চেতনার ভিন্নতা ছিল। আলেম ও মাশায়েখদের সঙ্গে তেমন উঠাবসা ছিল না। আলীগড়ের ভালোমন্দ দিকগুলো তার চোখের সামনে ছিল। আর মানবীয় বৈশিষ্ট্য তো সকলের মাঝে আছেই।

ভিন্ন পরিবেশের এ মানুষটির জন্য নদওয়ার উত্তাল সমুদ্রে শান্ত থাকা, নতুন পরিবেশে নিজের পুরাতন পরিবেশের চিন্তাগত পার্থক্যকে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা, আধ্যাত্মিকতার রহস্য অনুধাবন করা, এসব কিছুই স্বভাবত তার জন্য কঠিন ছিল। শেষ বয়সে তিনি যে নতুন পরিবেশে এসে উঠেছেন (রাসূলের আদর্শ গ্রহণের পরিবেশ) তা থেকে তিনি তখনও বহু দূরে অবস্থান করছিলেন। এক কথায় এ পরিবেশ ছিল, তার পরিবেশের সম্পূর্ণ বিপরীত। অন্যদিকে মাওলানা মুঙ্গেরী রহ. বাল্যকাল থেকেই অন্তরাত্মার অধিকারী সাধকদের সন্ধানে ছিলেন ও তাদের স্পর্শে কাটিয়েছেন।

মাওলানা মুঙ্গেরী রহ.-এর নিকট মাবনজীবনের তাৎপর্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য মাওলার সঙ্গে বান্দার আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ভিন্ন অন্য কিছু হতে পারে না। এ সম্পর্ক ভালোবাসার, আশা ও ভয়ের। এ তিনটি উদ্দেশ্য অনুপস্থিত থাকলে এ সকল মেধার দৌড়, খুৎবা-ভাষণ, সাহিত্যিকতা, বাগবৈদগ্ধ্যতা, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব জ্ঞানের বিশালতা কেবল ইন্দ্রিয়পূজা, আড়ম্বরতা ও দৃষ্টিভ্রমেই পর্যবসিত হবে। মুসলমানগণ স্বীয় মতাদর্শের কারণে এ কথাগুলো বিশ্বাস না করে থাকতে পারেন

না। যদি ইলমের আবেদন অনুযায়ী তার জীবন বিশ্বাস, দৃঢ়তা ও আল্লাহর সহিত সম্পর্কের জীবন্ত, স্পন্দনশীল আদর্শ হতে না পারে, তাহলে জ্ঞানের দাবী কখনই তার দ্বারা পূরণ হবে না। জ্ঞানের দাবী হলো এর শাণিত অসী দ্বারা ধর্মহীনতা, নাস্তিকতা, খোদাদ্রোহীতায় উদ্বুদ্ধকারী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধ্যান-ধারণার অবসান ঘটানো। তার দাবী হলো হাজার হাজার মুসলমানের চিন্তা-চেতনার বিশুদ্ধতা ও সমাজের বহু দায়িত্ব তার স্কন্ধে তুলে নেওয়া এবং সে দাবী অনুযায়ী জ্ঞানী তার জীবন পরিচালনা করা।

আমাদের অবশ্যই আধুনিক শিক্ষা লাভ করতে হবে। কিন্তু সর্বদা নিজের মধ্যে এ আধ্যাত্মিক অনুভূতি অবশ্যই জাগ্রত রাখতে হবে যে, এ সবের মূল লক্ষ্য আত্মার উন্নতি, খোদার প্রেম-ভালোবাসা, মারেফাত অর্জন এবং তার সন্তুষ্টি ও হুকুম অনুযায়ী জীবন নির্মাণ করা। এতটুকুই যথেষ্ট, এ মহৎ উদ্দেশ্যকে যদি সদা জাগ্রত রাখতে পারি, তাহলে অবশ্যই আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ যে আলোই ছড়াবে এবং আমরা এ দৃষ্টান্তহীন কর্মপন্থায় সফল হব যার দুঃসাহস শেষ কালে নদওয়াতুল উলামা-ই করেছে।

নদওয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মাওলানা মুঙ্গেরী রহ. এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে অবিচল ছিলেন। তাই মাওলানা শিবলী রহ. বিদ্যাবুদ্ধির উচ্চতা ও দীনের বহু খেদমত আঞ্জাম দেওয়া সত্ত্বেও তার উদ্দেশ্যের মাপকাঠিতে পরিপূর্ণ উত্তীর্ণ হতে পারলেন না এবং এ খেলা সম্পর্কে মাওলানা শিবলী রহ.-এর কোনো অনুভূতি ছিল না।

মাওলানা মুঙ্গেরী রহ. নদওয়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির কিছুকাল পূর্বে মাওলানা শেরওয়ানীকে লক্ষ্য করে খুবই সরল ভাষায় চাপা পেরেশানী ও অন্তরজ্বালা নিয়ে একথাগুলো বলেছিলেন।

'এখন আমাকে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা সম্পর্কে কিছু কথা বলতে হচ্ছে যা আমার মাথায় ধরছে না।' এর ব্যবস্থাপনা-পরিচালনা কীরূপে হবে? তার কোনো আর্থিক তহবিল নেই। না কোনো শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে। না কোনো আলেম এদিকে মুখ দিচ্ছেন। একজন মাওলানার (শিবলী) যা-ও কিছু দৃষ্টি পড়েছিল, তার সাথেও আবার মুন্সী আতহার আলী সাহেবের খাপ খাচ্ছে না। [ইনি মাওলানা শিবলী সাহেবের ঘোরবিরোধী ছিলেন] তাছাড়া মাওলানার জ্ঞানের সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, তার দক্ষতা ও যোগ্যতা দ্বারা অনেক কাজ হবে। কিন্তু চিন্তা করে বলুন যে, আমি কী করতে পারি? কেননা

আমি এতই দুর্বল যে, এ পাহাড়সম বিপদ সহ্য করা আমার পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়।

এদিকে কোনো কর্মদ্যমী লোকও মিলছে না। তার চেয়ে বড় বেদনা এই যে, এ আন্দোলনের মূল ভিত্তিই ধসে পড়ছে, আলেম-উলামাদের যশ-খ্যাতি ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। আবার মাওলানা শিবলী সাহেবও গা ঢাকা দিয়ে ঘরে বসে গেছেন।' –আল-জামেয়া, জুমাদাল উলা, ১৩১৫

এ সকল মৌলিক ও প্রারম্ভিক মতবিরোধ সত্ত্বেও মাওলানা মুঙ্গেরী রহ. দশ বছরেরও কিছু বেশি কাল, সকল ঝড়-ঝাপটা সহ্য করে গেছেন। কিন্তু নদওয়ার উপর সামান্য আঁচড়ও লাগতে দেননি।

প্রাথমিক কয়েকটি বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার এই প্রজ্ঞাপূর্ণ ও ত্যাগী আচরণ সত্ত্বেও মাওলানা শিবলী তার সাথে এমন ব্যবহার দেখানো শুরু করলেন, যার কারণে বাধ্য হয়ে মাওলানা হুসাইন এলাহাবাদীসহ আরও কয়েকজন নদওয়া থেকে কেটে পড়েন। তার সে সব আচরণের বিবরণ দিতে গিয়ে মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই একস্থানে লিখেছেন।

'মাওলানা শিবলী সাহেবের স্বভাব শুরু থেকেই এমন ছিল যে, তিনি কারও মত সহ্য করতে পারতেন না। আর কেউ কোনো মত প্রকাশ করতে চাইলে তিনি তাকে খুবই রূঢ় ভাষায় ভর্ৎসনা করে চুপ করিয়ে দিতেন।'

মাওলানা মুঙ্গেরী রহ. যেহেতু মাওলানা শিবলী সাহেবের গুণগ্রাহী ছিলেন এবং তার খুব খেয়াল রাখতেন, তাই তার থেকে এ ধরনের আচরণের তিনি মোটেও প্রত্যাশী ছিলেন না। এ জন্য তিনি মন-মস্তিষ্কে খুব আঘাত পেতেন। কিন্তু নদওয়ার উপকারার্থে তাকে সহ্য করে নিতেন।

১৬ জিলহজ্ব ১৩২০ হিজরী মোতাবেক ১৬ মার্চ, ১৯০৩ খৃস্টাব্দ নদওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় মাওলানা মুহাম্মাদ হুশিয়ারপুরী সাহেব দারুল উলূমের পরিচালনার জন্য মাওলানা শিবলী সাহেবের নাম উত্থাপন করেন। ঘটনাক্রমে তা গৃহীতও হয়। অন্য দিকে মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ. সামাজিকতা রক্ষা করে নিজের ইস্তফানামা পেশ করেন। কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করতে রাজি হননি।

দ্বিতীয় দিন পুনরায় কমিটির মিটিং হয়। এ দিন তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করলেন যেন তার আবেদন গৃহীত হয়। তাই তিনি বললেন– গতকাল আমার আবেদনকে নাকচ করা হয়। খুব ভেবে চিন্তে দেখলাম, তা গৃহীত হলেই সকলের জন্য কল্যাণকর হবে। অতএব, সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। আমার আবেদন গ্রহণ

করার হোক। সকলে একবাক্যে বলে উঠলেন, আমরা কিছুতেই তা গ্রহণ করতে পারব না। আপনি ইতোপূর্বেও ১৩১৩ হিজরীর রজব মাসের জলসায় এবং আরো কয়েকবার নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে লিখিত ও মৌখিক ইস্তফা চেয়েছেন। কিন্তু আমরা আপনার এ আবেদন গ্রহণ করতে অক্ষমতা জানাচ্ছি।

কারণ নদওয়ার জন্য আপনার মত সৎ ও সহমর্মী দ্বিতীয় কাউকে আমরা দেখছি না। আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তার জীবন সাধনাকে নদওয়ার জন্য অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছেন। যার সুফল আজও নদওয়া উপভোগ করছে। তাছাড়া আপনি সকলের নিকট একজন নদওয়ার খাদেম হিসেবে সমাদৃত ব্যক্তি। তাই নদওয়ার কোনো কাজে আপনি যখন লাখনৌতে অবস্থান করতেন, অধিকাংশ সময় লোকেরাই আপনার খাবার দাবারের দায়িত্ব বহন করে নিত এবং বাহন মালিকেরা আপনার যাতায়াত খরচ নিত না। কখনো নিয়েছে তো, তা আমাদের জোর জবরদস্তির কারণে। কাজেই এমন মহৎ ও সমাদৃত যোগ্য ব্যক্তিকে আমরা কিছুতেই হাত ছাড়া করতে পারছি না।

১৩১৩ হিজরীর জলসায় আপনি আর্থিক দায়িত্ব নিতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। সে দিন আপনার কথা মূল্যায়ন করে সে দায়িত্বের জন্য একটি নতুন অর্থ পরিষদ গঠন করা হয়। যার সম্পাদক করা হয় মাওলানা খলীলুর রহমান সাহেবকে। তিনি ১৩১৯ হিজরী পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত মুন্সী এহতেশাম আলী সাহেব দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

অতএব, আমরা যদি কোনো যোগ্য পরিচালক পেয়ে যাব তখনই আমরা আপনার এ আবেদন গ্রহণ করব। অন্যথায় আপনার বিচ্ছেদ এ প্রতিষ্ঠানকে বহু শঙ্কা-দুর্গতি ও বিপদের সম্মুখীন করবে। কাজেই আপনার এ মুহূর্তের আবেদনটি সময়োপযোগী নয়। আর আপনার এ ধরনের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সমীচীন নয়। কেননা নদওয়া একটি দীনী মারকাজ তার ক্ষতি সকল মুসলমানেরই ক্ষতি। এ মুহূর্তে ব্যক্তিগত সমস্যাকে সামনে না আনার আবেদন জানাচ্ছি।

অব্যাহতি চাওয়ার মূল কারণ

মূলত তখনকার একটি ঘটনা মাওলানাকে পদত্যাগে বাধ্য করে। যদি সে উপাখ্যানের সম্মুখীন না হতেন তাহলে অন্তত এতটুকু আশা করা যেত যে, তিনি এত দ্রুত এ পদক্ষেপ নিতেন না। তার এ সোনালী কাল নদওয়া ও মুসলমানরা আরোও কিছুদিন উপভোগ করতে পারত। মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই রহ.

সে ঘটনাকে তার এক ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধে লিখে রেখেছিলেন। ঘটনার পটভূমি উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন।

সে সময় মাওলানা শিবলী সাহেব হযরত মুঙ্গেরী রহ.-এর নামে পরপর কয়েকটি পত্র পাঠান। যার মধ্যে তিনি মাওলানা মুঙ্গেরী রহ.-এর প্রতি কিছু অমূলক আপত্তি ছুঁড়ে মারেন। [মাওলানা সাইয়িদ সুলায়মান নদভী রহ. 'শিবলী রহ.-এর জীবনী' নামক গ্রন্থের একস্থানে সে চিঠিগুলোর বিষয়বস্তুর প্রতি প্রচ্ছন্নভাবে ইঙ্গিত দিতে গিয়ে লিখেছেন- মাওলানা শিবলি সে সময় নদওয়ার সদস্যদের নামে ক্রোধের অগ্নিতাপ ছড়িয়ে চিঠিতে লিখতেন। তবে সে চিঠিগুলো বহু অনুসন্ধান করেও পাওয়া যায়নি। তাহলে বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে সকলের সামনে উঠে আসত।]

সকল প্রিয়জনের চেনা হয়ে গেছে। বাস্তবে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রকৃত বন্ধু হতে পারে না।

এ চিঠিটি ডাক যোগে মাওলানা সাইয়িদ সাহেবের নিকট পৌঁছার আগেই মাওলানা খলীলুর রহমান সাহারানপুরী-এর একটি চিঠি মাওলানা মুঙ্গেরী রহ.-এর নিকট এসে পৌঁছে। যথাসম্ভব চিঠিটি ইস্তফা সম্পর্কে ছিল। প্রবল ধারণা হয়েছিল যে, মাওলানা সাহারানপুরী রহ. তাকে ইস্তফা না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং মাওলানা শিবলীকে এ বিষয়ে বাধ্য করলেন যে, তিনি যেন এ ধরনের আচরণ অবশ্যই বর্জন করেন। অন্যথায় নদওয়া থেকে চলে যান।

কিন্তু এ পরামর্শটি মাওলানা মুঙ্গেরী রহ.-এর স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। এ চিঠি দেখে তার উক্ত চিঠিতে আবার এ কথাগুলো সংযোজন করেন।

উক্ত চিঠি লেখার পর মাওলানা সাহারানপুরী সাহেবের চিঠি আসে- আমি তার উত্তরে লিখেছি। হযরত! আমি এর উপযুক্ত নই যে, কারো সাথে দায়িত্ব নিয়ে টানা হেঁচড়া করব। আমি এত লিখেছি যে, আমার নদওয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণ কাগজপত্রে প্রকাশিত হয়ে গেছে। যদি সব কারণ উল্লেখ করতে যাই কয়েক পাতা লেগে যাবে।

তার এ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পিছনে আরেক বিষয়ও কাজ করেছে। তা হলো- এ পূর্ণ সময়ে স্বীয়ভূমি মুঙ্গের-এর সঙ্গে তার দীনী সম্পর্ক ছিল। যার কারণে বিহার অঞ্চলের লোকদের নিকট তিনি একজন গ্রহনযোগ্য ও অতিপ্রিয় ব্যক্তি হিসেবে সমাদৃত হয়ে গেছেন।

মুঙ্গের অঞ্চল ছাড়াও দরভাঙ্গা, পাটনা এবং অন্যান্য জেলা শহরে তার অনেক শিষ্য-অনুসারী ছিল। যারা তাকে নিজেদের আধ্যাত্মিক রাহবার ও অভিভাবকরূপে মনে প্রাণে মেনে নিয়েছেন। তাই তিনি যখন কোন কাজে সেসব এলাকায় যেতেন, সেখানে এক ধরনের আনন্দ বসন্ত পরিলক্ষিত হত এবং হেদায়াতের আলো বাতাসে ছড়িয়ে পড়ত। দলে দলে লোকেরা তার দরবারে আসত। তারা এ মহা সুযোগের যথাযথ মূল্যায়ণ করত এবং তার অপেক্ষার প্রহর গুণতে থাকত।

অপরদিকে তিনিও নির্ভেজাল ও সরল মনের অধিকারী মুসলমানদের এ প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে হাড়ে হাড়ে অনুভব করতেন এবং তাদেরকে দীনী পথ-প্রদর্শন করা নিজের অত্যাবশকীয় কর্তব্য জ্ঞান করতেন। হযরত ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদীর সহিত সংশ্লিষ্ট লোকেরা এবং বিশেষভাবে বিহারের অধিবাসীরা মাওলানা মুঙ্গেরী রহ.-এর সহিত গভীর সম্পর্ক রাখত।

১৩১৩ হিজরী সনে মাওলানা গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ.-এর ইন্তেকালের পর অধিকাংশ লোকেরা তার সাথেই সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এ জন্য তিনি বিহারে যাতায়াতও করতেন বেশি। [যার সূচনা ১৩০০ হিজরী থেকে] এ সকল কারণে হেদায়াত অন্বেষী লোকদের দিকে মনোনিবেশ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। নদওয়ার তখনকার অবস্থা কুদরতীভাবেই তাকে এ ময়দানে অনেকটা অগ্রসর করে দিয়েছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে নদওয়ার এ পরিস্থিতিতে উক্ত মিশনই তার জন্য বেশি উপযুক্ত ও সময়োযোগী মনে হয়েছিল।

পাটনা জেলার ইসলামপুর থেকে মাওলানা শেরওয়ানীকে উদ্দেশ্য করে লেখা এক চিঠিতে পরিষ্কার ভাষায় নিম্নের কথাগুলো তুলে ধরেছিলেন।

সেখানের (নদওয়া) শত্রু-মিত্ররা সর্বদিক থেকে অন্তরকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে এবং সকলেই অসহযোগিতা সে স্থানের তুলনায় এ অঞ্চলের লোকদের দৃষ্টিতে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে বহু গ্রহণযোগ্য করে দিয়েছেন এবং চারটি জেলায় এক উষ্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

মুঙ্গেরে অবস্থানের ইচ্ছা ঐ সব কারণে ছিল যার আলোচনা গত হয়েছে। ১৩১৬ হিজরী থেকে তার মনে এখানে আশার ইচ্ছা জন্ম নেয়। কিন্তু তখনো কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। আসল কথা হলো আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা নদওয়ার অনেক খেদমত নিবেন। তাই তখন সে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। এক চিঠিতে তিনি মাওলানা শেরওয়ানীকে লিখেছিলেন-

এখন মনে হালকা ইচ্ছা জাগে যে, মুঙ্গেরে অবস্থান করব। কারণ, সেখানের লোকেরা অনেক আগ্রহ প্রকাশ করছে। দেখুন! আল্লাহর কী মর্জী?

ইস্তফা দেওয়ার দ্বিতীয় কারণ

কাদিয়ানী সম্প্রদায় বিহার অঞ্চলে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেছিল। মুঙ্গের ও ভাগলপুর সম্পর্কেও এ আশংকা হচ্ছিল এ দু জেলার লোকেরা কাদিয়ানীদের ফাঁদে আটকা পড়ে যাবে।

এ ফেৎনার দার রুদ্ধ করতে এবং তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য একজন শক্তিশালী ব্যক্তির খুবই প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। আল্লাহর ইচ্ছা এ মহৎ কাজটি মাওলানা মুঙ্গেরী রহ.-এর জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল এবং এ কাজের জন্য কুদরতীভাবে সকল উপায় বের হয়ে গেল। (মাদরাসা পরিচালনার গুরু দায়িত্ব থেকে মুক্তি) অবস্থার বাস্তবতাই এ কথা সাক্ষী দিচ্ছিল যেন, আল্লাহ তাআলা মাওলানা মুঙ্গেরী রহ.-এর মাধ্যমে নদওয়ার যত কাজ নেওয়া দরকার তা নিয়ে নিয়েছেন। এখন তাকে রণসাজে সাজিয়ে এক নতুন রণাঙ্গনে লড়াই করার জন্য নিজ কুদরতী হাতে প্রস্তুত করে নিয়েছেন। যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ফয়সালা হয়ে গেছে যে, তিনি এখন কাদিয়ানী মতবাদের নব্য পাগলামির মূলোৎপাটন করতে যাচ্ছেন। আবারও বিশ্ববাসী সত্যের জয়ধ্বনি শুনবে।

অবশেষে ইস্তফা গৃহীত

সময় ছিল ১৩২০ হিজরীর শেষ প্রহর। তখন তিনি কানপুর ছেড়ে মুঙ্গেরে অবস্থান করতে শুরু করলেন এবং আমরণ এখানেই রয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। হঠাৎ একদিন তার পদত্যাগ খবর কাগজে প্রকাশিত হয়ে উঠল। যার শুধু নিয়মতান্ত্রিক স্বীকৃতি বাকী ছিল। [হযরত মুঙ্গেরী রহ. মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাইকে এক চিঠি মারফত জানান, 'আমি দেখছি যে, পরিস্থিতি যা সামনে আসছে তা খুব ভয়াবহ। তাই আল্লাহর মর্জি এটাই মনে হচ্ছে, আমি এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিই। তারপর নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন– আলহামদুলিল্লাহ! অনেক ভালো আছি। আত্মপূজারীদের বাদানুবাদ থেকে রেহাই পেয়েছি। আল্লাহ তাআলার সীমাহীন শোকর। ২৬ রবিউল সানী ১৩২১ হিজরী ১৯ জুলাই, ১৯০৩ ঈসায়ী মুতাবেক পরিচালনা পরিষদের এক জলসায় সাইয়িদ আব্দুল হাই রহ. হযরত মুঙ্গেরী রহ.-এর অব্যাহতি পত্র পেশ করেন। তখন বাধ্য হয়ে কমিটি নিম্নোক্ত বাক্য আওড়াতে আওড়াতে তা গ্রহণ করল।

'এ কমিটির সকলেই তার অব্যাহতির সংবাদে মর্মাহত। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, তিনি 'নদওয়াতুল উলামা'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা

করে পুরো জাতির উপর বিশেষতঃ আলেমদের উপর যে অনুগ্রহ করেছেন তার কৃতজ্ঞতা আদায় অসম্ভব। তার আন্তরিকতা, উদ্যম, সাহসিকতা বিশ্লেষণ করলে এ দায়িত্ব থেকে তার বিচ্ছেদ কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। এ কারণে ইতোপূর্বে আমরা তার আবেদনকে বহুবার নাকচও করেছি। এখন যেহেতু তিনি অতি অপারগতা জাহির করেছেন এবং খবরটি সংবাদ পত্রেও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাই পরিতাপের বিষয় হলেও আমরা তার আবেদন গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছি। আর নতুন পরিচালক নির্বাচনের কাজ বার্ষিক সম্মেলন পর্যন্ত স্থগিত রাখা হলো।'

সে দিন থেকে নদওয়ার সাথে তার গতানুগতিক সম্পর্কচ্ছেদ হলেও পরবর্তী বিভিন্ন সংকটাপূর্ণ মুহূর্তে তিনি নদওয়ায় আসা যাওয়া করতেন এবং দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা-এর বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতেন। মুঙ্গেরে অবস্থান ও দীনী বিভিন্ন খেদমত আঞ্জাম দেওয়া সত্ত্বেও তার মন সদাসর্বদা এ প্রতিষ্ঠানের সাথে ঝুলে থাকত এবং কখনো তাতে বিস্মৃত হতেন না। যে মহামূল্যবান চারাবৃক্ষে কলিজার রক্ত সিঞ্চিত হয়েছে, তাকে কি কখনো ভোলা যায়! [তার সবচেয়ে বড় দলীল হলো, সেখান থেকে বিদায় নেওয়া সত্ত্বেও স্বীয় পুত্রদ্বয় মাওলানা নুরুল্লাহ ও মাওলানা মিন্নাতুল্লাহকে শিক্ষা লাভের জন্য নদওয়াতেই পাঠিয়েছেন। অথচ তখন আরও বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানও ছিল।

বাস্তব সত্য

হযরত মাওলানা মুঙ্গেরী [আল্লাহ তাআলা তার কবরকে নূরান্বিত করুন] ধারাবাহিক অসুস্থতা, দুর্বলতা, ব্যস্ততা ও কঠোর সাধনা এবং পাশাপাশি উক্ত বিরোধ ও মনমালিন্য সত্ত্বেও নিজের সকল চিন্তা শক্তি ও কর্মদক্ষতাকে নদওয়ার জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন। আর কোনো দিন তার বদলা ও প্রতিদান গ্রহণ করেননি। যখন কেউ তাকে কোনো হাদিয়া দিত তিনি নদওয়ার জন্য বিলিয়ে দিতেন। যে উপদেশ মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাইকে দিয়েছিলেন, তা প্রথম নিজেই বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন।

হেজায থেকে লেখা এক পত্রে মাওলানা আব্দুল হাইকে নিম্নোক্ত উপদেশ বাণী উপহার দিয়েছিলেন।

'আপনি কখনো সাহস হারাবেন না। নিশ্চয়ই উচ্চ সাহসিকতা দ্বারা বহু কাজ হতে বাধ্য। আমি জানি আপনার আর্থিক সংকট রয়েছে। কিন্তু আপনিও ভালোভাবে জ্ঞাত যে, পৃথিবীতে যারাই কিছু করেছেন, দারিদ্র্য, নিঃস্বতা এবং অল্পেতুষ্টির সাধনায় করেছেন তাদের নাম ইতিহাসের পাতায় আজও স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।'

পঞ্চম অধ্যায়

কাদিয়ানীদের মোকাবেলা

মাওলানা মুহাম্মাদ আলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যার আলোচনা ছাড়া এই ইতিহাস থেকে যাবে অসম্পূর্ণ, তাহলো কাদিয়ানীদের মোকাবেলা এবং তাদের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম। তিনি এ কাজের জন্য নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করেছেন। আর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সফল না হয়েছেন ততক্ষণ পর্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস নেননি।

তিনি কাদিয়ানীদের প্রতিরোধে একশর বেশি বইপুস্তক রচনা করেছেন, যার ৪০টি তার নিজ নামে প্রকাশিত হয়েছে। বাকিগুলো অন্য নামে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এ কাজকে সময়ের সর্বোত্তম জিহাদ বলেছেন। এ কাজ করার জন্য মানুষকে সবধরনের কুরবানী করতে উৎসাহ দিয়েছেন এবং অত্যন্ত দরদ নিয়ে সবাইকে এর গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন। এই প্রচেষ্টার বাইরে গিয়েও যে সব মুসলমান কাদিয়ানীদের শিকারে পরিণত হয়েছিল তাদের অনেকেই তার প্রচেষ্টাতে এই বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করেছিল। ভারত এবং ভারতের বাইরে যেখানেই তার কিতাবাদি অথবা তার মুবাল্লিগ পৌঁছে ছিল সেখানেই কাদিয়ানীদের মারাত্মক পরাজয় ঘটেছিল। মুসলমানদের কাছে এই নতুন মতবাদের স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে উন্মোচিত হয়েছিল। হাজার হাজার নয় লাখ লাখ মুসলমান এই ফেতনা থেকে পরিত্রাণ লাভ করেছিল।

হযরত মাওলানার বেদনা, অস্থিরতা এবং এই বিষয়ে অসাধারণ ধীশক্তিকে অনুধাবন করা এবং তার চেষ্টা প্রচেষ্টা ও কুরবানীর সঠিক মূল্যায়ন এবং তার গুরুত্ব পরিমাপ করার জন্য জরুরি হলো কাদিয়ানীদের ওপর সংক্ষিপ্ত নজর বুলানো। সাথে সাথে এটাও অনুমান করা যে, এটা ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের জন্য কত মারাত্মক বিপদের কারণ ছিল যা মাওলানাকে পেরেশান এবং তারা রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছিল।

কাদিয়ানীদের ব্যাপারে একটি ভুল ধারণা এই যাতে সাধারণ মুসলমান ছাড়াও মেধাবী এবং উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরাও তাদের শিকার হতে বাধ্য হন। তা হলো,

মানুষ কাদিয়ানীদের সাধারণ একটি ভ্রান্ত (গোমরাহ) ফেরকা মনে করে। এটা মনে করে যে তারা সিরাতে মুস্তাকিম হতে দূরে সরে গিয়েছে।

এই ধারণা আমাদেরকে কাদিয়ানীদের সঠিক মূল্যায়ন সহায়ত করে না। এ কারণেই আমরা তাদের ভয়াবহ, ধ্বংসাত্মক মৌলিক বিষয়াবলীকে চিহ্নিত করতে পারি না। যা নবুওয়াতের মুহাম্মাদী এবং পুরা ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে শুধু ক্ষতিই করে না বরং তাকে মাটি চাপা দিয়ে করে তার লাশের ওপর একটি গোমরাহীর প্রাসাদ নির্মাণ করতে চায়।

এক প্রতিদ্বন্দ্বী নবুয়াত ও প্রতিদ্বন্দ্বী উম্মত

নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর সামান্যতম অংশের অস্বীকারই যদি পুরো ইসলাম ধর্মের অস্বীকার হয় এবং এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় তাহলে এর অর্থ হলো, কাদিয়ানী যারা নবুওয়াতে মুহাম্মাদীকে শুধু অস্বীকারই করে না বরং তার মোকাবেলায় নতুন নবুওয়াত দাবি করে, তারা তো মুসলিম ও ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে একেবারে ধুলিসাৎ করে দিতে চায়। এর স্থলে তারা নতুন জীবনব্যবস্থা ও নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করতে চায়। মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. তাঁর কিতাব 'কাদিনিয়্যাত কা মুতালায়া ওয়া জায়েযার' মধ্যে এ বিষয়ে সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন– কাদিয়ানীদের ব্যাপারে মেজাজ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, কাদিয়ানীবাদ একটি স্বতন্ত্র মতবাদ এবং কাদিয়ানীরা একটি পৃথক জাতি। যারা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলে। এটা মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমূদের বক্তব্য দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে (তিনি বলেন)– হযরত মাসীহে মাসউদ আ.-এর মুখের যে কথা আমার কানে ভেসে বেড়ায় তা হলো, তিনি বলেছেন, 'এ ধারণা ভুল যে, সাধারণ মানুষের সাথে আমাদের মতবিরোধ শুধু ঈসা আ.-এর মৃত্যু এবং অন্যান্য কিছু মাসআলার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। বরং আল্লাহ তাআলার যাত, রাসূল সা., কুরআন, নামাজ, রোযা, হজ্ব, যাকাত মোটকথা দীনের প্রতিটি অংশেই আমাদের মতবিরোধ রয়েছে।'

মুসলমানদের আত্মমর্যাদাবোধ এবং আমানতের পরীক্ষা

যেহেতু হযরত মুহাম্মদ সা. ইসলামী জগতের প্রাণ এবং এটাই সন্দেহাতীত বিষয়, সুতরাং তাঁর পরে নতুন কোনো নবীর আগমনের সম্ভাবনা মুসলমানদের জন্য মারাত্মক বিপদ সংকেত। ইসলামী জীবনব্যবস্থা ও মুসলিম বিশ্বের জন্য ধ্বংসাত্মক বিভক্তির কারণ। এসব আন্দোলনের অস্তিত্ব রাসূল সা. ও ইসলামী শরীয়তের ওপর স্থির থাকা ও এর ওপর নির্ভর করার ওপর চ্যালেঞ্জ। আর এর

উত্তরোত্তর উন্নতি আত্ম মর্যাদাবোধের অধিকারী প্রতি মুসলমানদের জন্য মানসিক অশান্তি এবং আন্তরিক বেদনার কারণ।

কাদিয়ানীদের দাওয়াত ও প্রচারণা

এই সময়টা কাদিয়ানীদের উন্নতির যুগ ছিল। ১৯০১ সালে মির্জা সাহেব তার মিশনকে খোলামেলাভাবে প্রকাশ করলেন। তাদের পুস্তিকাগুলোর একটি সমন্বিত সংকলন 'আরবাঈন' নামে নতুন উদ্যমে প্রচারিত হতে লাগল।

১৯০২ সালে তিনি 'তুহফাতুন নাদওয়া' নামক একটি পুস্তিকা রচনা করলেন। যাতে বিশেষভাবে নদওয়ার উলামায়ে কেরাম, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং ওই সকল উলামায়ে কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছিল যারা নদওয়ার অমৃতসর সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

এতে মির্যা সাহেব খোলামেলাভাবে তার চিন্তা-ভাবনা, ভাব ও দর্শনের কথা প্রকাশ করে দিলেন। তখন কিন্তু মাওলানা মুহাম্মদ আলী রহ.–এর প্রতিরোধের বিশেষ কোনো প্রয়োজন অনুভব করেননি এবং এই বিষয়ে খুব একটি মনোযোগ দেননি। দ্বিতীয়ত তিনি বুঝতেই পারেননি যে, এই আন্দোলন দেখতে দেখতে এত বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। আর এটা পাঞ্জাব অতিক্রম করে দেশব্যাপী জড়িয়ে পড়বে। কাদিয়ানীরা অত্যন্ত চতুরতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছিল। সংবাদ মাধ্যম, বইপুস্তক ছাড়াও ওই মুবাল্লিগদের মাধ্যমে তারা কাজ করছিল, যাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি টাকা-পয়সার জালে এমনভাবে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, তারা কোনো অবস্থাতেই কাদিয়ানীদের থেকে মুক্ত হতে পারছিল না।

বিহারে সর্বগ্রাসী থাবা

বিহারের ৪টি জেলায় ব্যাপকভাবে তারা সফল হয়েছিল। বিশেষ করে মুঙ্গের ও ভাগলপুরের ব্যাপারে এই ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, এই জেলা দুটি কাদিয়ানী হয়ে যাবে। তাদের কৌশল এমন ছিল যে, কিছু লোক মুবাল্লিগ হিসেবে কাদিয়ানীয়্যাতের দাওয়াত দিত আর কিছু লোক যারা প্রকৃতপক্ষে কাদিয়ানী ছিল নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে জাহির করে মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করত এবং সাধারণ মানুষকে তাদের বক্তৃতা বিবৃতির প্রতি আকৃষ্ট করত।

সাঈদ মুখতার নামক একজন কাদিয়ানী মুবাল্লিগ, মাওলানা যার কথা একটি চিঠিতে লিখেছেন–

'খুব তৎপরতার সাথে সে এ কাজে মশগুল ছিল এবং বিহার ছাড়া বাংলাপ্রদেশেও সে তার মিশন শুরু করেছিল। তার দাওয়াতে বিহারের হাজারীবাগ অঞ্চলের অনেক লোক কাদিয়ানী হয়ে গিয়েছিল।'

প্রকাশ্যভাবে কাদিয়ানীদের প্রচারপত্র বিলি করা হতো। এতে সাধারণ মুসলমান ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হতো। এ সময় কাদিয়ানীদের পক্ষ থেকে যে পুস্তিকা এবং প্রচারপত্র বিলি করা হতো তার সংখ্যা ছিল ২৬ হাজার। প্রত্যেক কাদিয়ানীর জন্য এটা অত্যাবশ্যক ছিল যে, তার আয়ের কিছু অংশ তাদের ধর্মীয় মতবাদের প্রচার কাজে ব্যয় করবে। এতে এককে জনের বাজেট লাখ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এ জন্য তাদের দাওয়াত ও প্রচার প্রচারণা চালানো খুবই সহজ হয়ে গিয়েছিল। এর মাধ্যমে তারা অনেক মেধাবী মানুষকে অতি সহজেই শিকারে পরিণত করতে সক্ষম হয়।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ. তার এক ঘনিষ্ঠজন হাজী লিয়াকত হুসাইন সাহেবকে এক চিঠিতে অত্যন্ত ব্যথাতুর হৃদয়ে তাদের অবস্থা অবগত করাতে গিয়ে লেখেন-

'(গোলাম আহমদ) চেষ্টা সাধনা ও কর্মকৌশল এতটাই সুবিন্যস্ত যে, তা দেখে প্রতিটি মুসলমান-ই এ কথা বলতে বাধ্য হবে যে, হে আল্লাহ! এটা কুফুরির কত বড় তুফান এবং কত বড় ধর্মহীনতার হিড়িক। আর এর প্রতিরোধের প্রয়োজনও কী পরিমাণ। গোটা ভারতের এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে তাদের লোক তাবলীগ করে না। এছাড়া ইউরোপ, আমেরিকা, ফ্রান্স ও জার্মানিসহ গোটা বিশ্বেই তারা জোরদারভাবে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের কাছে কোনো ব্যাংক, বীমা বা অন্য কোনো প্রশাসন নেই। শুধু একটা বিষয় আছে, 'মির্যা সাহেব বলেছেন যে, এর প্রতিটি সদস্য এই ধর্মমতের প্রচার প্রসারের জন্য মাসিকভাবে কিছু দেবে। যে তিন মাস পর্যন্ত কোনো কিছু দেবে না সে বাইয়াত থেকে বের হয়ে যাবে। এর ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে যে, তাদের কোষাগারে কোটি কোটি টাকা জমা হয়ে গেছে। প্রত্যেক মুরিদ তার আয়ের কমপক্ষে দশভাগের একভাগ দান করে। কেউ কেউ তো তিন ভাগের এক বা চার ভাগের এক ভাগও দান করে তাদের মতবাদের প্রচার-প্রসারের কাজে।

মুঙ্গেরে অবস্থানকালে সেখানকার মুসলমানরা মাওলানাকে এসব অবস্থার বর্ণনা দিলো এবং তাদের হতাশায় কথাও জানাল। তিনি নিজেও এ ব্যাপারে চিন্তাশীল ছিলেন। তবে লোকজনের এই মনোযোগ আকর্ষণ তাকে এ ব্যাপারে আরো কঠোর অবস্থানে নিয়ে গেল। তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে, অতি

দ্রুত এই ফেতনার মোকাবেলা না করলে মুসলিম উম্মাহকে এক ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। এটাই সেই কারণ যা তাকে সর্বশক্তি দিয়ে মাঠে ময়দানে নামতে সহয়তা করেছিল এবং নিজের সবটুকু সময় এবং সবটুকু শক্তি এর পেছনে ব্যয় করতে উৎসাহ যুগিয়েছিল।

নিজের সকল মুরিদ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে এ কাজে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি সবাইকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমার সাথে এ কাজে যে অংশগ্রহণ না করবে তার ওপর আমি ভীষণ অসন্তুষ্ট হবো।

এ সময় মাওলানার সামনে এ ঘটনাও ঘটে গিয়েছিল যে, মুরাকাবার মধ্যে মাওলানাকে জানানো হয়েছিল, 'তোমার সামনে গোমরাহী ছড়িয়ে যাচ্ছে আর তুমি চুপ করে বসে আছ। কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করলে কী জবাব দেবে?'

একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক বিতর্ক

এই চেষ্টা প্রচেষ্টার ফলে একটি ঐতিহাসিক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হলো, তাতে কাদিয়ানীরা এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো যে, তারা পুনরায় ময়দানে ফিরে আসার শক্তি হারিয়ে ফেলল। এটাই কাদিয়ানীদের ওপর প্রথম আঘাত, যা দ্বারা শুধু বিহারের কাদিয়ানীরা-ই নয় বরং গোটা ভারতবর্ষের কাদিয়ানীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ দ্বারা আমাদের সামনে অত্যন্ত ভালো ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে।

এ বিতর্ক ১৯১১ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে প্রায় ৪০ জন আলেম অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের পক্ষে হাকীম নূরুদ্দীন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এসেছিলেন। বিতর্কের গুরুত্ব এভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে যে, বিতর্ক শুরু হলে মাওলানা আল্লাহ তাআলার কুদরতি পায়ে এই যে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন বিজয়ের সংবাদ না আসা পর্যন্ত তিনি আর মাথা উঠাননি।

এই বিতর্কের সংক্ষিপ্ত চিত্র মাওলানার সুযোগ্যপুত্র মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ রাহমানী-এর কলমে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিনি লিখেছেন–

মির্জা সাহেবের প্রতিনিধি নূরুদ্দীন সাহেব, সরওয়ার শাহ সাহেব এবং রওশন আলী সাহেব মির্জা সাহেবের পক্ষ থেকে লিখিত প্রজ্ঞাপন নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাতে মির্জা সাহেব লিখেছেন– 'এদের পরাজয় আমারই পরাজয়। এদের বিজয় আমারই বিজয়।'

এদিকে হযরত মাওলানা মুরতাযা হাসান রহ., আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী, মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী, মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব বিহারী, মাওলানা

ইবরাহীম শিয়ালকুঠিসহ প্রায় ৪০ জন আলেমকে দাওয়াত করা হয়েছিল। লোকেরা মন্তব্য করতে লাগল, এবার একটি বিস্ময়কর বিতর্ক হবে। তাই বিহার জেলাসহ আশপাশের লোকেরাও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আগমন করেছিল। খানকাতে উলামায়ে কেরামের এক বিরাট জামাত অবস্থান করছিল। কিতাবের পাতা উল্টানো হচ্ছিল। বিভিন্ন মাসআলার রেফারেন্স তালাশ করা হয়েছিল।

এবার প্রশ্ন দেখা দিল যে, মাওলানা মুহাম্মাদ আলীর পক্ষ থেকে বিতর্কের প্রতিনিধি কে হবেন? লটারিতে মাওলানা মুরতাযা হাসান সাহেবের নাম উঠল, তিনি মাওলানা মুরতাযা হাসানকে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে লিখে দিলেন। উলামায়ে কেরামের এই জামাত বিতর্কের ময়দানে গেলেন, সময় নির্ধারিত ছিল। হযরত মাওলানা মুরতাযা হাসান সাহেব বয়ান করার জন্য মঞ্চে উঠলেন। আর মাওলানা মুহাম্মাদ আলী সাহেব সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। বিজয়ের খবর না আসা পর্যন্ত মাথা উঠালেন না।

সেদিন উপস্থিত লোকেরা বলতেন, বিতর্কের ময়দানের অবস্থা ছিল চমৎকার। মাওলানা মুরতাযা হাসান সাহেবের একটি বক্তব্যের পরেই যখন তিনি তাদের কাছে জবাব চাইলেন তখন মির্জা সাহেবের প্রতিনিধি জবাব প্রদানের স্থানে চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে চেয়ার মাথায় নিয়ে এই বলতে বলতে পালিয়ে গেল যে, 'আমরা জবাব দিতে পারব না'।

কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী কার্যক্রম

এই বিতর্কের জয়লাভের পরে মাওলানা কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে সুবিন্যস্ত পন্থায় খুব জোরদার কার্যক্রম শুরু করে দিলেন। এ জন্য সফর করলেন। পত্র লিখলেন। বই-পুস্তক রচনা করলেন। দিল্লি অথবা কানপুর থেকে কিতাব ছাপিয়ে মুঙ্গেরে নিয়ে প্রচার করার ক্ষেত্রে বেশ সময় নষ্ট হতো। অপরদিকে অবস্থাও এমন ছিল যে, এতে কোনো ধরনের অলসতা বা উদাসীনতা দেখানোর কোনো ধরনের সুযোগ নেই। এজন্য মাওলানা খানকাতেই একটি প্রেস স্থাপন করলেন। এই প্রেস হতে অন্যান্য কিতাব ছাড়াও মাওলানার লিখিত ১০০ এর বেশি কিতাব ছাপা হয়েছিল। এমন প্রতিকূল মুহূর্তে লাগাতার শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও এত বড় লিখনীর খেদমত আঞ্জাম দেয়াটাও বড় ধরনের কারামতি এবং আল্লাহ তাআলার তাওফীক এবং বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্দেশ ছিল। মোটকথা, প্রতিটি কাজেই তার প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল।

মাওলানা তার একজন বিশিষ্ট খাদেমকে একটি চিঠিতে এ দিকে ইশারা করতে গিয়ে অত্যন্ত সাদাসিধাভাবে নিজের আবেগ প্রকাশ করে লিখেন–

ওহে স্নেহাস্পদ! আমার দুর্বলতা ও অসুস্থতা তোমাদের এবং তোমাদের পুরো সিলসিলার ওপর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমার বাহ্যিক শক্তি সামর্থ দীর্ঘ দিন যাবত অকেজো হয়ে পড়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার ফরমান–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ.

'আমিই এই কুরআন অবতীর্ণ করেছি, আমি নিজেই এর হেফাজত করব।' এই দুর্বল মানুষটির মাঝে বই-পুস্তক রচনার শক্তি তারই দেওয়া বিশেষ অনুগ্রহ।

খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি বিমুখতা

কিন্তু তিনি সর্বদা খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি হতে দূরে থেকে সবসময় নিজেকে আড়াল করে রাখার প্রতি যত্নবান ছিলেন। আঞ্জুমানে তাহযীব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অন্যদের চেয়েও বেশি ছিল; কিন্তু তিনি এর কোনো পদ গ্রহণ করেননি।

নদওয়াতুল উলামার পরিচালক থাকাকালে নিজের শিক্ষা ও দীনী চেষ্টা প্রচেষ্টার প্রতিটি ক্ষেত্রেই মাওলানাকে পর্দার অন্তরালেই দেখা যেত, মঞ্চের ভিড়ের মধ্যে, মাহফিলে বক্তব্য রাখা, অভ্যর্থনার কাজে দর্শনীয় স্থানে এবং নিজের ব্যাপারে কোনো স্তুতিকাব্য শ্রবণ করা থেকে মাওলানা সবসময় নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। তা সত্ত্বেও নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠা, বিশ্বব্যাপী পরিচিত কারণ, উন্নতি সাধনসহ প্রতিটি কাজের অগ্রণী ভূমিকাতেই তিনি ছিলেন।

তিনি সর্বদা অন্যকে সামনে তুলে ধরতেন। নেতৃত্বের মঞ্চে সঠিক ও যোগ্যতম স্থান (যা তাঁরই প্রাপ্য ছিল) অর্জন করার প্রয়োজন মনে করতেন না। আর মুখে বলতেন–

مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں

'ওরে মুসাফির এটা তো তোমার পান্থনিবাস, স্থায়ী আবাস নয়।'

তিনি এই ময়দানে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। বলতে গেলে প্রান্তসীমা হতেও অগ্রগামী ছিলেন। পদমর্যাদা নাম-যশ, খ্যাতি ও পীরের বড়ত্বের চেয়েও তিনি বেশি মর্যাদাবান ছিলেন। মোটকথা, লিখনীর এই শক্তিশালী খেদমতে ৪০টির মতো কিতাব তার নিজের নামে ছাপা হয়েছিল। এর মধ্যেও কিছু তার আসল নামে বাকিগুলো তার উপনাম 'আবু আহমদ' নামে ছাপা হয়। এমনকি, তার সবচেয়ে

প্রসিদ্ধ কিতাব 'ফয়সালায়ে আসমানী'ও 'আবু আহমাদ রাহমানী' নামে ছাপা হয়েছিল।

এই কিতাবের বহুলাংশই মাওলানা ফ্রি বিতরণের ব্যবস্থা করেন এবং বিভিন্ন জায়গাতে কিতাব পৌঁছাতে হাজার হাজার টাকা ব্যয় হওয়ার ব্যাপারেও তার কোনো পরওয়া ছিল না। এ সময় তার সামনে কেবল একটি-ই উদ্দেশ্য ছিল। তা হলো প্রতিটি অঞ্চল থেকেই এই মতবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হোক। এই মতবাদ পৃথিবী থেকে বিদায় নিক। তাঁর হাজার হাজার মুরিদকেও তিনি এ কাজে লাগাতে চাইতেন এবং নতুন কৌশলে তাদের অগ্রসর করারও চেষ্টা করতেন। তিনি এককভাবে নয় সমষ্টিগতভাবে সুবিন্যস্ত কৌশলে কাদিয়ানীদের ওপর আক্রমণ করতে চাইতেন।

হাজী লিয়াকত হুসাইন সাহেবকে (যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে) তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এই বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন-

'আমি ইসলামবিরোধীদের সীমাহীন আন্দোলনের জবাব দিতে চাই। বিশেষভাবে মির্জা সাহেবের ফেতনাকে প্রতিহত করার ব্যাপারে যা-ই হোক না কেন, কোনো অবস্থাতেই আপস করা যাবে না। আমার অবর্তমানেও যেন এর ধারাবাহিকতা বাকি থাকে, এ জন্য আমার অভিমত হলো একটি সংগঠন দাঁড় করানো হোক। যার নেতৃত্ব তোমরা তোমাদের হাতে নাও। আর আমার সাথে যেই ব্যক্তি-ই সম্পর্ক রাখে সে যেন এতে যে কোনো উপায়ে আর্থিক সহযোগিতা করে যায়। আর যে ব্যক্তি আমার এই গুরুত্বপূর্ণ দীনী আহ্বানে সাড়া দেবে না, আমি তার ওপর অসন্তুষ্ট হবো এবং এটাই ধরে নেব যে, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

এতে কোনো-ই সন্দেহ নেই যে, মাওলানার এসব মুরিদ, ঘনিষ্ঠজন এবং খলীফাদের মাধ্যমে বিরাট বড় কাজ হয়েছে। আর তারাও মাওলানার সাহচর্য, আন্তরিকতা ও আনুগত্যের পূর্ণাঙ্গ হক আদায় করেছেন।

তার এক অনুসারী মুরিদ মাওলানা আব্দুর রহীমের মাধ্যমে মুঙ্গের ও ভাগলপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলাহ হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। আঁধারে নিমজ্জিত লোকেরা তার হাতে তওবা করেছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মিলাদের জলসাকে তিনি বিরাট মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগান।

মাওলানা তার এক বিস্তারিত চিঠিতে লিখেছেন-

মিলাদ মাহফিল করাও এবং তাতে মির্জা সাহেব এবং তার ধর্মমতের অসারতা বয়ান কর। যেই এলাকার মানুষ খুব গরিব তাদেরকে বলো, শিরনী ইত্যাদির কোনো প্রয়োজন নেই। আমি আমার সকল আপনজনকে বলে দিচ্ছি যে, তারা তোমার সহযোগিতা করুক। তোমাকে সবখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করুক। এখান থেকে বই-পুস্তক নিয়ে লোকদের দাও এবং এই চিঠি নকল করে আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে প্রেরণ কর।'

এই মহাবিপদের মেঘ যা মুসলমানদের মাথার ওপর দিয়ে চক্কর দিচ্ছিল, তিনি এর ভয়াবহতা অনুধাবন করেছিলেন। তাই তা প্রতিরোধে এমনভাবে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে বলতেন–

বই এই পরিমাণ বিতরণ কর এবং এই পদ্ধতিতে বিতরণ কর যে, প্রতিটি মুসলমান যখন ঘুম থেকে জাগে তখন যেন সে তার শিওরে কাদিয়ানীদের প্রতিরোধমূলক বই পায়।

তিনি এত গুরুত্বারোপ, এমন মনোযোগ এবং এই ব্যাপারে এত অস্থিরতা দ্বারা এই বিষয়টি আন্দাজ করে নেওয়া যায় যে, ওই সময় এই ফেতনা কী মারাত্মক ও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। সাথে সাথে এই বিষয়টিও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বাতিল প্রতিরোধে এমন পাগলপরা এবং জীবন উৎসর্গ করেই কাজ করতে হয়, যেমনটি মাওলানা করেছেন। তিনি তো সমস্ত আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাসকে পেছনে ফেলে সব ধরনের চেষ্টা সাধনা ও কুরবানীর পেছনে ব্যয় করেছেন।

মৌলভী নজীর হুসাইন বিহারী সাহেবের হাতের লেখা অত্যন্ত চমৎকার ছিল। তাকে শুধু পাণ্ডুলিপি তৈরি কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তার ডান পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিল। কখনো পাণ্ডুলিপি তৈরিতে দেরি হয়ে গেলে মাওলানা তাকে বলতেন–

'আরো মেহনত কর, তোমারও জিহাদের সওয়াব মিলবে।'

একবার মৌলভী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, আমার কি তরবারীর জিহাদের সওয়াব মিলবে? জবাবে মাওলানা বলেন, অবশ্যই! এই কাদিয়ানী ফেতনার মূলৎপাটন তরবারির জিহাদের চেয়ে কম নয়।

তাহাজ্জুদের সময় লেখালেখি

তার অভ্যাস ছিল, রাত ৩টার সময় তাহাজ্জুদের জন্য জাগতেন। এই তাহাজ্জুদের সময়টাকেও তিনি কাদিয়ানীবাদের বিরুদ্ধে ওয়াকফ করে

দিয়েছিলেন। বেশির ভাগই তিনি এ সময়টা লেখালেখিতে কাটাতেন। কোনো কোনো প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাহাজ্জুদ ছেড়ে দিয়ে কাদিয়ানীদের প্রতিরোধে বই-পুস্তক লিখতেন।

অধিকাংশ সময় এমনও হয়েছে যে, মাওলানা ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে পেছনে রেখে আগে কিতাব প্রকাশের ব্যবস্থা করতে এবং লিখতে উৎসাহিত করতেন। মোটকথা, এ ব্যাপারে যে পদ্ধতিতেই চেষ্টা করা যায় তিনি তার কোনো পদ্ধতি-ই বাকি রাখেননি। তিনি এ ব্যাপারে তার সমস্ত মেধা, শক্তি সামর্থ, উপায় উপকরণ ও পরিচয় পরিচিতিকে পুরোদমে কাজে লাগিয়েছেন, যা তার সাধ্যের মধ্যে ছিল।

পত্রাবলী

কাদিয়ানীদের ব্যাপারে তিনি তার মুরীদ ও ঘনিষ্ঠজনদের যে পত্রগুলো লিখেছেন, এগুলোই তার চিন্তা-চেতনা ও ভাবাবেগকে উপলব্ধি করার অন্যতম উপায় এবং উৎকৃষ্ট মাধ্যম। এগুলো পাঠ করার দ্বারা অনুমান করা যায় যে, এই মতবাদের প্রতিরোধ এবং মূলোৎপাটনের ক্ষেত্রে মাওলানা কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি এই ব্যাপারে কত সুউচ্চ অনুভূতিসম্পন্ন হয়ে গিয়েছিলেন এবং এজন্য তিনি কতটুকু অস্থির এবং ব্যাকুল থাকতেন। তিনি চাইতেন যে, তার সকল মুরিদ এবং ঘনিষ্ঠজন তাদের সর্বশক্তি নিয়ে এই আন্দোলনে এসে একই কাতারে দাঁড়িয়ে যাক।

তাঁর কাছে এই ফেতনার মোকাবেলা জিহাদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। তিনি অত্যন্ত আবেগ, ব্যক্তিত্ববোধ এবং ঈমানী দরদ নিয়ে এই ফেতনার মোকাবেলা করেছেন। এ দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ আন্দোলন শুধু তার দৃষ্টিভঙ্গি-ই ছিল না, বরং এটা তার জীবনের একটি সুদৃঢ় বাস্তবতা ছিল। যার সরাসরি সম্পর্ক ছিল হৃদয়ের আবেগ এবং অনুভূতির সাথে। রাসূল সা.-এর সাথে তার যেই ইশক ও মহব্বত ছিল এ সবই ছিল তার সৌরভ। আর এটাই তার মধ্যে এমন বিদ্যুতের গতিময় অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

کار زلف تست مشک افشانی ما عاشقاں

مصلحت را تہمتے بر آہوئے چیں بستہ اند

হাজী লিয়াকত হুসাইন ভাগলপুরীকে গুরুত্বপূর্ণ একটি চিঠির শেষে লেখেন–

‘তোমার কাজ হলো, নিজের এলাকার ভাইদের এবং যারা তোমার অধীনে রয়েছে তাদের এই কাজে নিয়মতান্ত্রিকভাবে লাগানো। এটা আমার শুধু লেখাই না।

আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় তিনি তার বান্দাকে দিয়ে এই কাজ করাবেন, তখন দেখার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে যে, কে এই কাজে অংশগ্রহণ করল আর কে এই কাজ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল।

মাওলানা কখনই তার মুরিদদের থেকে চাঁদা নিতেন না এবং এটা পছন্দও করতেন না। তবে সুযোগ হলে নিজেই তাদের দিতেন। এমনকি নিজের বিশেষ খাদেম ও একান্ত আপনজন থেকেও কোনো কিছু চাওয়ার অভ্যাস ছিল না। কিন্তু কাদিয়ানী মতবাদের প্রতিরোধ আন্দোলনে তিনি স্বভাবের বিরোধী কাজ করেছেন। খুব সতর্কতার সাথে মুরিদদের আর্থিক সহযোগিতা করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

হাজী সাহেবকে নিজের অসুস্থতা ও দুর্বলতার কথা জানিয়ে লেখেন-

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আমি তো আখেরাতের সফরের জন্য তৈরি হয়ে গেছি। এখন একটি বিষয় তোমাকে বলে রাখছি যে, আমি তোমাদের কাছে কোনো দিন চাঁদা চাইনি। কোনো কিছুর আবদারও করিনি। কিন্তু এ কাজটি এত জরুরি হয়ে পড়েছে যে, না বলা, না চাওয়া সেই বিষয়টি আজ আর না বলে, না চেয়ে পারছি না।

এই চিঠির পরবর্তী অংশে তিন লেখেন-

মানুষ যখন নিজের জান মাল উৎসর্গ করে কুফর ও ধর্মহীনতাকে ক্রয় করছে তখন বড়ই আশ্চর্যের বিষয় হলো, খাঁটি মুসলমানরা দীনের খেদমতে নিজের হাতের সামান্য ময়লা পর্যন্ত দিতে পারছে না।

একজন দীনদার ভাই যে এ কাজে হাজী লিয়াকত সাহেবকে কিছু অর্থ-সম্পদ দান করেছিলেন, তাকে শুকরিয়া জানিয়ে লেখেন-

ওহে প্রিয়জন! তুমি দীনের এই জরুরি কাজে হাজী লিয়াকত সাহবেকে যা দিয়েছ তা আমার কাছে পৌঁছে গিয়েছে। আল্লাহ তাআলা উভয় জাহানে তোমাদের এর উত্তম বিনিময় দান করুন। তুমি হয় তো জান যে, আমি আমার বিশেষ ব্যক্তিদের থেকেও কোনো কিছু চাই না।

এই প্রয়োজনের মুহূর্তে লিয়াকত সাহেব ৩০০ (তিনশ) রুপিরও কিছু বেশি অর্থ নিয়ে এসেছে। যারা সন্তুষ্টচিত্তে এগুলো দান করেছে, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল তাদের ওপর খুশি হয়েছেন। আর অধমও তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি তোমাকে এই বিষয়ে সতর্ক করছি যে, বর্তমানে মিথ্যা ছেয়ে গেছে এবং দীনের দরদ শেষ হতে চলেছে। এ জন্য অধিকাংশ লোকই দীনী কাজে অর্থ ব্যয়

করতে চায় না। আর দীনী কাজ যারা করে, তাদেরকে অপবাদ দিয়ে কাজের গতি থামিয়ে দেয়।

মাওলানা আবদুর রহীম সাহেবকে এক চিঠিতে লেখেন–

যথাসম্ভব তোমরা তাদের পিছু ধাওয়া কর। তারা যেখানে যায় তোমারও সেখানে যাও। দুটি কাজ বিশেষভাবে কর–

১. যে সব দরিদ্র মানুষ আসতে পারে না তাদেরকে তোমরা আমার পক্ষ থেকে বাইয়াত করিয়ে সিলসিলায়ে রাহমানিয়াতে প্রবেশ করাও এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দাও যে, তারা যেন এই সিলসিলার আশেক (প্রেমিক) হয়ে যায়। কোনো গোমরাহর কথা তাদেরকে যেন প্রভাবিত করতে না পারে।

২. তোমাদেরকে আমি মুখে বলেছি এবং এখন লিখিতভাবেও বলছি, ভালো করে প্রস্তুতি নিয়ে কাজ কর। আর একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই কর। মানুষ যখন আল্লাহ তাআলার জন্য হয়ে যায় তখন আল্লাহ তাআলা তার সব কাজের যিম্মাদার হয়ে যান।

এমন চিঠিপত্র মাওলানা তার মুরিদদের অনবরত লিখতেন। তাদেরকে সর্ব শক্তি নিয়ে এই নতুন গোমরাহী ও দীনবিরোধী কাজের মোকাবেলা করতে উৎসাহ জোগাতেন। সুতরাং মাওলানার সাথে যাদের হৃদ্যতা এবং আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিল তাদেরকে মাওলানার এই পত্রাবলি হাজার ওয়াজের ফায়দা দিত এবং এর অনেক শুভ পরিণাম পরিলক্ষিত হতো।

যেহেতু মাওলানা ইতোপূর্বে কখনও এমন আর্থিক সাহায্য চাননি, এ জন্য এর বিরাট প্রভাব পড়ল প্রতিটি মানুষের ওপর। সবাই যেন আর্থিক সাহায্য নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল এই দীনী কাজে। মাওলানার চেষ্টা প্রচেষ্টায় সাফল্যে তাদের এই আর্থিক সাহায্যের নিকট বিরাট ভূমিকা ছিল। আর হযরতের চিঠিপত্রের ভূমিকাও ছিল সন্দেহাতীত, যা তাদেরকে এ কাজে এগিয়ে আসতে উৎসাহ যুগিয়েছিল।

ফায়সালায়ে আসমানী

মাওলানার সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হলো 'ফায়সালায়ে আসমানী' যা কাদিয়ানীদের ব্যাপারে বাস্তবেই আসমানী ফায়সালা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এই কিতাবটি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। হযরত মাওলানার জীবদ্দশাতেই এই কিতাবের তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কোনো কাদিয়ানীর পক্ষে এর জবাব দেওয়ার মতো সৎসাহস হয়নি। এমনকি মাওলানার মৃত্যুর পরও তারা কোনো জবাব দিতে পারেনি। অদ্যাবধি কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে যে সব লিখনী

প্রকাশ পেয়েছে এটি তার মধ্যে এক অনন্য সাধারণ স্থান দখল করে আছে। তার নীতিমালার পরিচ্ছন্নতা ও স্পষ্টতা, দলীল প্রদানের সুন্দর পদ্ধতি ও বিশুদ্ধতা ও সুদৃঢ়তার বিবেচনায় খুব কম কিতাব-ই তার সমপর্যায়ের হতে পেরেছে।

এই কিতাবের আদ্যপান্ত দেখে হযরত মাওলানা আব্দুল কাদির রায়পুরী রহ. মন্তব্য করেন– কাদিয়ানীদের প্রতিরোধে লিখিত অধিকাংশ কিতাবের কোনো কোনো জায়গায় সম্ভাবনার সুযোগ বের হয়ে আসে। কিন্তু এই কিতাবের কোথায়ও কোনো ফাঁক ফোকড় নেই এবং দলীলের ক্ষেত্রে কোনো দুর্বলতা বা অস্পষ্টতা দেখা যায় না। বাস্তবতা হলো, কিতাবটি অনর্থক কথন, এমনকি অপ্রয়োজনীয় দলীল থেকেও মুক্ত। এতে নিজের আবেগকে জাহের করার স্থানে পাঠককে সুস্থির চিন্তাভাবনায় উপনীত হওয়ার বিষয়ে আন্তরিক চেষ্টা করা হয়েছে। অপরদিকে লেখকের দরদ, ইখলাস ও নিয়তের বিশুদ্ধতা এর মর্যাদা, উপকারিতা ও প্রভাব সৃষ্টিকারী শক্তিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

মাওলানা তার এই কিতাবে কাদিয়ানীদের প্রতি সাধারণ মুসলমানদের ঝুঁকে পড়ার কারণ সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। এতে এই প্রশ্নের জবাব খুব সুন্দরভাবেই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কাদিয়ানীরা নবুওয়াতে মুহাম্মাদী সা.-এর বিরোধী ও বিদ্রোহী হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ কেন তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এতে তাদের কী ফায়দা হয় এবং তাদের আবেগের কী প্রশান্তি লাভ হয়। মাওলানা ফায়সালায়ে আসমানীতে বলেন, 'হযরত মসীহ আ. ও হযরত মাহদীর আগমনের খবর হাদীস শরীফে এই পরিমাণ এসেছে এবং বিষয়টি এতই প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, আম-খাস সবাই এ ব্যাপারে অবগত। কিন্তু খুব কমসংখ্যক মুসলমান তাদের আগমনের অপেক্ষা করে। বিশেষ করে এই নাজুক মুহূর্ত যখন চতুর্দিক থেকে মুসলমানদের অধঃপতন লক্ষ্য করা যাচ্ছে তখন তাদের আগমন খুবই খুশির খবর বলে বিবেচিত হবে।'

এই কিতাবে মাওলানা কাদিয়ানীদের চেনা এবং তাদের যাচাই করার জন্য দু তিনটি নীতিমালাকে সামনে রেখেছেন। তার কাছে কাদিয়ানীদের ব্যাপারে চিন্তা গবেষণা করার পদ্ধতি ছিল,

এক. মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর আগমন এবং নবুওয়াত দাবি করার মধ্যে দুনিয়ার মুসলমানদের কী ফায়দা? দুই. হাদীসে হযরত মাসীহ আ. ও হযরত মাহদীর যেই আলামত বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো মির্যা সাহেবের মধ্যে কতটুকু পাওয়া যায়?

তিন. যে ব্যক্তি এত বড় দাবি করল, তার ব্যক্তি জীবন ও বাহ্যিক অবস্থা কী? সুতরাং সে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী? নবুওয়াতের শান তো খুবই উন্নত। দেখতে হবে যে, দাবিদার ব্যক্তি মানবিক গুণাবলীতে এবং ব্যক্তিত্বের আভিজাত্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পেরেছে কি না।

কিতাবের ভূমিকায় মাওলানা লিখেছেন–

একটি সংক্ষিপ্ত কথা যা সাধারণভাবেই বলব, আর তাতে চিন্তাভাবনা করা দরকার যে, রাসূল সা. হযরত মাসীহ আ.-এর আগমনের সংবাদ দিয়েছেন। হযরত সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং সকল উলামায়ে কেরাম এই বিষয়টিকে ইয়াকীন করেছেন। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এটা স্পষ্ট যে, এই পবিত্র সত্তার দ্বারা মুসলমানদের বিরাট বড় দীনী ফায়দা হবে এবং মুসলমানদের দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ তার মাধ্যমেই সাধিত হবে। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তার যুগে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ থাকবে না। অর্থ সম্পদ এত বেশি হবে যে, মুসলমানরা হাদিয়া তোহফা নেওয়ার প্রতি মনোযোগী হবে না। সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা বিজয়ী হবে। কিন্তু মির্জা সাহেবের দ্বারা তো এর কোনো কিছুর লেশ পরিমাণও পাওয়া যায়নি। বরং সবকিছু এর বিপরীত। চিন্তা করে দেখার বিষয় হলো, তার কারণে মুসলমানদের মধ্যে কী পরিমাণ হিংসা, বিদ্বেষ ও হানাহানির সৃষ্টি হয়েছে। আর বর্তমানে মুসলমানরা কী পরিমাণ অভাবগ্রস্ত এবং ইসলামের বর্তমান সময়ে কী দুর্দিন যাচ্ছে। অপর এক জায়গায় লিখেছেন–

'যদি মির্জা সাহেব তার দাবিতে সত্যবাদী হতেন, তাহলে তার সাহচর্য ধন্য ব্যক্তিরা অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতেন এবং সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্যতার দৃষ্টি তাদের ওপর পড়ত। কিন্তু বিষয়টা তো সম্পূর্ণ উল্টো।

মাওলানা লিখেছেন, অপর একটি পদ্ধতি যা উলামায়ে কেরামের জন্য অবশ্যই উপকারী, তবে সাধারণের সংশোধনের জন্য তেমন উপকারী নাও হতে পারে। কিন্তু মাওলানা তার কিতাবের প্রথম খণ্ডে এটাকেই সর্বশেষ তরীকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এটাকেই তাদের সার্বিক বিষয়ে সত্যবাদী হওয়া বা মিথ্যাবাদী হওয়ার মূলনীতি স্বীকার করেছেন এর আলোচনায় তিনি লিখেছেন–

প্রথমে এটা দেখতে হবে যে, তিনি সত্যবাদিতায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে কি না? যদি তাকে সামান্য একটু সত্য বিচ্যুত পাওয়া যায় তাহলে তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। আমি এই কিতাবে এই পন্থা-ই অবলম্বন করেছি, যা দ্বারা আম-খাছ সবাই উপকৃত হতে পারবে এবং নিজেরাই যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে।

মির্জা সাহেব বলেছেন, আমাদের সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী যাচাই করার জন্য আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী পরীক্ষা করার চেয়ে বড় আর কিছু নেই। [আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃষ্ঠা- ২৮৮]

এ জন্য আমি তাদের ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর দৃষ্টিপাত করাকে উপযুক্ত মনে করেছি। তার ভবিষ্যদ্বাণী হতে সেগুলোকেই নিয়েছি যেগুলো তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যার ব্যাখ্যা দ্বারা সত্য সন্ধানী ব্যক্তি দলীল প্রমাণের মাধ্যমে তাদের সত্তাগত পবিত্রতা জেনে নিতে পারবে।

কিতাবের প্রথম অংশে মির্যা সাহেবের 'মানকূহায়ে আসমানী' (আসমানী বিবাহ) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে তাদের সমস্ত ইলহাম ও ভবিষ্যদ্বাণীর হাকীকতকে বাস্তবতার আলোকে এমন মিথ্যা প্রমাণ করা হয়েছে যে, ন্যায়-ইনসাফ পছন্দকারী ব্যক্তি যদি জীবিত থাকেন তাহলে প্রশান্তি লাভ না করে থাকতে পারবেন না।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডে তিনি তাদের মিথ্যা বয়ান এবং মিথ্যা দাবির রহস্য ফাঁস করে দিয়েছেন। আয়াতে কুরআনী, হাদীসে নববী, যৌক্তিক প্রমাণাদি বর্তমান পরিস্থিতি এবং পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর আলোকে তাদের মিথ্যা, প্রতারণা, ভুল বর্ণনা, ধোঁকা দেওয়ার একেকটি অংশের ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাদের সমস্ত দলীলাদিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছেন।

মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী যা তার নিজেরই বিরুদ্ধে যেত এবং তার মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হতো– দ্বিতীয় অংশে তারই আলোচনা করেছেন। সাথে সাথে ওই সব বক্তব্যেরও জবাব দিয়েছেন যা মির্যা সাহেব কুরআন হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। অথচ কুরআন হাদীসের সাথে তার বিন্দু পরিমাণ সম্পৃক্ততা নেই। এই কিতাব পড়ার দ্বারা মাওলানার জ্ঞানের গভীরতা, অধ্যয়নের প্রশস্থতা, নানা বিষয়াশয় সম্পর্কে অবগতি, সূক্ষ্ম বিষয়ের দখল, বাস্তবতার সাথে সম্পৃক্ততা ও সহজ সরলভাবে উপস্থাপনার কৌশল সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়। যা কিতাবের প্রতিটি লাইন থেকেই বুঝে আসে। কোনো জটিল ও কঠিন উপস্থাপনা, দুর্বল দলীল ও বিরক্তিকর মাসাআলা হতে কিতাবটি মোটামুটি মুক্ত। আর এটাই কিতাবের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবান হওয়ার কারণ।

মির্জা সাহেব নিজের পূর্ণতা ও অলৌকিকতা প্রমাণের জন্য 'ইজাযে আহমদী' নিজে লিখেছেন বা অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়েছেন। এগুলোকে জাল প্রমাণ করায় তার দাবি বিগড়ে দিয়েছিল। সাধারণ মুসলমান ও আলেম উলামায়ে

কেরামকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য তিনি ফাঁদ পেতেছিলেন তা শেষ করে দিয়েছিল। বরং এটা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, সে নিজেই নিজের পাতা ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছিল।

মির্জা সাহেব ১৮৯৯ সালে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, 'হে আমার মাওলা! আমি যদি তোমার দরবারে সত্যবাদী হই তাহলে এই তিন বছরের মধ্যে (যা জানুয়ারি ১৯০০ থেকে ডিসেম্বর ১৯০২ সাল পর্যন্ত ছিল) এমন আলামত দেখাও যা মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। যদি তিন বছরের মধ্যে আমার দৃঢ়তা ও সত্যবাদিতার কোনো আলামত না দেখাও তবে আমি এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি যে, আমার এই দুআ যদি কবুল না-ই হয় তাহলে আমি এমনই অভিশপ্ত এবং বিতাড়িত কাফের হয়ে যাবো, যেমনটি লোকেরা আমাকে ধারণা করে।'

এই দুআর পরে মির্জা সাহেব তিন বছর পর্যন্ত এই ফিকির এবং ধ্যান-ধারণা নিয়ে কাটিয়ে দিল যে, এই বুঝি কোনো আলামত বের হলো। ভারতে আরব সাহিত্যের তেমন জৌলুস ছিল না। এ জন্য কিছু আরবি কবিতা রচনা করে উর্দুতে তার ভূমিকা লিখে পুস্তিকাকারে ছেড়ে দিয়ে এ কথা বলে দেওয়া যাবে যে, এটা একটা অলৌকিক কিতাব।

ওই সময় ত্রিপোলীর এক আরবি সাহিত্যিক ভারতে এসেছিলেন। তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে হায়দারাবাদে এসে অবস্থান করেন। তিনি একজন উদার মানসিকতার কবি ছিলেন। এই শহরের কাদিয়ানী ধর্মাবলম্বীরা মির্জা সাহেবের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়। উভয়ের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান প্রদান চলতে থাকে। মির্জা সাহেব তার কাছে কবিতার ফরমায়েশ করে বসলে তিনি টাকার বিনিময়ে কবিতা লিখে দেন।

মাওলানা সাহুল সাহেব পুরনবী ভাগলপুরী বলেন, হায়দারাবাদে আমি তার কাছে আরবি সাহিত্যের কয়েকটি কিতাব পড়েছি। তিনি উঁচুমাপের সাহিত্যিক ছিলেন। লোকটি স্বীকার করে যে, 'আমার টাকার প্রয়োজন ছিল, আমি সেটা মির্জা সাহবকে জানালাম। তিনি আমাকে কবিতা লিখে দিতে বললেন, আমি টাকা পেয়ে কবিতা লিখে দিলাম। লোকটি জেনে বুঝে এমন কিছু ভুল ওই কবিতায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে, সে ভুল সাধারণত করা হয়ে থাকে। সাঈদ সাহেব (কবির নাম), মির্জা সাহেবকে মিথ্যাবাদী হিসেবে জানতেন, এটাও জানতেন যে, আরবি ভাষা সম্পর্কে মির্জা সাহেবের প্রাথমিক ধারণাটুকুও নেই। এজন্য তিনি জেনে বুঝে এ ভুলগুলো করেছেন। আহলে ইলম যাতে এগুলো ধরে ফেলে তাকে (মির্জা) মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে পারে। কারণ, তিনি একটা উল্লেখযোগ্য সময়

ভারতে ছিলেন। তিনি এখানে যুক্তিবিদ্যার ওপর পড়াশোনা করার সুবাদে হিন্দির পরিভাষা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতেন। এ জন্য মির্জা সাহেবকে ধোঁকা দিতে পেরেছেন। তিনি কবিতায় কিছু হিন্দি শব্দও ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। মোটকথা, এটা তো মির্জা সাহেবের অলৌকিকতা না। অলৌকিকতা যদি বলতেই হয় তাহলে বলতে হবে সাঈদ সাহেবের অলৌকিকতা। এক কথায় বলতে গেলে, কিতাবের তিন খণ্ডেই তিনি মির্জা সাহেবের একেকটি দলীল, অলৌকিক দাবি এবং ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আকলী-নকলী সব ধরনের ব্যাখ্যা করেছেন। কোনো বাড়াবাড়ি বা আবেগাশ্রিত না হয়ে এগুলোর ওপর ইলমী সমালোচনা করেছেন। যা সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী প্রতিটি মানুষই গ্রহণ করতে বাধ্য। আর যে সকল লোক জিদ বা মন্দ নিয়ত ছাড়াই শুধু নির্বুদ্ধিতা বা কোন ধরনের আত্মিক বা মানসিক চাপের কারণে তাদের শিকারে পরিণত হয়েছে তার কাছে এর আসল হাকীকত স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর এদের তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণ হলো, মতবিরোধপূর্ণ মাসায়েল এসব মুসলমানের দৃষ্টিতে একটু ভিন্ন রকম মনে হয়, যার ফলে মির্জা সাহেবের কথাবার্তা এ কাজকর্ম হতে এতটুকু বিরক্তি সৃষ্টি হয় না। যা তার কাঙ্ক্ষিত এবং ঈমানের পূর্ণতার আলামত।

হযরত মাওলানা দলিল প্রদানের যে পন্থা অলম্বন করেছেন, সাধারণ মানুষের ইসলাহ ও হেদায়েতের জন্য এর চেয়ে সুন্দর পন্থা আর হতে পারে না এবং এর মতো উপকারীও নয়। কারণ, এতে মস্তিষ্কের জন্য ইলমী ও বাস্তব প্রশান্তি রয়েছে। আর অন্তরে এই নতুন মতবাদ সম্পর্কে বিরক্তি সৃষ্টিকারী চমৎকার প্রভাব রয়েছে। ফায়সালায়ে আসমানীর তৃতীয় খণ্ড প্রথমে ১৩৩৭ হিজরী সনে ছাপা হয়েছিল এবং তাতে মির্জাবাদীদের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল যে, তারা এর জবাব দিক। ১৩৩৮ হিজরীতে এর দ্বিতীয় সংস্কারণ ছাপা হয় এবং তাতে ঘোষণা করা হয়, যে ব্যক্তি এর জবাব দিতে পারবে তাকে (তৎকালীন) তিন হাজার রূপি পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু কোনো কাদিয়ানীই এর জবাব দিতে পারেনি। ইংরেজিতেও ফায়সালায়ে আসমানীর তরজমা করা হয়। সম্ভবত সেটা ছাপা হয়নি।

শাহাদাতে আসমানী

মাওলানার অপর গুরুত্বপূর্ণ রচনা হলো 'শাহাদাতে আসমানী'। এটা দুই খণ্ডে প্রথম শাহাদতে আসমানী এবং দ্বিতীয় শাহাদতে আসমানী নামে সমাপ্ত হয়েছে।

১৩১৩ হিজরী রমযান মাসে একই সাথে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ লাগে। মির্জা সাহেব এই ঘটনাটিকে নিজের ব্যাপারে এক আসমানী সাক্ষ্য হিসেবে নিজের মাহদী

হওয়ার প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। আর এই ঘোষণা করে দেন যে, হাদীস শরীফে এসেছে, চন্দ্র ও সূর্যের একত্রে গ্রহণ লাগা হযরত মাহদীর আলামাত। এ জন্য মির্যা সাহেবের মাহদী হওয়া প্রমাণিত হলো।

রমযান মাসে এ দুটোর একত্রে গ্রহণ লাগা অন্য কোনো মাহদী দাবিদার ও মসীহ দাবিদারের সময়ে ঘটেনি। শুধু তার যুগেই এটা ঘটল। কাদিয়ানীরা বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করতে লাগল। তারা এটিকে সবখানে মির্জা সাহেবের সত্যবাদী হওয়ার প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে লাগল।

হযরত মাওলানা মূলত এই ভ্রান্ত ধারণাকে প্রত্যাখান করাতে গিয়ে এই কিতাব রচনা করেন। এটা কখনই জরুরি মনে করা হয় না যে, হযরত মাহদীর যুগে এভাবে একত্রে গ্রহণ লাগত দ্বিতীয়ত তিনি একথাও প্রমাণ করেছেন যে, ১৩১৩ হিজরীর গ্রহণ হলো অতি সাধারণ একটি গ্রহণ। এমন গ্রহণতো ইতোপূর্বে আরো অনেক বারই হয়েছে।

এ কারণে তিনি প্রথমে একজন অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী মাসারখীট বই (USE 0F GLOBE) যা লন্ডন হতে ১৮৬৯ সালে ছাপা হয়েছিল তাদ্বারা নিজের বক্তব্যকে সুদৃঢ় করেছেন। তিনি এর পক্ষে বিশাল এক ফার্সী কিতাব 'হাদা ইকুন নুজূম' যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৫৮, দ্বারা দলীল পেশ করেছেন।

মাসারখীট বলেছেন, ১৮০১ সাল হতে ১৯০০ সাল পর্যন্ত পাঁচ বার রমযান মাসে একই সাথে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে। আর হাদাইকুন নুজূমের ভাষ্য মতে ৬৩ বছরে তিন বার রমযান মাসে একইসাথে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে। এরপর তিনি ৫৪ বছরের তালিকা উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন, এই কিতাবগুলো দীর্ঘদিন যাবত বলে আসছে। কিন্তু কেউ এরপর ভুল লেখার কোনো অপবাদ আরোপ করেননি।

অতঃপর তিনি দেখিয়েছেন যে, ১২৬৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম একত্রে গ্রহণ লেগেছে। তার তারিখ হলো ১৩ ও ২৮ রমযান। আর যেই একত্রে গ্রহণকে মির্যা সাহেব মাহদীর আলামত বলছেন, এমন একত্রে গ্রহণ তো ১৩১১ হিজরীতে লেগেছিল। তখন মির্যা সাহেবের বয়স ছিল ১১ বছর। তখন তো মাসারডুবী নামক ব্যক্তি আমেরিকাতে হযরত মসীহ হওয়ার দাবি করেছিল।

হযরত মাওলানা লিখেছেন যে- মির্যা সাহেব ওই গ্রহণকেও নিজের আলামত বলেছেন। আরো বলেছেন যে, 'এক হাদীসে এসেছে মাহদীর সময় দুটি গ্রহণ লাগবে।' অথচ কোনো হাদীসেই এমন বিষয় খুঁজে পাওয়া যায় না। এই স্পষ্ট

মিথ্যা ব্যতীত এ ধরনের গ্রহণ ভারতে আর হয়নি যখন মির্যা সাহেব আছে। বরং অন্যান্য স্থানে হয়েছে যেখানে অন্যান্য মিথ্যা নবীর দাবিদাররা রয়েছে।

১৩১২ হিজরীতে ৩য় গ্রহণ লেগেছিল। আর এই গ্রহণকেই মির্যা সাহেব নিজের মসীহ হওয়ার প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। পরবর্তী সময়ে মাওলানা লিখেছেন- এই গ্রহণ ওই হাদীসের মর্মার্থ কীভাবে হতে পারে? যে ব্যাপারে দারাকুতনীতে সুস্পভাবে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে-

لَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلَقَ اللهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ.

অর্থাৎ যখন থেকে আল্লাহ্ তাআলা আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন, সে সময় থেকে নিয়ে, হযরত মাহদীর সময় পর্যন্ত এমন চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ কখনই হয়নি। অর্থাৎ এই দুই গুণ এমন বিরল যে, এর পূর্বে এর কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। এরপরে তিনি খুবই স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন যে, হাদীস শরীফে হযরত মাহদীর যে সব গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে তার কোনোটাই মির্যা সাহেবের মধ্যে পাওয়া যায়নি।

মাওলানার এই কিতাব শাহাদাতে আসমানী তার অপর কিতাব ফায়সালায়ে আসমানীর সাথে দলীল প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে অনেকাংশেই মিলে যায়। দলীলের দৃঢ়তা প্রতিটি বিষয়ের রেফারেন্স প্রদান, ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণ পেশ করা এবং কুরআন-হাদীস থেকে মাসআলা এমনভাবে বের করে আনা হয়েছে যে, এতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের সম্ভাবনা বা অনিশ্চয়তার সুযোগ নেই। এমনকি কোনো কিছু দ্বিতীয় বার প্রশ্নে করারও প্রয়োজন পড়ে না। বিরোধীরা এ দ্বারা কোনো কিছুকে ভুল বুঝানোরও সুযোগ পায় না। মাওলানার রচনার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যই এটা। তবে কাদিয়ানীদের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এটা আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এক নজরে মাওলানার অন্যান্য রচনা

এ ছাড়াও কাদিয়ানীদের প্রতিরোধে মাওলানার যেসব রচনাবলী আছে তন্মধ্যে চশমায়ে হিদায়াত, চ্যালেঞ্জে মুহাম্মাদিয়া, মিয়ারে সাদাকাত, মিয়ারুল মসীহ, হাকীকাতুল মসীহ, তানযীহিয়ে রব্বানী, আয়নায়ে কামালাতে মির্জা, নামাযে হাক্কানী প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য। সব কিতাবের সংখ্যা প্রায় ৫০ এর কাছাকাছি। এছাড়াও এমন অনেক কিতাব আছে, যা প্রথমে ছাপা হয়েছিল, এরপরে আর ছাপা হয়নি। এভাবেই তা শেষ হয়ে গেছে। এখন তা খুঁজে বের করাও মুশকিল।

মূলত মাওলানা একাই এমন কাজ করেছেন যা একটা প্রতিষ্ঠান এত সুন্দর ও সফলভাবে করতে পারে না। কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে এত প্রচারপত্র হযরত মাওলানার কলমের শক্তিমত্তার সুফল। তিনি তাদের বিরুদ্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ লিখনী আন্দোলন দাঁড় করিয়েছেন এবং এর প্রতিটি শাখার পুরোপুরি পরিচর্যা করেছেন।

চ্যালেঞ্জে মুহাম্মাদিয়া কিতাবটি আরবি, ফার্সী ও উর্দু তিন ভাষায় ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটা খুবই প্রচার হয়েছিল। কাদিয়ানীদের বিশেষ শ্রেণী এবং খুলাফাদের কয়েকবার এগুলো হাদিয়া প্রেরণ করা হয়েছিল। তারা চুপ করে থাকা ছাড়া অন্য কিছু করতে সক্ষম হয়নি। এতে মির্যা সাহেবের নিজের যবানেই নিজেকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করা হয়েছে।

চশমায়ে হেদায়াতের শেষে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, যদি কেউ এর জবাব দিতে পারে তাহলে তাকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) রুপি পুরস্কার দেওয়া হবে। এতে মির্যা সাহেবের ১৮টি বাণী উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং এগুলোর আলোকেই তাকে প্রতারক, মিথ্যাবাদী প্রমাণ করা হয়েছে। বার বার চ্যালেঞ্জ করার পরও কেউ-ই এর জবাব দিতে সক্ষম হয়নি।

একটি অতি সাধারণ বুঝের কথা এবং সুস্পষ্ট দলীল যা মাওলানার প্রায় প্রতিটি কিতাবেই নিয়ে আসা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে কাদিয়ানীদের নিয়ে চিন্তা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। তা হলো, মির্যা সাহেব বলেন যে, হযরত মাহদীর আগমনের আলামত হলো সকল কাফের মুসলমান হয়ে যাবে এবং দুনিয়া থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী উঠে যাবে। হযরত মাওলানা ন্যায় নিষ্ঠাবান এবং সুস্থ মস্তিষ্কের প্রতিটি মানুষের সমীপে বার বার এই নিবেদন করেছেন যে, আপনারা একটু চিন্তা-ভাবনা করে বলুন, মির্যা সাহেবের আগমনে এর কোনো বিষয়টি বাস্তবায়ন হয়েছে যা তিনি বড় গলায় বয়ান করেছেন।

মিয়ারে সাদাকায়ে তিনি লিখেছেন–

মির্যা সাহেব এবং তার পুত্রের একটি ফাতাওয়া হলো, যারা মির্যা সাহেবের ওপর ঈমান আনবে না তারা কাফের হয়ে যাবে। তাদের পেছনে কখনই নামাজ পড়া যাবে না। এর সারকথা হলো, দুনিয়াতে যে শত শত কোটি মুসলমান আছে তারা সবাই মির্যা সাহেবের ভাষ্যমতে কাফের হয়ে গেছে। শুধু এই ছোট্ট জামাতটি ছাড়া। অথচ কোনো কাফের মুসলমান হয়নি।

কোন কোন ক্ষেত্রে কাদিয়ানীর কুরআনুল কারীমের আয়াত দ্বারা দলীল দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছেন এবং খুব ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নিজেদের উদ্দিষ্ট অর্থ প্রমাণের ব্যর্থ

চেষ্টা করেছেন। হযরত মাওলানা এর প্রতিরোধে 'মি'য়ারুল মাসীহ' নামে একটি পুস্তিকা লিখেন এবং তাতে প্রতিটি দলীলের মিথ্যা হওয়াকে প্রমাণ করেন।

সব কাদিয়ানী মিলিত হয়ে মাওলানার সকল বই-পুস্তকের বিরুদ্ধে

اسرار نہانی

নামক একটি পুস্তিকা লেখে। তবে নিজেদের ব্যর্থতা ও গোমরাহী ঢাকার জন্য হযরত মাওলানাকে তাদের বিশেষ টার্গেটে পরিণত করে। মাওলানার ব্যাপারে সাধারণত মানুষের ধারণা খারাপ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। মাওলানার ওপর খারাপ ধারণা হয়ে গেলে সাধারণত মানুষকে মির্যা সাহেবের প্রতি আকৃষ্ট করা সহজ হবে এ জন্য তারা সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে থাকে।

এ কাজের জন্য তারা দু ধরনের বেতনভোগী মুবাল্লিগ নিয়োগ দেয়, তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে সহজ-সরল মানুষগুলোকে হযরত মাওলানার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে। তারা মাওলানার নামে মিথ্যা কুৎসা রটাতে থাকে। তারা মাওলানার চরিত্র, ব্যক্তিজীবনসহ তার ব্যাপারে এমন সব মিথ্যা সাধারণ মানুষকে বলে বেড়াতে থাকে, যাতে মাওলানার প্রতি সাধারণ মানুষের মহব্বত নষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষকে কাদিয়ানী বানানোর পথ তাদের জন্য সহজ হয়ে যায়।

মাওলানা আব্দুর রহীম মুঙ্গেরীর নামে লিখিত একটি দীর্ঘ চিঠিতে তিনি এর বিস্ত ারিত আলোচনা করেছেন। তাছাড়া সহীফায়ে রহমানিয়াতে এর আলোচনা এই শব্দে করা হয়েছে যে- যেহেতু এই দলের আল্লাহ তাআলার সাথে কোনোই সম্পর্ক নেই সেহেতু তারা জবাব দিতে অক্ষম হয়ে অসার এবং অশ্লীল কথা দ্বারা হরযত মাখদূম বিহারী ও হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহ.–এর মত প্রমুখ বুযুর্গানে দীনের নামে অপবাদ দিচ্ছে। আর ফায়সালায়ে আসমানীর লেখকের নামে প্রকাশ্যে গালিগালাজ করা তাদের স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে।

'মির্যারী নবুওয়াত কা খাতেমাহ' নামক আরো একটি পুস্তিকায় মাওলানা লিখেছেন এবং তাতে খতমে নবুওয়াত প্রমাণ করেছেন। এই পুস্তিকাটি ১৯১৪ সালে দিল্লিতে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯২৫ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু কোন কাদিয়ানী-ই এর জবাব দিতে সক্ষম হয়নি।

কাদিয়ানীদের পক্ষ থেকে একটি দলীল এই দেওয়া হচ্ছিল যে, কোনো মিথ্যা দাবিদার ও প্রতারক স্থায়ী হয় না এবং তার কোনো উন্নতিও হয় না। অথচ মির্যা সাহেবের তো দিন দিন উন্নতি-ই হচ্ছে। তার দল তো দিন দিন ভারী হচ্ছে। আর এটা মির্যা সাহেবের সত্যবাদী হওয়ারই প্রমাণ বহন করে। এর প্রতিরোধে

মাওলানা عبرت خیز নামক একটি পুস্তিকা লিখেন এবং এই ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটান। কুরআন, হাদীস, ইতিহাস এবং অন্যান্য ঘটনাবলী দ্বারা এ দাবির দুর্বলতা সবার সামনে পেশ করেন।

নিযামে হায়দারাবাদে শিক্ষা কর্মকর্তার নামে পত্র

খাজা কামালুদ্দীন হায়দারাবাদে খুব জোরে শোরে কাদিয়ানীদের দাওয়াত শুরু করে দিয়েছিলেন। এর জন্য তিনি এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন যে, এতে মানুষের আবেগ খুব একটা বেশি প্রবল হত না তবে মানুষ নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাদিয়ানীবাদকে কবুল করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত।

তিনি 'সহিফায়ে আসিফিয়া' নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। দুর্ভাগ্যবশত রাজ দরবারের সাথে তার সম্পর্কও ভালো ছিল। তাছাড়া তিনি এ কথা ঘোষণা করে বেড়াতেন যে, আমাদের উদ্দেশ্য ইসলাম প্রচার ছাড়া অন্য কিছু নয়। সাধারণ মুসলমানদের ওপর এর মারাত্মক প্রভাব দেখা দিল। বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষিত যুবকরা এতে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হতে লাগল। এই অবস্থা দেখে হযরত মাওলানা খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। এজন্য তিনি নিজামে হায়দারাবাদের উস্তাদ ফযীলতে জঙ্গ মাওলানা আনওয়ারুল্লাহ খান সাহেবকে একটি বিস্তারিত চিঠির মাধ্যমে এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং নিজের অন্তরের ব্যথা প্রকাশ করেন।

এই কবিতা দ্বারা চিঠি শুরু করেন– দৃষ্টিসম্পন্ন যদি না দেখার ভান করে তাহলে সেটা দূষণীয়। আর চুপ করে বসে থাকা তো মারাত্মক গোনাহের কাজ। চিঠিতে মাওলানা লিখেন– কিছুদিন যাবৎ শুনতে পাচ্ছি যে, মির্যা সাহেবের খাস মুরিদ লাহোরে কোর্টের উকিল খাজা কামালুদ্দীন, এখানে এসে মুসলমানদের মধ্যে খুব হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন। তিনি আমাদের শাসক মহোদয়েরও খুব আস্থা অর্জন করে ফেলেছেন। এমনকি, সবাই তার সাথে কথা বলারও সাহস পাচ্ছে না। আমি তো খুবই পেরেশান। অথচ সেখানকার কর্তা ব্যক্তিরা তো আপনাকে খুবই মানে। আর এটাও জানি যে, 'ইফাদাতুল ইসহাম' নামক কিতাবটি আপনি-ই লিখেছেন। এটা তো খুবই উঁচু মাপের কিতাব। দুঃখের বিষয় এর বিরুদ্ধে খাজা সাহেবের সহিফায়ে আসিফিয়া বিতরণ করা হচ্ছে। অর্থাৎ প্রতিষেধকের পরে আবারও বিষ প্রয়োগ করা হচ্ছে। এদিকে আপনিও চুপ!

অন্য এক জায়গায় লিখেছেন– খাজা সাহেব একটি গ্রুপের লিডার এবং ভালো একজন বক্তা। কুদরতীভাবেই যেহেতু বর্তমানে ইংরেজি শিক্ষিত লোকের মধ্যে ধর্মের প্রতি অনুরাগ পরিলক্ষিত হচ্ছে (যদিও দীনী হুকুম আহকামের ব্যাপারে

তাদের কোনোই মাথা ব্যথা নেই) কাজেই খাজা সাহেব ইসলাম প্রচার নামক চটকদার আওয়াজ দ্বারা তাদের প্রভাবিত করছে। আর তারা কোনো কিছু না বুঝেই তার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। যদিও তাদের নিয়ত ভালো কিন্তু বাস্তব অবস্থা তাদের জানা নেই। তারা এখন পর্যন্তও জানে না যে, এই পর্দার আড়ালে কী রহস্য লুকিয়ে আছে!

মাওলানা! আপনার উদাসীনতা এতটুকু যে, আপনি প্রথম থেকেই ওখানকার কর্তা ব্যক্তিবর্গকে খাজা সাহেবের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করেননি। ওই সকল সম্মানী ব্যক্তিবর্গকে পুরোপুরি সতর্ক করেননি।

কাদিয়ানীদের কর্মকৌশল এবং উদ্যম সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন– খাজা সাহেব এই এলাকাতেও চক্কর দিয়েছেন এবং বয়ানও করেছেন। এ দ্বারা জানা যায় যে, তিনি কঠোর উদ্যম এবং গভীর পলিসি নিয়ে কাজ করছেন। যেখানেই কোনো বুঝমান বা আহলে ইলম তাকে প্রশ্ন করে তাকে এ কথা বলে বসিয়ে দেওয়া হয় যে, আমি এখন জবাব দিতে প্রস্তুত নই। আর সাধারণ লোকের মধ্যে বয়ান শেষে এই কথা বলে দেয় যে, আমি হযরত মাসীহ মাসউদ ও মাহদীয়ে মাসউদ এর কাছ থেকে এই অনুমতি নিয়ে এসেছি যে, আমি শুধুই ইসলাম প্রচার করব। কারো কোন প্রশ্নের জবাব দেব না। এ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, মির্যায়ী মহব্বতের বিষ মুসলমানদের অন্তরে ঢোকানোর জন্য তিনি কী পরিমাণ চতুরতার সাথে কাজ করে যাচ্ছিলেন।

মাওলানার রচনাবলীর প্রতিক্রিয়া

মাওলানার এই বই-পুস্তক রচনা, চিঠি-পত্র এবং লিখনী এতবড় কাজ করেছিল যে, কোন কোন সময় কাদিয়ানী মুবাল্লিগরা যদি জানতে পারত যে, অমুক স্থানে মাওলানার বই-পুস্তক বিলি হচ্ছে তাহলে তারা সেই জায়গা ছেড়ে পালিয়ে অন্য জায়গায় চলে যেত। সেখানে যদি মাওলানার বই-পুস্তক তাদের পিছু ধাওয়া করত তাহলে তৃতীয় কোন জায়গায় চলে যেত। ব্যাপারটি এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই রচনাবলীর বিশেষ করে 'ফায়সালায়ে আসমানী' এবং 'শাহাদাতে আসমানী' পড়ার দ্বারা ন্যূনতম জ্ঞানের ধারক একজন লোকও এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, কাদিয়ানীদের প্রতিরোধে আজ পর্যন্ত যত কিতাবাদি রচনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে এগুলো অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কাদিয়ানীদের প্রতিরোধে তিনি যেই ভূমিকা পালন করেছেন এবং মুসলমানদের যেই পরিমাণ উপকৃত করেছেন এটা কোন ইতিহাসবিদও অনুমান করতে পারবে না।

মাওলানার এই কলমী জিহাদের মাধ্যমে হাজার হাজার নয়, লাখ লাখ মুসলমান উপকৃত হয়েছে। মুসলমানদের বিরাট বড় একটি সংখ্যা এই জালে ফেঁসে গিয়েছিল। এমন ধারণা করা হচ্ছিল যে, অধিকাংশ মানুষই এই ফেতনায় ধরাশায়ী হবে। মাওলানার প্রচেষ্টার ফলে তারা সবাই এই ফেতনার শিকার হওয়া থেকে রেহাই পেয়েছেন। এই বই-পুস্তকের প্রভাব শুধু বিহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং পাঞ্জাব, কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বে, গুজরাট, হায়দারাবাদ, সিলেট, ঢাকা, নোয়াখালী, মোমেনশাহী। মোটকথা, যেখানেই কাদিয়ানীদের পা পড়েছে, মাওলানার রচনাবলী সেখানেই তাদের পিছু ধাওয়া করেছে। এর ফলাফল এই দাঁড়িয়ে ছিল যে, হয় তো সেখানে কাদিয়ানীদের পা স্থির হওয়ার জায়গায় কাঁপতে শুরু করেছে। আর অনেক মুসলমান যারা তাদের শিকারে পরিণত হয়েছিল তারাও ফিরে এল ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। আলহামদুলিল্লাহ!

ফটক ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় কাদিয়ানীরা বিশেষভাবে স্থান দখল করে ফেলেছিল এবং এখানে তাদের শক্তিশালী একটি দলও হয়ে গিয়েছিল। দিন দিন এর সংখ্যা বৃদ্ধিই পাচ্ছিল। তবে সেখানকার মাদরাসা সুলতানিয়ার সদরুল মুদাররিস হযরত মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ কাসেম বিহারী দ্রুততার সাথে তাদের প্রতিশোধকের ব্যবস্থা করেন। মাওলানার বই-পুস্তক নিয়ে সেখানে বিতরণের ব্যবস্থা করেন। আলহামদুলিল্লাহ! এই প্রচেষ্টার ফল এই দাঁড়ায় যে, এখান থেকে এই ফেতনা সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়।

ফটক থেকে মাওলানার একজন অনুসারী সেখানকার অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে তাকে লিখে জানান- 'এই অঞ্চলে হযরতের বই-পুস্তকের খুব সুন্দর প্রভাব পড়েছে। মুসলমানদের আকীদা অনেকটা সহীহ হয়ে গেছে। বিরাট একটি দল যারা কাদিয়ানী হওয়া দ্বারপ্রান্তে চলে গিয়েছিল তারা এই কিতাবের বদৌলতে কাদিয়ানী হওয়ার থেকে ফিরে এসেছে। এখন অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, খোদ কাদিয়ানিরাই তাদের ধর্মমত নিয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পারছে না। বিহারের অনেক মসজিদ-ই কাদিয়ানীরা দখল করে রেখেছিল আর মুসলমানরাও এটাকে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু মাওলানার উৎসাহ প্রদান এবং মনোবল বৃদ্ধি করণের কারণে তিন চারটি মসজিদের ব্যাপারে হাইকোর্টে মামলা করা হয় এবং তাতে সফলও হয়। পাঞ্জাবেও মামলা হয়েছিল কিন্তু এতে কাদিয়ানীরা জয়লাভ করে। বিহারের এই সাফল্যের প্রভাব অন্যান্য জেলাতেও পড়েছিল, যে কারণে পাঞ্জাবেও কিছু মামলায় মুসলমানরা জিতে যায় এবং কাদিয়ানীদের থেকে তাদের মসজিদগুলোকে পুনরায় দখল করার সুযোগ পায়।

যদি কয়েক বছর পরও মির্যা সাহেব অথবা তার অনুসারীদের কেউ যদি মাওলানার কোন কিতাবের জবাব দিত, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মাওলানা তার পাল্টা জবাবে বই লিখতেন। এর ফল এই দাঁড়ায় যে, তারা আর জবাব লেখার হিম্মত পেল না এবং এই ময়দানে তাদের সফল হওয়ার চিন্তা মাথা থেকে একেবারেই দূর হয়ে গেল।

যেহেতু মাওলানা জটিল মাসায়েল এবং ইলমী আলোচনাকেও খুব সহজ সরল করে হৃদয়গ্রাহীভাবে উপস্থাপন করতে অভ্যস্ত ছিলেন। এ জন্য সাধারণ মুসলমানদের জন্য এটা খুবই সহজ ছিল। আর মাওলানার উদ্দেশ্যেও ছিল তাই। মাওলানা অধিকাংশ সময় বলতেন– 'এ পরিমাণ লিখ, এত বেশি ছাপাও এবং এই পদ্ধতিতে বণ্টন কর যে, প্রতিটি মুসলমান যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তখন যেন সে তার বালিশের পাশে কাদিয়ানীবিরোধী বই পায়।'

এর বাস্তবতা এই যে, মাওলানা এর ওপর আমল করে দেখিয়েও দিয়েছেন। আর তার অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা এবং কাদিয়ানী প্রতিরোধে ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা এবং ধারাবাহিক সংগ্রাম এই বক্তব্যের সত্যায়নের জন্য যথেষ্ট। আমীন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হেদায়াত ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও তার গুরুত্ব-

মাওলানার জীবনের আলোকিত ও সর্বশেষ অধ্যায়টি সত্যের প্রতি পথনির্দেশ ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। এ অধ্যায়টি তার সংস্কারসাধনা, আত্মার পরিপূর্ণতা এবং অন্তর্গত রুচি-অভিরুচি ও চিন্তা-চেতনার পরিচয় বহন করে।

উপরোক্ত বিষয়াবলি যে শুধু মাওলানার জীবনের শেষ অংশে প্রকাশ পেয়েছে তা নয় বরং শৈশব থেকেই মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এ দিকটির প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। এটাকে তিনি জীবনের মূলধন এবং এটাকেই জীবনের প্রাপ্তি বলে মনে করতেন। তার কাছে এ 'আত্মিক সম্পদই' সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয় ও প্রয়োজনীয় ছিল।

নদওয়াতুল উলামার চিন্তা-চেতনা, কর্মপন্থা ও পরিকল্পনার মাঝে রুহানিয়াত ও দূরদর্শিতার সুন্দর ও মনোহর যে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় তা মূলত মাওলানার এই দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতিরই ফল।

তার কাছে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, বৃহত্তর সেবা, প্রচার ও প্রসিদ্ধি-উন্নতির চূড়ান্ত শিখর বা সফলতার চূড়ান্ত মানদণ্ড ছিল না। তার কাছে সফলতার মানদণ্ড ছিল, সত্য সুন্দর ও সুগভীর ওই সম্পর্ক যা আল্লাহর সাথেই বান্দার হওয়া উচিত এবং মারেফাত ও মহব্বতের এমন সাধ ও সুধা যা সকল আবেগ-অনুভূতিতে, মহব্বত ও সম্পর্কে প্রতিটি শিরা উপশিরায় মানুষ সুস্পষ্টভাবে অনুভব করবে। মোটকথা- সফলতা হলো, মহব্বত ও আত্মত্যাগের এমন একটি অবস্থা যা সর্বক্ষেত্রে সর্বক্ষণ বান্দার মাঝে প্রকাশ পাবে, এমনকি যে তার কাছে বসবে, যে তার কথা শুনবে, যে তাকে দেখবে এবং যে তার লেখা পাঠ করবে সেও তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে যাবে না। অবস্থা দেখে মনে হতো - তার জীবনের ভাষা যেন এটাই বলছে-

ہمارے پاس ہے کیا جو فدا کریں تجھ پر

مگر یہ زندگی مستعار رکھتے ہیں

'কিই বা আছে আমার কাছে দান করিবো?

সব সপিলাম, জীবন দিলাম আর কী দেবো।'

এ চিন্তা না মাওলানার নিজস্ব কোন রুচি-অভিরুচি, না নদওয়াতুল উলামার কোন ইলমী গবেষণা, না কোন বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা- বরং এটাই ইসলামের প্রাণশক্তি এবং এটাই ইসলামের মৌলিক দাওয়াত। এ চিন্তা ইসলামের মতই সকল নতুনত্ব ও প্রাচীনতার উর্ধ্বে- সূর্যের মতো উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়।

ইসলাম আল্লাহর সাথে বান্দার শুধু দর্শন ও নীতিগত সম্পর্কেরই দাবিদার নয় বরং ওই আবেগের সম্পর্কেরও দাবিদার যে আবেগ সকল চেতনা ও কর্মসাধনা, মহব্বত ও প্রার্থনা, তাওয়াক্কুল ও আল্লাহ-নির্ভরতা, সবর ও শোকর এবং ত্যাগ ও কুরবানির মতো সকল কর্ম, সম্পর্ক ও ইচ্ছাশক্তির প্রাণ।

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ এবং رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَرَضُوْا عَنْهُ. এর মধ্যে এই মাপকাঠি ও গভীর উদ্দেশ্যের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে এবং যে প্রবল আবেগ মানুষকে প্রতি পলে পলে (লক্ষের প্রতি) অস্থির ও উন্মত্ত করে তোলে এবং যে আবেগ মানুষের মনোবল, অভিলাস, সাধ্য, যোগ্যতা ও কর্মস্পৃহাকে নিস্পৃহ করার পরিবর্তে নতুন চেতনা ও প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ করে (উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে) তাকেও বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। এ আয়াতাংশ যোগ্যতা ও উপযুক্ততার প্রতিও প্রেরণা যোগায় যেন সে আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভ করে মনযিলে মাকসূদে পৌঁছে যেতে পারে। মাওলানার জীবনের উজ্জ্বলতম ও সর্বশেষ অধ্যায় এই দৃষ্টিকোণ থেকেই লেখা হয়েছে এবং ওইসব গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে যে গুণাবলি সর্বদা তাঁর মাঝে থাকলেও শেষ জীবনে আলোকোজ্জ্বলরূপে দৃশ্যমান হয়েছে।

মুঙ্গেরে অবস্থান

মাওলানার মুঙ্গেরে অবস্থান ও নির্জনবাসের ব্যাপারে চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ কয়েকটি পৃষ্ঠায় কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে, সেগুলো এখানে পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে যে কথাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হলো- মুঙ্গেরে বসবাসের সিদ্ধান্তে মাওলানার কোন ভূমিকা ছিল না। তার কিছু ভক্ত-মুরিদ সেখানে অবস্থানের ব্যাপারে খুব পীড়াপীড়ি করছিলেন। সেই ভক্তদের মধ্যে এ ব্যাপারে সর্বাধিক অগ্রসর ছিলেন- দেলোয়ারপুরের জনাব শাহ সাহেব,

হাকিম আহমাদুল্লাহ খান এবং হাজি তুরাব আলীর পরিবার। হাজি তুরাব আলী সাহেব একবার মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ.–এর খলীফা মাওলানা তাজাম্মুল হোসেন বিহারীকে তার এ ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার কথা জানালে তিনি বললেন, যদি এমনই ইচ্ছা থাকে তবে তাঁর থাকার জন্য একটি জায়গার ব্যবস্থা করো! হযরতের কানপুর ত্যাগের ইচ্ছা। তিনি যেন এখানে চলে আসেন। এ ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করবো। এ কথাটি শুনে তোরাব আলী সাহেব অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং বললেন, আমার বাগিচাটি প্রস্তুত আছে, হযরতের অনুমতি নিয়ে নিন, আমি সেখানেই ঘর করে দেবো। এরপর তিনি নিজেই কানপুর গিয়ে হযরতের কাছে এ দরখাস্ত পেশ করেন। কিন্তু হযরত সাড়া দেননি। হাজী আহমাদুল্লাহ সাহেব অসুস্থ অবস্থায় হযরতের আগমনের খবর পেলে এই কল্যাণময় কাজে তিনি অগ্রগামী থাকতে চাইলেন। ফলে তিনি মাওলানা তাজাম্মুল সাহেবের মাধ্যমে হযরতের কাছে তার বাগিচার জায়গাটি গ্রহণের সুপারিশ জানালেন।

মোটকথা- এ সৌভাগ্য তার জন্যই নির্ধারিত ছিলো, মাওলানা সাহেব তার বাগিচার জায়গাটিই গ্রহণ করলেন। মাওলানা সাহেবের সাথে হাকিম সাহেবের গভীর সম্পর্ক ও মহব্বত ছিল। কোন কোন সময় মাওলানা নিজেই তার জযবা ও ভালোবাসার প্রশংসা করেছেন। এ কারণেই সম্ভবত তার বাগিচার জায়গাটি ছোট হওয়া সত্ত্বেও তিনি পছন্দ করেছেন। বাগিচায় কিছু আম গাছ ছিল, বাকি জায়গাটুকুতে চাষাবাদ হতো। বৃক্ষগুলোর কাছেই হাকিম সাহেব একটি ছোট ঘর বানিয়ে দিয়েছিলেন। ভক্তদের চেষ্টায় সেখানের আরো কিছু জায়গা সাফ করা হলো। হাকিম সাহেবের ইন্তেকালের পর (মাওলানা সাহেবের আগমনের দুই তিন বছরের মধ্যেই) তাঁর স্ত্রী যাকেরীন ও অবস্থানকারীদের জন্য মসজিদের পাশে হুজরা বানিয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে এ জায়গাটি একটি দ্বীপের মতো হয়ে গেল- যেখানে প্রবৃত্তির পাপে পিষ্ট ও পার্থিবতার তাপে দগ্ধ কত ইনসানের হেদায়াত মিলেছে তার ইয়ত্তা নেই। এখানে তাদের ধৈর্য্য, নম্রতা, অন্তর্জ্বালা, অন্তরদহন, এমনকি অন্তরতৃপ্তির এমন এক অনুভূতি হয়েছে যা শুধু আল্লাহর প্রিয়-মুখলিস বান্দাদের হয়ে থাকে। এই নম্রতা ও মহব্বতের ছায়ায়ই তাদের আত্মশুদ্ধি ঘটেছে। এখানে তারা ঈমান এবং বিশ্বাসের এমন এক রৌশনাই যা ভক্তি ও ভালোবাসার অপূর্ব এক দৌলত লাভ করেছে প্রাণের বিনিময়ে পেলেও যাকে সস্তা বলা যায়।

گر ایں سودا بجاں بودے چہ بودے

মুঙ্গেরের পথে প্রথম সফর

মুঙ্গেরে আসা যাওয়া, হেদায়াত ও বাইয়াতের কাজ যদিও মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদীর ইন্তেকালের পর ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিলো কিন্তু মুঙ্গেরের পথে তাঁর সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বড় সফরে তাঁর প্রতি জনসাধারণের বিনয় ও আনুগত্যের এবং ভক্তি ও ভালোবাসার চমৎকার প্রকাশ ঘটেছিলো। কোন ধরনের পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই সাধারণ মানুষের এমন ঢল নেমেছিলো যার কারণ কেবল ওই হাদীসের ভাষ্যই হতে পারে যেখানে বলা হয়েছে, 'যখন কাউকে আল্লাহ বন্ধু বানিয়ে নেন তখন ফেরেশতারা সৃষ্টি জগতের মাঝে এ ঘোষণা দিয়ে দেন যে, অমুককে আল্লাহ বন্ধু বানিয়েছেন। তোমরাও তাকে বন্ধু বানিয়ে নাও'। এ সফরে তিনি পাটনা হয়ে মুঙ্গেরে আসছিলেন। পথে বারবার এমন হচ্ছিলো যে, যখনই কোন স্টেশনে গাড়ি থামছিলো মানুষের ভীড় জমে যাচ্ছিল। বেশি সময় থামলে পাঁচ দশ ক্রোশ দূরের লোকও এসে উপস্থিত হচ্ছিল। কখনো কখনো পাঁচ শতাধিক মানুষ একত্রে বাইয়াত হচ্ছিলো। অনেক হিন্দুকে দুই হাত জোড় করে মাওলানাকে সালাম করতে দেখা গেছে। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করতো, ইনি কে? তারা বলতো, গুরুজী যাচ্ছেন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো যে, সবার দিলের হালাত বদলে গেছে। যাদের সাথে মাওলানার কোন হৃদ্যতা ছিল না এমনকি যারা মাওলানার নামও পর্যন্ত জানতো না তারাও মাওলানার প্রতি অকৃত্রিম টান অনুভব করতে লাগলো। দমকা হওয়া যেমন সাধারণ ও বিশেষ শ্রেণীর মাঝে পার্থক্য করে না, সবার উপরে সমানভাবে প্রবাহিত হয়, তেমনি এই 'বিহারী বাতাস' থেকেও প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী উপকৃত হচ্ছিলো। কামালাতে মুহাম্মাদিয়ার লেখক মাওলানার এই সফরের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, ১৩১০ হিজরীর সফর আমাদের চোখের সামনে আল্লাহু আকবার! সেই সফরের বিবরণী হলো, মুঙ্গেরের কিছু সম্ভ্রান্ত লোক কানপুরে গিয়েছিলেন তাঁকে আনতে, তিনি আসেননি। এরপর তার এক ইলমওয়ালা দোস্ত তাঁর নিকট পত্র লিখলেন যাতে নিম্নোক্ত কবিতা পংক্তি ছিল–

ہمہ دلہا گرفتارت ہمہ جانہا خریدارت

ہمہ مشتاق دیدارت کہ روزے جلوہ فرمائی

'দিল আমার বন্দী তোমার কাছে,

মন আমার তোমায় দিলাম বেচে,

দিল চায় দেখবো তোমায়

যেদিন তোমার জালওয়া প্রকাশ হবে।'

মুরশিদের সাথে তায়াল্লুক

মাওলানা বলেন, এই কবিতা আমার মধ্যে এক আশ্চর্য প্রভাব সৃষ্টি করলো। মনে হচ্ছিলো যেন, অদৃশ্যালোক থেকে এটি পাঠ করা হয়েছে। তৎক্ষণাৎ আমি মুঙ্গেরের পথে যাত্রা শুরু করি। মাওলানা বলেন, 'যখন রেলগাড়িতে আরোহন করি, মনে হচ্ছিলো যে হযরতওয়ালা পীর মুরশিদ সফরে আমার সাথে আছেন। সারা পথ আমার অবস্থা এমন ছিল যে কখনো মনে হচ্ছিলো, মুরশিদ রহ. আমার সাথে আছেন কখনো নিজের চেহারাকে মুরশিদের চেহারা বলে মনে হচ্ছিলো'।

খুব সম্ভব তিনি কানপুর থেকে প্রথম পাটনায় তারপর মুঙ্গেরে গিয়েছিলেন। এ সময়ে তিনি মানুষের অকৃত্রিম ভক্তি ও আনুগত্য দেখে অভিভূত হন। একদিনের জন্যও যেখানে তিনি নেমেছেন দশ দশ মাইলের লোক জমা হয়ে গেছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, যেখানে পূর্বে তাঁর যাত্রা বিরতির কথা ছিল না, আকস্মিকভাবে যাত্রাবিরতি হয়ে গেছে, কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানেও মানুষের ভিড় জমে গেছে। পরবর্তী দিন আশপাশের পাঁচ দশ গ্রামের লোক এসে উপস্থিত।। এমনো দেখা গেছে যে, রেলগাড়ি স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে আর হিন্দুরা সে গাড়ির সামনে সেজদা করে আছে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলছে, গুরুজী যাচ্ছেন।। বাইয়াতের সময় পাঁচ পাঁচশো মানুষের মজমাকে একসাথে মুরিদ হতে তো আমি নিজেই দেখেছি। আর দশ, বিশ, পঞ্চাশ, একশোজন একত্রে মুরিদ হওয়া ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। আমার কাছে এ লেখাও আছে যে, একেক জেলায় দুই দুইশত গ্রামের মানুষ মুরিদ হয়ে গেছে।

এক হাতে দীনের পেয়ালা আরেক হাতে প্রেম-শরাব

এই এক সফর থেকেই অনুমান করা যায়, ১৩১০ একদিকে যখন নদওয়াতুল উলামার কল্পছবি তার চিন্তায় মুকুলিত হচ্ছে, কল্পনার চিত্রপটে যখন কেবল রং তুলি টানাই বাকি, ঠিক সেই সময় বিশালসংখ্যক মানুষ হেদায়াত ও পথ প্রদর্শন, রুহানী দীক্ষা, সংশোধন ও সংস্কারের ময়দানে তার থেকে কী বিরাট উপকার লাভ করছে! এই লোকেরা এমন সব যোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে শুরু করেছিলো যা এই পথের কামেল ও মুজতাহিদ লোকেরা অর্জন করে থাকে।

মজার ব্যাপার হলো, নদওয়াতুল উলামার বিনির্মাণের সাথে সাথে তাসাউফ ও ইহসানের বুনিয়াদও শুরু হয়েছিলো এবং এ দুটোর পথচলা প্রায় একসাথেই শুরু হয়েছিলো। যতদিন পর্যন্ত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী নদওয়াতুল উলামার নাযেম/দায়িত্বশীল ছিলেন এই দুটি অংশ সমান মনোযোগ ও গুরুত্বের সাথে

সমানভাবে বেড়ে উঠছিলো। এক্ষেত্রে যুক্তি ও ভক্তির এতো চমৎকার সামঞ্জস্য ছিল যে শুদ্ধ ও সঠিক ইসলামী দল উপদলগুলোর অস্তিত্ব ও উন্নতি 'যুক্তি-ভক্তির এ সামঞ্জস্যের' মাঝেই নিহিত এবং মানবজীবনের স্থিতিশীলতা, উপযোগীতা ও অগ্রগামিতা এর ওপরই নির্ভরশীল এবং এর মধ্যেই সর্বযুগের নাযুকতম ও সংকটময় সমস্যার সমাধান রয়েছে।

নদওয়াতুল উলামায় তিনি এগারো বছর নাযেম হিসেবে দায়িত্বপালনের সময়ে যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতোপূর্বে গেছে–এমন কিছু মুহূর্ত এসেছে যার গোড়ারকাহিনী পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী যখন জীবিত ছিলেন, তার কাছে আসা লোকদেরকে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করতেন, আমাদের মাওলানা মুহাম্মদ আলীর সাথে সাক্ষাত করেছো? কেউ না সূচক উত্তর দিলে তিনি সাক্ষাতের তাকিদ দিতেন অথবা চুপ থাকতেন। গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ.–এর ইন্তেকালের পর কুদরতিভাবে এই পুরা হালকা মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ.–এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলো। যিকির, বাইয়াত, তওবা ও তেলাওয়াতের মজলিস লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো। নদওয়ার বড় বড় পদ ও দায়িত্বের পাশাপাশি সাধারণ মুসলমানদের আত্মশুদ্ধি ও জীবনগঠনের কাজও তিনি করে যাচ্ছিলেন। নদওয়াতুল উলামা ত্যাগের পর এ কাজ আরো ব্যাপক প্রসার লাভ করলো।

সুউচ্চ মর্যাদা ও অমুখাপেক্ষিতা

এ সময়ে অসংখ্যবার মাওলানার কাছে চাকরি অথবা কোন পদ ও দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু তাঁর মাধ্যমে দীন ও ঈমানের যে দৌলত আল্লাহর হুকুমে বান্দাদের মাঝে বণ্টিত হচ্ছিলো তিনি তা সীমাবদ্ধ করে ফেলতে কোন অবস্থাতেই রাজি ছিলেন না। একবার তিনি মুরাদাবাদ গিয়ে মাওলানা ফযলে রহমান রহ.–এর খেদমতে হাজির হলেন। মাওলানা তাঁকে দেখেই বললেন, আমার কাছে একজন মুহতামিম এসেছিলেন, তিনি একজন আলেম খুঁজছেন, খানিক পড়াতে হবে, মাসে দুইশত রুপিয়া দেবেন, তুমি চলে যাও। তিনি বললেন, মৌলভী আহমাদ হাসান কানপুরী সাহেব অথবা মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবকে পাঠান। তিনি বললেন, আমি তোমাকে বলছি! মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী বললেন, যদি আদেশ হয় তবে আমার কোন আপত্তি নেই। তিনি বললেন, আদেশ নয়, তোমার মন চাইলে যেতে পারো। আলী মুঙ্গেরী রহ. বললেন, হযরত! মন তো চায় না। একথা শুনে মাওলানা মুরাদাবাদী চুপ হয়ে গেলেন। এমন আরেকবার হাফেজ আব্দুল করীম সাহেব –যিনি হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস ছিলেন এবং মাওলানাকে খুব মহব্বত করতেন– মাওলানার সামনে এ ইচ্ছা পেশ

করলেন যে, মাওলানা হাইকোর্টের উচ্চশ্রেণীর বিচারকের পদ গ্রহণ করবেন। কাজ বুঝে ফেললে দ্রুত হাইকোর্টের জজ পদে উন্নীত হতে পারবেন। কিন্তু মাওলানা এ প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। হাফেজ সাহেব মনে করলেন, জজ পদে ঘুষ নিতে হবে বলে মাওলানা হয়তো রাজি হচ্ছেন না। তাই তিনি সাধারণ কাজির পদ গ্রহণের প্রস্তাব করলেন কিন্তু এবারো তিনি ওযর পেশ করে বললেন, হাফেজ সাহেব! আমি কাজিও নই, মুফতিও নই, আপনি আমাকে মাফ করুন! আরো একবার হায়দারাবাদ থেকে চাকরির প্রস্তাব এলো। মাওলানা ফযলে রহমান রহ. জিজ্ঞাসা করলেন, হায়দারাবাদ থেকে কি লোকেরা তোমাকে ডাকছে? তিনি বললেন, জি, হ্যাঁ। মাওলানা ফযলে রহমান রহ. বললেন, তবে যাচ্ছোনা কেন? চলে যাও! ইতোপূর্বে এক মুহতামিমের প্রস্তাবে মাওলানার বলা সত্ত্বেও রাজি না হওয়ায় দ্বিতীয়বারও অসম্মতি প্রকাশ করতে তাঁর দ্বিধা হলো- তিনি হায়দারাবাদ চলে গেলেন। কিন্তু সেখানে মন না বসায় চাকরি ছেড়ে ফিরে এলেন। ইতোপূর্বে মাঝে মাঝে তার যে অর্থকষ্ট দেখা দিত হায়দারাবাদ থেকে ফেরার পর আল্লাহর কুদরতে তাও দূর হয়ে যাচ্ছিলো। 'কামালাতের' লেখক মাওলানার জবানীতে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

(মাওলানা বলছেন-) 'হায়দারাবাদ থেকে ফেরার পর খরচের ক্ষেত্রে কখনো সংকট দেখা দেয়নি। অথচ কখনো চারগুণ বেশি খরচও হয়ে গেছে। তবু স্বাচ্ছন্দেই জীবন কেটেছে। তিনি বলেন, কখনো মনে প্রশ্ন জেগেছে, হায়দারাবাদ থেকে ফেরার পর থেকে অর্থ-স্বাচ্ছন্দে জীবন কাটছে, এর কারণ কী? এর কারণ হিসাবে একবার মনে জাগলো যে, হায়দারাবাদে মাসপ্রতি চারশো রুপিয়ার চাকরি আমি আল্লাহর ইচ্ছায় ছেড়ে এসেছি। আল্লাহ বড় অমুখাপেক্ষী- আপন দয়ায় তিনি এই প্রতিদান দিয়েছেন যে, হায়দারাবাদের বিচারক ও জজেরা যে প্রাচুর্য লাভ করে থাকেন অত্যন্ত সম্মানের সাথে আমিও সেই প্রাচুর্য লাভ করছি। উপরোক্ত সে সকল পদের কারণে যে সকল জিম্মাদারি, বিপদ-আপদ ও গোনাহের সম্মুখীন হতে হয় তা থেকে আল্লাহ আমাকে পরিপূর্ণ নিরাপদ রেখেছেন। الحمد لله علي إحسانه প্রকৃত সত্য হলো,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

(যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ খুলে দেন এবং এমন জায়গা থেকে তার রিজিকের ব্যবস্থা করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না)

একবার মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ. বললেন, আমাদের মৌলভী মুহাম্মদ আলী তো খুব ধনী!। একলোক জিজ্ঞাসা করলো, হযরত তিনি

কি খুব পয়সাওয়ালা?। হযরত বললেন, বড় বেকুব তো তুমি! টাকা পয়সা দিয়ে কেউ কি কোথাও ধনী হয়েছে?

اَلْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ.

(ধনী তো সেই, প্রাচুর্য রয়েছে যার অন্তরে)

আমীর উমারাদের দাওয়াত পরিহার

হযরত আলী মুঙ্গেরী সব সময় আমীর উমারাদের দাওয়াত পরিহার করে চলতেন। তবে এতে কোন দীনী ফায়দা ও উপকারিতা থাকলে ওযর পেশ করতেন না, একটি দীনী কাজ ও আল্লাহর নেয়ামত মনে করে তা গ্রহণ করতেন। হায়দারাবাদ অবস্থানকালে একবার খুরশিদ জাহ্ বাহাদুর তাকে দাওয়াত করলেন। কিন্তু মাওলানা গেলেন না। অথচ এই নওয়াব খুরশিদ জাহ্-ই কানপুরে তিনবার মাওলানার খেদমতে হাজির হয়েছিলেন। নওয়াব সাহেবের সৈনিকপ্রধান (যিনি দাওয়াতনামা নিয়ে মাওলানার কাছে গিয়েছিলেন) অনেক পীড়াপীড়ি করতে থাকলে মাওলানা বললেন, দাওয়াত গ্রহণের জন্য আমাদের এখানে কিছু শর্ত আছে– 'তার একটি হলো দাওয়াতকারী নিজে এসে দরখাস্ত করবে। তিনি ছাড়া আমরা যাবো না'। সৈনিকপ্রধান বললো, নওয়াব সাহেব তো তিনবার কানপুরে আপনার খেদমতে হাজির হয়েছিলেন!, এখানে আসতে তো তাঁর কোন আপত্তি নেই কিন্তু কিছু সমস্যার কারণে এখনিই আসতে পারছেন না। এতদসত্ত্বেও মাওলানা তার দাওয়াত কবুল করলেন না।

হায়দারাবাদের অবস্থা থেকে জানা যায়, সে সময় মাওলানার ইলমী গবেষণাও চলছিলো। 'মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী'–এর কয়েকটি নুসখা (কপি) মাওলানা হায়দারাবাদে পেয়েছিলেন। মাওলানার কাছে 'নুসখায়ে মুরতাযা' ছিল। এটি ছিল ভুলে ভরা। তাই তিনি অন্য কপিগুলো সামনে রেখে সেটি সংশোধন ও পরিমার্জন করছিলেন। এ সময়ে তাঁর মধ্যে আশ্চর্য ও অলৌকিক ভাব ও অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল এবং তিনি ক্রমশ রুহানী তারাক্কি অনুভব করছিলেন।

আলী মুঙ্গেরী সম্পর্কে মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদীর কিছু মূল্যবান উক্তি

মাওলানা ফযলে রহমান রহ. এর কাছ থেকে ইজাযত লাভের পর– এ সংক্রান্ত আলোচনা কিতাবের শুরুতে করা হয়েছে– কোন ঘোষণা ছাড়াই আকস্মিকভাবে মানুষের মাঝে একথা প্রচারিত হয়ে গেল যে, মাওলানা মুঙ্গেরী খেলাফতও লাভ করেছেন।

মাওলানা নিজেই বলেছেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে 'মাওলানা রহ.-এর খলিফা' সম্বোধনে চিঠি আসতে লাগলো। লোকজন বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগলো। কানপুরের জনৈক ব্যবসায়ী যিনি মাওলানা ফযলে রহমান সাহেবের খাদেম ছিলেন, এ খবর শুনে মাওলানার কাছে বাস্তব ঘটনা জানতে চাইলেন। মাওলানা বললেন, হযরত কেবলা জীবিত আছেন, তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি সেই দিনই কিংবা তার দুইদিন পর মাওলানার খেদমতে হাজির হয়ে এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে মাওলানা বললেন, 'হ্যাঁ, আমি আল্লাহর নাম বলার অনুমতি দিয়েছি, কতই না বড় বিষয়! তাঁর আত্মা পূর্ববর্তীদের আত্মার সাথে মিলিত। এমন মানুষ সব যামানায়ই খুব কম হয়'।

মুঙ্গেরে লোকজনের ভিড়, মানুষের মহব্বত ও আসক্তি দেখে মাওলানা হযরত ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদীর কাছে পত্র লিখলেন-যা কামালাতে মুহাম্মদিয়ায় লিপিবদ্ধ আছে। এই চিঠিতে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা, তার দিকে মানুষের ঝুঁকে পড়া, তাঁর কাছে মানুষের আসা ও তাঁর প্রতি মানুষের ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে সে যুগের মানুষেরা তাদের আচার-অভ্যাস অনুযায়ী আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু করে দিলো এবং মাওলানার খেলাফতপ্রাপ্তির বিষয়টি একটি ইখতিলাফি বিষয়ে পরিণত হলো। কিছু লোক ভুল বুঝে কিংবা প্রতিহিংসাবশত মাওলানার সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করতে লাগলো। অবস্থা যখন প্রকট আকার ধারণ করলো, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাওলানা খানিকটা ভারাক্রান্ত ও ব্যথিত হয়ে পড়লেন এবং মাওলানা ফযলে রহমানকে চিঠি লিখে এ ব্যাপারে অবহিত করলেন। চিঠির জবাবে তিনি লিখে পাঠালেন, 'এসব আচরণের প্রতি বেশি ভ্রুক্ষেপ করো না'। তাকে উদ্দেশ্য করে আরো কিছু মূল্যবান কথা লিখলেন। তিনি লিখলেন, 'খাইরুল্লাহ শাহ তোমার সাথে বিবাদ করছেন, তিনি তো তোমার মর্তবা জানেন না। ওসব কথার প্রতি তুমি ভ্রুক্ষেপ করো না। এমন সময় আসবে যখন প্রচুর মানুষ তোমার কাছে মুরিদ হতে আসবে। তোমার কাছ থেকে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করবে।' 'কামালাতে রাহমানির' লেখক মাওলানা শাহ তাজাম্মুল হোসেন বিহারী -যিনি মাওলানা শাহ ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদীর লোকদের একজন ছিলেন ঘনিষ্ঠ। একবার ফযলে রহমান রহ.কে জিজ্ঞাসা করলেন, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী কী আপনার খলীফা? উত্তরে তিনি বললেন, আমার সে যোগ্যতা নেই যে আমি তাঁকে খলীফা বলবো, তিনি বড় মানুষ।

প্রচলিত বয়ান-বক্তৃতার প্রতি অনীহা

প্রচলিত ওয়ায়েজ-বক্তাদের মতো বয়ান করার প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। সাধারণ মজলিসে সাধাসিধা কথা বলাই তিনি বেশি পছন্দ করতেন। বেশি প্রয়োজন পড়লে অল্প কিছু কথা বলতেন, কিন্তু যারা শুনেছেন এবং যারা দেখেছেন তারা বলেছেন, ওই অল্প ক'টি কথায় এতো বেশি প্রতিক্রিয়া হতো যে অন্যদের বিরাট বিরাট ওয়াজ ও বক্তৃতায়ও সে প্রতিক্রিয়া হতো না। শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর লোকেরা যখন তাকে ওয়াজের জন্য পীড়াপীড়ি করত, তিনি না করে দিতেন। মানুষের পীড়াপীড়ি বেড়ে গেলে তিনি বলে দিতেন, মাওলানা ফযলে রহমান সাহেব যা বলবেন আমি তাই করবো। এরপর তিনি মাওলানাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন,

দু'চারজন মানুষ কাছে এসে বসলে আল্লাহ রাসূলের কথা শুনিয়ে দেয়া-এটাই ওয়াজ। অহেতুক অহংকার পেয়ে বসে বা নফস মোটা হয়ে যায়-এমন পদ্ধতিতে ওয়াজ না করা উচিত। এ উপদেশের ফলে মাওলানার অধিকাংশ সময় নির্জনে কাটতো। কারো সাথে বলার বা শোনার মতো কথা থাকলে আলাদাভাবেই বলতেন বা শুনতেন। দুই ঘণ্টা বাইরে কাটাতেন এবং লোকজন জমা হয়ে গেলে প্রয়োজনীয় দুই চারটা কথা খুবই সাধাসিধা ও সরলভাবে বলে দিতেন। এই কথাগুলোই হৃদয়কে আপ্লুত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কখনো কখনো এ কথাগুলোর প্রভাব এতো বেশি হতো যে, উপস্থিত লোকদের চোখগুলো অশ্রুসিক্ত ও দিলগুলো বেকারার হয়ে উঠতো। লোক বেশি হোক বা কম হোক- সর্বদা এমন সরল ও হৃদয়গ্রাহী কথাই তিনি বলতেন। কখনো এমন হয়েছে যে, বড় বড় ইখতেলাফ মাওলানার কয়েকটি কথায় শেষ হয়ে গেছে। কখনো কয়েকটি বাক্যে শত শত মানুষের ইসলাহ হয়ে গেছে। কখনো শুধু তাঁর মুখের আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ মানুষের হৃদয়কে উত্তপ্ত করে তুলেছে। মজলিসের হালাত পাল্টে গেছে। এটা হয়েছে মূলত মাওলানার ইখলাসের বরকতে। আর–

گفتہ او گفتہ اللہ بود

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

'তার কথা মূলত আল্লাহরই কথা

যদিও তা বের হয় আল্লাহর বান্দার কণ্ঠ দিয়ে।'

বিশেষ কোন আয়োজন এবং বিশাল কোন বক্তব্য ছাড়াই এমন কাজ হচ্ছিলো যে 'শানদার তাকরীর কি জনদার মাহফিল' কোথাও এমন হয় না। অথবা হলেও

দীর্ঘস্থায়ী হয় না। শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এটাই মাওলানার অভ্যাস ও কর্ম ছিল। তিনি কখনো পেশাদার বক্তারূপে মানুষের সামনে আসেননি। এধরনের বয়ান-বক্তৃতা তিনি পছন্দও করতেন না। তবে প্রয়োজন হলে পিছপা-ও হতেন না। অবশ্য সেক্ষেত্রে শুধু প্রয়োজনীয় কথাটুকুই বলে দিতেন, না কখনো নিজের বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্যের প্রকাশ ঘটাতেন, না নিজেকে কখনো পীর মুরশিদরূপে মানুষের সামনে উপস্থাপন করতেন।

মানুষের ঢল

১৩২০ হিজরী মোতাবেক ১৯০২ সালের শেষদিকে মাওলানা মুঙ্গেরে অবস্থান গ্রহণ করেন। শুরু থেকেই মানুষের এমন ঢল নেমেছিলো, মনে হচ্ছিলো যেন, এতোকাল তারা মাওলানার অপেক্ষায়ই বসেছিলো।

পরবর্তী সময়ে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, মাওলানা যে জেলা বা যে গ্রামে পা রাখতেন সেখান থেকে পাপ ও পাপাচার, বেদীনী ও অনাচার দূর হয়ে যেতো। যে ব্যক্তি আকণ্ঠ শরাবে ডুবে ছিল, নামাজ থেকে ছিল পলায়নপর সে কেবল নামাযিই হলো না বরং নামাজের একজন দায়ী ও মুবাল্লিগ বনে গেলো। আল্লাহর সাথে তার সংযোগ ও সম্পর্কের অবস্থা এরূপ হলো যা সৎ ও মুত্তাকি লোকদের মাঝে দেখা যায়। মিইয়ে যাওয়া ফুলকলি অথবা বৃক্ষের শুকনো পাতা বসন্তে কোন সময় যদি সজীব সতেজরূপে জেগে ওঠে তবে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু ঈমান ও হিদায়াতের এই বসন্ত বায়ু শুষ্ক ও মৃত হৃদয়ে যেভাবে প্রাণের সঞ্চার করেছে তা অন্তত পরবর্তী ওই লোকদের এমন ঘটনা যাদের কথা ইতিহাস ভুলে না। কখনো এমন হয়েছে যে, হযরতের আগমনে সমগ্র অঞ্চলের একজন দুইজন আর বাচ্চারা ছাড়া সকলেই তওবাকারী হয়ে গেছে। কামালাতে মুহাম্মদিয়ার লেখক মুহাম্মদ আলী হাসান রহ.– যিনি কিছুকাল মাওলানার সোহবতে ছিলেন, নিজ চোখে দেখা এমন একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

তিনি লিখেছেন, ১৩২০ হিজরীতে কিছু লোক মাওলানাকে দরভাঙ্গা জেলার হরিশিং পুর গ্রামে নিয়ে গেল। এখানে তাদের অধিকাংশ পাড়া-পড়শী কবরপূজারী, বেনামাযি ও মাদকাসক্ত ছিল। সে সফরে আমিও সফরসঙ্গী ছিলাম। সাত আটদিন সেখানে অবস্থান করেছিলাম। দুইজন ছাড়া সেখানকার সকল অধিবাসী হযরতের মুরিদ হয়ে গেল এবং কবরপূজা থেকে তওবা করে পাক্কা নামাযি বনে গেল। তাদের আশপাশের লোকেরা দশ দশ মাইল দূর থেকে এসে তওবা করে যেতে লাগলো। লোকজন হতবাক হচ্ছিলো যে, যে ব্যক্তি সারা জীবন মদে ডুবে ছিল এবং স্বপ্নেও ভাবেনি, এ জিনিস সে ছাড়তে পারবে

–যাদের অবস্থা এই ছিল যে কোন ওয়ায়েজ এলাকায় ঢুকলে হয়তো তাকে এলাকা ছাড়া করতো নয়তো নিজেরা এলাকা ছাড়তো– এই লোকেরা স্বপ্রণোদিত হয়ে তওবা করছে এবং নামাজী হয়ে যাচ্ছে। হতবাক হচ্ছিল, কারণ– এখানে না কোন ওয়াজ মাহফিল চলছিল যে লোকেরা চলে আসবে, না কেউ সুমিষ্ট ভাষায় বয়ান করছিল যে লোকেরা প্রভাবিত হবে, না কেউ ধমক দিচ্ছিলো, না কেউ ডাণ্ডা হাতে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিলো একথা বলে যে, মদ ছাড়ো! নামাজ পড়ো!! (যেমনটি কোন কোন বক্তার ব্যাপারে শোনা গেছে)। মোটকথা– বাহ্যিক কোন কারণ ও উপকরণ ছাড়াই লোকেরা আসছিল এবং তওবা করে যাচ্ছিল। এমন নয় যে, হযরতের কারণে দিন কয়েক তারা প্রভাবিত ছিল বরং আজ কয়েক বছর যাবৎ আমরা তাদের দেখে আসছি এবং তাদের কথা শুনছি– সেই নামাজ তারা জারি রেখেছে, মদ-জুয়ার কথা মনেও আনছে না। লোকসান টানছে তবু সুদ নিচ্ছে না। পরবর্তী বছরও হযরত ওই অঞ্চলে গিয়েছিলেন। দুইজন ছাড়া সেখানের সকলেই তো হযরতের মুরিদ হয়ে গিয়েছিল। এ সফরে আশপাশের বহু গ্রামের মানুষ হযরতের কাছ থেকে ফয়েজ ও বরকত লাভ করলো। আর সেই দুই লোকের একজন এলাকায় ছিলো না, আরেকজন তো ছিল, কিন্তু মদ ও পাপাচারে আকণ্ঠ ডুবে ছিল। লোকটি এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিল। একবার হযরত তাকে ডেকে পাঠালেন- সে সময় মজলিস চলছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সাথী ভাই জনাব শাহ হাফেজ রহমাতুল্লাহ মুযাফফরী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হযরতের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। হযরত কেবলা রহ. নসীহতমূলক কিছু কথা বলতে শুরু করলেন। সাধারণ কথা ছিল কিন্তু মজলিসে কান্নার রোল পড়ে গেল এবং প্রত্যেকের মাঝে আজীব এক কাইফিয়ত পয়দা হলো। যে লোককে হযরত ডেকেছিলেন, স্বেচ্ছায় সে বলে উঠলো, নিন হাত! তওবা করবো। হযরত তার হাত ধরে খানিকটা জোশের সাথে বললেন, বলো, আল্লাহ এক। আল্লাহর নাম তিনি খানিকটা জোর আওয়াজে বললেন। এ শব্দ বলার সাথে সাথে উপস্থিত লোকদের আশ্চর্য এক হালাত শুরু হলো। সকলের মুখ থেকে আল্লাহ আল্লাহ শব্দ উচ্চারিত হতে লাগলো। কেউ কেউ বেহুশ হয়ে গেল, আর কারো কারো চোখ থেকে অনিচ্ছায় অবিরল অশ্রু ঝরতে লাগলো। বিরাট কান্নাকাটির শোর পড়ে গেলো। এ ঘটনার পর কিছু লোক হযরতকে জামালপুর ও বালিয়ায় নিয়ে গেলো- যা এ অঞ্চল থেকে প্রায় আট ক্রোশ দূরে ছিল। সেখানের লোকেরাও মাদকাসক্ত, বেনামাযি ছিলো। সেখানেও অবস্থা এই হলো যে হযরতের দুই দিনের অবস্থানে সমস্ত লোক তওবাকারী হয়ে গেল।

সবচেয়ে বড় কারামত

মাওলানা বলতেন, সবচেয়ে বড় কারামত হলো, সুন্নতের অনুসরণ করা। কাশফ কারামত ইত্যাদি মূলকথা নয়। দেখার বিষয় হলো, ব্যক্তির ভেতরে শরীয়তের পাবন্দি ও সুন্নতের অনুসরণ কোন পর্যায়ের এবং মানুষ তার দ্বারা কতটা উপকৃত হচ্ছে। একবার মাওলানা এই কথাগুলোর ওপর দীর্ঘ আলোকপাত করে বললেন, লোকেরা কাশফ-কারামত দেখে কিন্তু যেটা দেখার বিষয় সেটা দেখে না। দেখার বিষয় দু'টি- ১. শরীয়তের ওপর অটল অবস্থান অর্থাৎ শরীয়তে মুহাম্মদীর পূর্ণ অনুসরণ। ২. সুন্নত ও মুস্তাহাব না ছাড়া এবং হারাম তো দূরের কথা মাকরুহও পরিহার করে চলা। যদি এটা না হয় তবে অদ্ভুত ব্যাপার স্যাপার যেমন, কাউকে বশীভূত করা, কাউকে বেঁহুশ করে ফেলা, ফুঁ ফাঁ দেয়া, কারো রোগ ভালো করে দেয়া ইত্যাদি তো হিন্দু গোশাইরাও করে থাকে। খৃস্টানদের কারো কারো ব্যাপারেও আপনারা এধরনের কথা শুনে থাকবেন কিন্তু কখনো কি শুনেছেন, কোন মুসলমান তাদেরকে পীরে কামেল বা ওলিআল্লাহ বলে? অবশ্যই শোনেননি। সুতরাং (বুযর্গের মাঝে) এ ধরনের ব্যাপার তালাশ করা বোকামি। দ্বিতীয় কথা হলো- কারামত যদি দেখতেই হয় তাহলে দেখতে হবে, তার সংস্পর্শ ও সান্নিধ্যে এসে মুর্দা দিল জিন্দা হয়েছে কিনা। এটি তো স্বয়ং মৃতকে জীবিত করার চেয়ে বড় কারামতী এবং ব্যক্তির কামেল হওয়ার আলামত। আর বাস্তবতা হলো- মাওলানারও সবচেয়ে বড় কারামত এই ইত্তেবায়ে সুন্নত (সুন্নতের অনুসরণ) এবং সংস্কার ও আত্মশুদ্ধি, যার ফায়েজ ও প্রভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ সত্যিকার মানবতার দীপ্তি লাভ করেছে এবং ইয়াকীন ও মারেফাতের দৌলতে পরিপূর্ণ হয়েছে। তাদের মাঝে মরার গুণ ও বাঁচার যোগ্যতা পয়দা হয়েছে। দুনিয়ার হাকীকত তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং তাদের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন পরকালীন চিন্তার সাথে জড়িয়ে গেছে (যা মানুষের সারা জীবনের সাধনার সম্পদ)। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখা হয় তাহলে মাওলানার কর্ম ও জীবন অনন্য বৈশিষ্ট্যে দৃশ্যমান হয়। তার থেকে সাধারণ মুসলমানেরা যত উপকার লাভ করেছে তার ব্যাপ্তি সুবিশাল বলে মনে হয়।

ইনকিলাব ও পরিবর্তন

এই আত্মশুদ্ধি, সংস্কারসাধনা, বাইয়াত ও তওবার সাথে সাথে মাওলানার হস্তক্ষেপে মানুষের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ এবং দীর্ঘ সময় ধরে চলমান বড় বড় সংঘাত যেভাবে নিঃশেষ হয়ে গেছে তাও মাওলানার জীবনের অবিস্মরণীয় এক কীর্তি। এ বিষয়টি তাঁর জীবন ও গুণাবলির মাঝে বিশেষ একটি জায়গা পাওয়ার যোগ্য। মাওলানার স্বল্প ও সাধারণ কথায় প্রভাব ও পরিবর্তনের যে দৃশ্য দেখা

গেছে তা শুধু পূর্ববর্তী ওলি-বুযুর্গদের বেলায় দেখা যায়। স্পষ্ট বোঝা গেছে এটা (তাঁর বয়ানের আসর) কোন মানবীয় শক্তি বা প্রভাবের ফল নয় বরং আল্লাহর তাওফীক বা ইচ্ছার কারিশমা। বরং আল্লাহর ইচ্ছাই হলো- তাঁর থেকে আল্লাহ সৎ ও সত্যের এমন ঢল নামাবেন যা সব সময় বহু অঞ্চলের অগণিত মানুষকে তৃপ্ত ও পল্লবিত করবে।

একবার ভাগলপুরের মুসলমানদের মাঝে একটি বিষয় নিয়ে প্রচণ্ড মতবিরোধ দেখা দিলো। এর সূচনা যদিও গাঁয়ের পঞ্চায়েত থেকে হয়েছিলো, সর্বশেষ এমন আকার ধারণ করলো যে, গ্রামের কী শহরের, সবখানের মুসলমানরা দুইভাগে ভাগ হয়ে গেল এবং মারামারি কাটাকাটির বাজার গরম হয়ে গেলো। এক পর্যায়ে এমন হলো যে, দৈনিক থানায় বিশ পঁচিশটি করে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা পড়তে লাগলো। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও জেলাপ্রশাসক পর্যন্ত সংঘাত নিরসনের খুব চেষ্টা করলেন কিন্তু কোন কাজ হলো না। এই পরিস্থিতির মাঝে মাওলানা ভাগলপুর সফর করলে লোকেরা এটাকে গণিমত মনে করলো। নিজ নিজ উকিলসহ প্রত্যেক গ্রুপের নেতৃবর্গ মাওলানার সাথে সাক্ষাত করে একটি সুরাহা করার আবেদন জানালো। মাওলানা অনুরোধ রাখলেন। পনেরো দিন পর সেখানে হাজার মানুষের সমাগম হলো। মাওলানার সামান্য কিছু কথায় মজলিসের হালাত পাল্টে গেল এবং যে সব লোক একটু আগেও একে অপরের খুনপিয়াসী ছিলো তারা ভাই ভাই হয়ে এমনভাবে কোলাকুলি করতে লাগলো যেন আজকে ঈদের দিন! এতোটা আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে এটা হয়েছিল যে, লোকেরা তা দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। কামালত গ্রন্থের লেখক এই আশ্চর্য ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো–

'শাহ জঙ্গীর ঈদগাহ মাঠে হাজার মানুষের জমায়েত হলো। প্রথমে হাফেজ মাওলানা তাজাম্মুল হুসাইন সাহেব কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে বয়ান করলেন। বয়ানে যদিও রসিকতা ছিল কিন্তু দু'চারটি কথা উপস্থিত লোকদের পছন্দ হলো না। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের কারণে কিছু বলতে পারলো না, নীরব রইলো। মাওলানা যখন দেখলেন, বয়ানে কোন কাজ হয়নি তখন হতাশ ও বিরক্ত হয়ে গাড়িতে উঠে গেলেন। মাগরিবের সময় হয়ে এসেছিল। তিনি অযু করতে নামলেন। মাগরিবের পর মুনাজাত ওযীফায় কিছু সময় অতিবাহিত হলো। সকলে তাঁর অপেক্ষায় ছিল। উভয় গ্রুপের লোকেরা দলীল-দস্তাবেজ ও কাগজপত্র বগলদাবা করে দাঁড়িয়েছিল এবং সাক্ষী প্রমাণ সাথে নিয়ে নিয়েছিলো। এমন সময় আমাদের হযরত মসজিদ থেকে বের হয়ে এলেন। লাঠিতে ভর করে মসনদে দাঁড়ালেন এবং বরকতময় জবানে দু'চার কথা বলতেই উপস্থিত

লোকদের মাঝে আশ্চর্য প্রভাব সৃষ্টি হলো। সবার মাঝে কান্নাকাটির রোল পড়ে গেল। চিৎকার, হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সকলের দিলে যেন জোশ এসে গেল। লোকেরা হুড়মুড়িয়ে হযরতের পায়ের উপর পড়তে লাগলো। ব্যথা পাচ্ছিলো কিন্তু পতঙ্গ যেভাবে আগুনে ঝাঁপ দেয় তারাও সেভাবে যেন আত্মহুতি দিচ্ছিলো। সে কেবল দেখলে বোঝা যায়, এখনো সে দৃশ্য চোখে ভাসে, হৃদয় উদ্বেলিত হয়। সারকথা হলো, আমাদের হযরত হাতের ইশারায় পরস্পরকে মিলে যেতে বললেন। ব্যাস, আর কী চাই! প্রত্যেকে অত্যন্ত জোশ ও জযবার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাতে লাগলো। একে অপরকে মুবারকবাদ দিতে লাগলো। যেন ঈদ হয়ে গেল।

এই ভাগলপুরেই মাযহাবপন্থি ও লা মাযহাবীদের বিরাট দ্বন্দ্ব ছিলো। কোনভাবেই মিটানো যাচ্ছিলো না। উল্লেখযোগ্য অনেক উলামা ও বক্তা চেষ্টা করেছেন কিন্তু বিফল হয়ে ফিরে গেছেন। সর্বশেষ সেখানকার কিছু লোক মাওলানাকে দাওয়াত করলে একরাত একদিনের জন্য তিনি সেখানে অবস্থান করেন। রাতের বেলা কয়েকবার উপস্থিত লোকদের সামনে কিছু কথা বললেন। কথাগুলোর আসর এতো বেশি হলো যে, যারা গতকাল পর্যন্ত বর্শা-বল্লম হাতে নিয়ে প্রস্তুত ছিল সকাল হতে না হতে তারা কেবল তওবাই করলো না, মাওলানার হাতে বাইয়াতও হয়ে গেলো। এমন অনেক লোক যারা পীর মাশায়েখদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতো না এবং নিজস্ব গণ্ডির বাইরে আর কিছু তারা ভাবতে রাজি ছিলো না, তারাও মাওলানার খেদমতে হাজির হয়ে তার মজলিসে বসলো এবং বাইয়াত হয়ে ফিরে গেল।

জনাব মৌলভী সাইয়্যিদ আযীযুর রহমান সাহেব, মুহতারাম চাচাজান মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভীকে রহ. নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করে শোনান, যাতে মাওলানার 'সম্মোহনী শক্তির' ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি বলেন, একবার তার মনে কোন বিষয়ে খুব সন্দেহ দেখা দিলো। তিনি ঘাবড়ে গেলেন। বুঝতে পারছিলেন না, এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী। তিনি তার ভাই আব্দুল হাইকে এই পেরেশানি ও দুশ্চিন্তার কথা জানালেন। তিনি পরামর্শ দিলেন- মাওলানা মুহাম্মদ আলীর নিকট যাও। তার মনে হলো, এমন সন্দেহ-সংশয় মাওলানার দ্বারা কীভাবে দূর হবে? তবু তিনি মাওলানার সাক্ষাতে মুঙ্গের গেলেন। তিনি বলেন, মাওলানা খাটে বসা ছিলেন, তিনি পাশে গিয়ে বসলেন। কিছু সময় মাওলানার পাশে থাকার সৌভাগ্য হলো। মাওলানা দুরূদ শরীফ পড়ার পরামর্শ দিলেন। তিনি তখন যুবক। তার কিছু পুরোনো সহপাঠী মুঙ্গেরে থাকতেন কিন্তু ঘটনাক্রমে সে সময় ছিলোনা। এজন্য সেখানে তার মন

টিকছিলোনা। সে সময় গাড়ী চলছিলো। তিনি সেদিনই ফিরে এলেন তবে সকল সন্দেহ-সংশয়, দুশ্চিন্তা-পেরেশানি একেবারে শেষ হয়ে গেল। এরপর আর কখনো এমন হয়নি।

পুলিশের এক দারোগা– যিনি অবিবেচক, নির্দয় ও আত্মীয়তা ছিন্নকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। একবার তিনি হযরতের খেদমতে হাজির হলেন। হযরতকে দেখে এবং হযরতের কথা শুনে এতোটা প্রভাবিত হলেন যে, সকল মন্দ কাজ থেকে তওবা করে তাঁর হাতে বাইয়াত হয়ে গেলেন। এরপর তার অবস্থা এমন হলো যে, যে চোখ অশ্রুর ব্যাপারে নিরাসক্ত হয়ে গিয়েছিলো তা কথায় কথায় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠতো। হজ্বের ব্যাপারে তার এমন আগ্রহ সৃষ্টি হলো যে, হজ্বের কথা শুনলে অস্থির হয়ে কাঁদতে শুরু করতেন। একবার হজ্ব করেছিলেন কিন্তু সাঙ্গ করা হয়নি। আবার হজ্বে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এই বিপুল আশা ও অসক্তির মাঝে মাওলানাকে যে চিঠি লিখে তিনি তার অবস্থা জানিয়ে ছিলেন নিম্নে তা উল্লিখিত হলো– 'হারামাইন শরীফের আলোচনা শুনলেই চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু আল্লাহর শোকর! আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করি। চোখের উপর আমার ক্ষমতা নেই যা হয় অনিচ্ছায়। যদি ক্ষমতা থাকতো তবে তাও আমি নিয়ন্ত্রণ করতাম। হযরতের একটি কবিতা পংক্তি এখন মনে পড়ছে। তার দয়ায় এবং হিম্মতে যদি এমন হতে পারি তবে আমার খোশ নসিব।

زردئ رخ رونا ہر دم کا دو ہیں شاہد خوب ہمارے

چاہت کا اقرار کیا ہے کیونکر اب انکار کریں

'কখনো এমন হয়, সৌভাগ্যবানেরা বিশেষ সময়ে বিশেষ অবস্থায় আহলে দিল বুযুর্গের কাছে মহব্বতের দরখাস্ত করেন কিংবা কোন ইচ্ছা প্রকাশ করেন আল্লাহর হুকুমে সে সময়ই তার দিলের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এ অবস্থায সব সময় বিদ্যমান থাকে।'

লাহোরের বাসিন্দা মুহাম্মদ ফযলুদ্দীন মিস্ত্রির জামালপুরে (মুঙ্গের থেকে পাঁচ মাইল দূরে) বড় এক ঠিকাদারি ছিল। মাওলানার খানকায় তার যাতায়াত ছিল। ১৯০১ সালে মাওলানা যখন বাড়ি বানাচ্ছিলেন সে সময় তিনি অনেক সহযোগিতা করেছেন। বাড়ি বানানোর কাজ শেষ হওয়ার পর মাওলানা তাকে বিনিময় নিতে বললে তিনি স্পষ্ট অস্বীকৃতি জানান এবং নিজের একটি বিশেষ তামান্নার কথা বলেন। কামালাতে মুহাম্মদিয়ার বাড়তি সংযোজনে এ ঘটনার

বিস্তারিত বিবরণে লেখক লিখেছেন- 'ফযলুদ্দীন মিস্ত্রি' বলেন– আমি হাত জোড় করে বললাম, আমি এ জন্য ঘর বানাইনি যে আপনার কাছ থেকে পারিশ্রমিক নেবো। আমি একজন বড় ঠিকাদার। এ বাড়ি বানানোর খরচ আমার কাছে তেমন কিছু নয়। মাওলানা জিজ্ঞাসা করলেন, তবে তুমি কী উদ্দেশ্যে বানিয়েছো? মিস্ত্রি সাহেব বললেন, আপনি যদি ওয়াদা দেন তবে বলতে পারি। তিনি বললেন, 'আমার ওপর তোমার ইহসান আছে। বিষয়টি যদি আমার সাধ্যের মধ্যে হয় তবে আমি ওয়াদা করছি। বলো কী কথা?'। ফযলুদ্দীন মিস্ত্রি বললেন, আমি বহু বুযুর্গের সান্নিধ্য লাভ করেছি, ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে সফর করেছি। সেই যৌবনকাল থেকে একটি মাত্র তামান্না আমার- আমার কলব যেন জারি হয়ে যায়। এই উদ্দেশ্যেই আমি আপনার বাড়ি বানিয়েছি।

মিস্ত্রি সাহেব নিজে আমাকে বলেছেন- হযরতের জোশ এসে গেলো, তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমার কাছে এসে বললেন, জামা উঠাও। আমি জামা সরিয়ে বক্ষ উন্মুক্ত করলাম। তিনি শাহাদাত আঙ্গুলী দ্বারা আমার বুকের উপর টোকা মেরে বললেন, মিয়াঁ! কলব এভাবে জারি হয়। মাওলানার সফলতার সবচেয়ে বড় রহস্য এটা ছিল যে, তাঁর ওয়াজ নসীহতসহ সকল কথা আসলে দিলের আওয়াজ ছিল। আর আল্লাহর সাথে এই দিলের গভীর সম্পর্ক ছিল। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এবং তাঁর দরদ ও ইখলাসের কারণে তাঁর কথার মাঝে এমন প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিলো, যে প্রভাব থাকে পরশ পাথরের মাঝে। একারণেই যেখানে বিশাল বিশাল বক্তৃতা, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও বিতর্ক ব্যর্থ হয়ে যেতো সেখানে মাওলানার সাধাসিধা কয়টা কথা বিপুল প্রভাব সৃষ্টি করতো এবং মাহফিলের অবস্থা পাল্টে ফেলতো।

মুরিদানের ভক্তি ও ভালোবাসা

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আলোকোজ্জ্বলরূপে দৃশ্যমান হয় এবং কোন জীবনী লেখকের পক্ষে যে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তা হলো, হযরতের প্রতি ভক্তদের অনুরাগ ও ভালোবাসা। মাওলানার মাঝে এমন অশ্চর্য এক আকর্ষণ ছিল যে আমরা তো আমরা- অপরিচিত লোকেরাও তাকে দেখে তাঁর প্রতি মহব্বত ও টান অনুভব করতো। এই যে মানুষের সমাগম, তাঁর প্রতি মানুষের ভক্তি ও মহব্বত তার পেছনে মাওলানার এই সম্মোহনী গুণেরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ গুণের কারণেই মাওলানার আত্মশুদ্ধি ও সংস্কারের পরিমণ্ডল সীমাহীন ব্যাপ্ত হয়েছে। পাটনার প্রসিদ্ধ হাকিম ও বিদগ্ধ আলেম মরহুম মাওলানা আব্দুল বারী সাহেব মাওলানার কাছে বাইয়াতের দরখাস্ত করলেন। মাওলানা সাহেব বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চাইলেন। হাকিম সাহেব দশ বারোদিন পর্যন্ত বারবার দরখাস্ত করছিলেন।

আর মাওলানা বিভিন্ন পন্থায় পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। শেষমেষ হাকিম সাহেব বললেন, 'হযরত! আমি সবকিছু আপনার এখানে পাই। আর কোথাও আমার দিল প্রশান্ত হয়না। দয়া করে আপনি আমাকে মুরিদ করে নিন'। এ কথার পর মাওলানা তাকে মুরিদ করলেন। তারপর তার হালাত এমন হলো যে, অসুস্থ অবস্থায় বারবার বলতেন, হায়! আমার মৃত্যু যদি মাওলানার সামনে হতো!। তারপর তিনি লোক পাঠিয়ে মাওলানার কাছে এ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। দশ দিনের মধ্যে হাকিম সাহেবের কাছ থেকে এ ব্যাপারে সতেরোটি টেলিগ্রাম মাওলানার কাছে পৌঁছলো। অবস্থা দেখে মাওলানা সাহেব কারী নূর মুহাম্মদ সাহেবকে সাথে নিয়ে তার কাছে পৌঁছলে পরে তিনি শান্ত হলেন। মাওলানা সাহেবের প্রতি হাকিম সাহেবের মহব্বত এতো বেশি ছিল যে, ঘুমের ভেতর হঠাৎ চোখ মেলে বলতেন- দেখো হযরত এসেছেন! খাদেমরা বলতো, এখন রাত, তিনি কী করে আসবেন? একথা শুনে তিনি চুপ হয়ে যেতেন। খানিক বাদে আবারো ঘুম থেকে জেগে এটা বলতেন। কামালাতে মুহাম্মদিয়ার লেখক মুহাম্মদ আলী হাসান সাহেব একবার খুব অসুস্থ ছিলেন। এ অসুস্থতা তো ছিল, সাথে দাস্ত এতো বেড়ে গিয়েছিলো যে, তিনি প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। এ অবস্থায় তিনি খবর পেলেন যে, এখান থেকে চার মাইল দূরে একটি জায়গায় মাওলানা সাহেব আসছেন। তিনি অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন এবং এমন অসুস্থতা উপেক্ষা করে কোন না কোনভাবে তিনি সেখানে পৌঁছে মাওলানার সাথে সাক্ষাত করলেন। মাওলানা রহ. এর আগমনের খবর যখন তিনি পেয়েছিলেন তখন তার শুশ্রুষার জন্য তার পাশে কয়েকজন লোক ছিল। তিনি তাদেরকে অনুনয় করতে লাগলেন, পালকি ডেকে আনো। তার দুর্বলতা ও অসুস্থতার কথা ভেবে তারা পালকি ডাকতে উঠছিলো না। শেষে নিরুপায় হয়ে তিনি কাঁদতে লাগলেন। অবস্থা দেখে লোকেরা পালকি ডাকা উচিত বলে মনে করলো। তিনি মাওলানার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। কামালাতে মুহাম্মদিয়ায় উল্লেখ আছে, 'পালকি যত সামনে এগুচ্ছিলো তিনি তত সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। এমন কি পালকি কোন্দ (যে অঞ্চলে মাওলানা এসেছিলেন) পৌঁছলে তিনি কারো সাহায্য ছাড়া নিজে নিজেই পালকি থেকে নেমে পড়লেন। কোন্দের কাছে মহুনি নামে একটি এলাকা ছিল। সেখানকার ভক্তদের বারবার আবেদনে মাওলানা দু'চার ঘণ্টার জন্য সেখানেও গেলেন। এর আগে তিনি সেখানে কখনো যাননি। যাওয়ার পথে কিছু ভক্ত অতি আবেগে পালকির সাথে দৌড়াতে লাগলো। মাওলানা তার অভ্যাসের বিপরীতে এক জায়গায় পালকি থামাতে বললেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কি কোন বুযুর্গের মাজার আছে? তারা

বললো, এখান থেকে কয়েক কদম দূরে শাহ্ শিহাবুদ্দিন গুজরাটির মাজার, যিনি সাধারণদের মাঝে শিহাব শহিদ রহ. নামে পরিচিত। মাওলানা কিছুক্ষণ ফাতেহা পাঠ করে ইশারায় পালকিওয়ালাকে আগে বাড়তে বললেন। কামালাতের মুসান্নিফ লেখেন– ওই গ্রামের অগণিত লোক হযরতের কাছে বাইয়াত লাভে ধন্য হলো। বাচ্চারা তাঁর আগমনে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করছিলো।

এক শহরে কিছু যুবক মানুষ, যাদের গান বাজনা ছাড়া আর কোনো কাজ ছিলো না এবং শরাব পানে অভ্যস্ত ছিল। সেখানে মাওলানা যখন গেলেন এবং বাইয়াত প্রার্থীদের ভিড় জমলো তখন বাইয়াতের উদ্দেশ্যে তারাও এলো। মাওলানা তাদের এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তখন অন্যের মাধ্যমে সুপারিশ করতে লাগলো। কয়েকদিন পর্যন্ত তারা এরকম করছিলো। 'মাকামাতে মুহাম্মদীয়ার' লেখক লিখেছেন– 'তারা এলো, আর তিনি নসীহতমূলক কথা বলতে লাগলেন। তাদের মাঝে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেলো। তারা অনেক্ষণ ধরে কাঁদলো। এরপর মাওলানা বললেন, এসো, এখন আর বাধা নেই। তাদেরকে মুরিদ করলেন। সকলে জানে, এ ঘটনার পর তারা আর অন্যায়ের ধারে কাছেও যায়নি। নামাজ, রোযা, দুরূদ, ওযীফার অত্যন্ত পাবন্দি হয়ে যায়। লোকেরা তাদের পরিবর্তন দেখে হতবাক হয়ে যেতো। আল্লাহওয়ালাদের মহব্বতে এমন অনেক কিছুই হয়। কিন্তু তাঁর বড় কারামতি ছিল এই যে, তাঁর সোহবতে এলে মুর্দা দিল জিন্দা হয়ে যেতো। এই সফরে বাইয়াত প্রার্থীদের প্রচণ্ড ভিড় ছিল। বিশ পঁচিশ মাইল দূরের লোক এসেও বাইয়াত হচ্ছিলো। এদের মধ্যে পুরুষও ছিল, মহিলাও ছিল।'

করিম বক্‌স নামে মুঙ্গেরের এক গোত্র প্রধান, যিনি ছিলেন বিত্ত বৈভবের পাগল ও সকল প্রকার পাপ ও পাপাচারের সাথে প্রকাশ্যভাবে জড়িত। তিনি এ পরিমাণ মাদকে অভ্যস্ত ছিলেন যে, তাঁর পক্ষে সব কিছু ছাড়া সহজ ছিল কিন্তু ওটা ছাড়া সম্ভব ছিলো না। মাওলানার সোহবতের বরকতে তার জীবনেও বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। তার এই পরিবর্তনের পেছনে বিশেষ একটি ঘটনা আছে– 'নিত্যকার মতো শরাবের আসর জমে উঠেছিলো। করিম বক্‌স মদের পেয়ালা হাতে নিয়ে দেখে মাওলানা আসছেন। এটা দেখে তার হাত থেকে মদের গ্লাস পড়ে গেল। আসর ছেড়ে তিনি দ্রুত ঘরে চলে এলেন। ঘণ্টাখানেক বাদে খাওয়া দাওয়া শেষ হলে তার স্ত্রী তার সামনে মদের পেয়ালা এগিয়ে দিলেন। তার নিয়ত আবার পরিবর্তন হয়ে গেল। কিন্তু শরাব হাতে নেয়ার আগ মুহূর্তে তার মনে হতে লাগলেন, মাওলানা যেন সামনে বাড়ির আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি কাঁপতে কাঁপতে বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরলে বিষয়টি তিনি বুঝতে পারলেন। রাত গভীর হয়ে গিয়েছিলো তদুপরি তিনি সেই সময়ই গোসল করে নিলেন এবং

কাপড় পাল্টে মাওলানার খেদমতে হাজির হলেন। বাকি রাত তিনি মসজিদে কাটালেন এবং সকালবেলা মাওলানার সাথে সাক্ষাত করে বাইয়াত হয়ে গেলেন।

মাওলানার দ্বিতীয় হজ্বের সফর

প্রথম হজ্ব সফরের মতো দ্বিতীয় সফরেও মাওলানার কাছে কোন পাথেয় বা রাহাখরচ ছিলো না। সফরের কথাও তিনি কাউকে জানাননি। সফরে কষ্ট-ক্লান্তির ব্যাপার ছিল কিন্তু সবকিছুই খুব সহজ স্বাভাবিকভাবে হয়ে যাচ্ছিলো। পরিপূর্ণ স্বস্তি ও শান্তি ছিল। তাঁর এক দীনদার বন্ধু-ইবরাহীম খাঁকে তিনি মক্কা মুয়াজ্জমায় বসে এক চিঠিতে লেখেন- 'এখন মদীনা মুনাওয়ারা যেতে ইচ্ছা হচ্ছে, বাকি মালিকের ইচ্ছা। যতক্ষণ ইচ্ছা এখানে রাখবেন, যখন চান সেখানে নিয়ে যাবেন। এটাও তাঁর কুদরত যে, আমার মতো বুযদিল কমজোরকে এখানে আরামে এনেছেন এবং আরামে রেখেছেন। যেমন খরচ হয়েছে এবং হচ্ছে তা কেবল আমীর উমরাদেরই হয়ে থাকে।' এসময় খলীফা ও মুরিদদের কাছে যে সকল চিঠিপত্র তিনি পাঠিয়েছিলেন তার প্রতিটিতে আত্ম বিলুপ্তি ও ফানাইয়্যাত এবং শোকর ও উবুদিয়্যাতের প্রকাশ রয়েছে। চিঠি পড়লে মনে হয় যে, আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ব এবং নিজের নীচুতা ও অক্ষমতাবোধ তার মাঝে সারাক্ষণ বিরাজমান ছিল এবং ক্ষণিকের জন্যও এই সত্য তার উপলব্ধি থেকে হারিয়ে যায়নি।

এই সফর ১৩২৪ হিজরীর ২৮ রমজান শুরু হয়েছিলো। শেষ হয়েছিলো ১৩২৬ হিজরীতে। তবে এই দুই বছরের ব্যাপারে খুব কমই জানা যায়। এতোটুকু অবশ্য জানা যায়, মাওলানার বরকত সেখানেও জারি ছিল এবং অনেক উলামা বাইয়াত লাভে ধন্য হয়েছেন। এখানে শায়খ মুহাম্মদ জাফর মুতাওয়াফ এবং শায়খ আবু বকর হাম্মাদ মক্কী মুদাররিস রহ.–এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুমবাসার জনৈক আলেম হাজী ইবরাহীমও এখানে মুরিদ হন এবং খেলাফত লাভে ধন্য হন। আফ্রিকা গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুরু করেন। তার দাওয়াতে হাজার হাজার অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে। এ ওই বুযুর্গ ব্যক্তি মাওলানার আগমনের পূর্বে মদীনায় থাকতেন এবং মসজিদে নববীতে বসে প্রতিদিন দুরূদ ও সালামে পার করতেন, যেন তিনি একজন মুরশিদ (পথপ্রদর্শক) পেয়ে যান। একদিন স্বপ্নে হুজুর সা.–এর সাক্ষাত লাভ করলেন। তিনি স্বপ্নে আদেশ করলেন, এ বছর আমার পুত্র হজ্বে আসছে, তুমি তার মুরিদ হয়ে যাও। মাওলানার আগমনের সংবাদ তিনি ১৩০৫ হিজরীতে পেয়েছিলেন। তার মন স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাওলানার প্রতি আকৃষ্ট হলো। তিনি মাওলানার হাতে বাইয়াত হলেন। এরপর তার প্রতি তার ভক্তি ও ভালোবাসা এমন হলো যে,

একদিন মাওলানাকে তিনি দাওয়াত করলেন এবং নিজের পরিধেয় সব বস্ত্র রাস্তায় বিছিয়ে দিলেন, যেন মাওলানা তার উপর পা রেখে আসেন। মক্কায় অবস্থানকালে মাওলানা তার তরবিয়ত করে যাচ্ছিলেন। অবশেষে তাকে খেলাফত প্রদান করেন। তার কাছে একটি রেজিস্ট্রার খাতা ছিল যাতে (তার হাতে মুসলমান হয়েছে এমন) সাতশো নও মুসলিমের নাম লেখা ছিল। মাওলানার মুরিদ শায়খ আবু বকর হাম্মাদ মক্কী মাওলানাকে চিঠির সাথে চা ও একসেট চায়ের কাপ পাঠালেন। জবাবে মাওলানা আরবিতে চিঠি লিখে তাঁকে ইজাযত ও খেলাফত দান করেন। নিম্নে চিঠির ভাষ্য উল্লেখ করা হলো–

فعليكم أن تجتهدوا في إحياء سنن من شرفتم بجواره، وافتخرتم بفخاره. فيا لها من فخار. وعليكم بغاية السعي في إحياء شريعته الغراء، وطريقته الفيحاء بإخلاص النية و حسن الطوية، وعليكم أخذ البيعة عني خلافة لمن يريد أن يدخل في سلك أحبائي وطريقة مشائخي الكرام.

'যার পড়শী হওয়ার সম্মান তোমরা লাভ করেছো এবং যার গর্বে তোমরা গর্বিত হয়েছো –আর কতই না গর্বের তিনি!– তাঁর সুন্নত জিন্দা করা তোমাদের কর্তব্য। নমনীয় আচরণ ও বিশুদ্ধ নিয়তের মাধ্যমে তাঁর সুবাসিত পথ ও সুদীপ্ত শরীয়তকে পুরুজ্জীবিত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। আমার প্রিয় বন্ধু ও শ্রদ্ধেয় শাইখদের পথ ও পন্থা যারা অনুসরণ করতে চায় আমার খলীফা হিসাবে তোমরা তাদেরকে বাইয়াত করো।'

হজ্ব থেকে ফেরার পর পার্থিব জিনিস থেকে তাঁর মন উঠে গেল এবং নির্জনপ্রিয়তা বেড়ে গেল। এর সাথে সাথে কিতাব মুতালায়ার প্রতি তাঁর আগ্রহও বেড়ে গেল। এতদসত্ত্বেও সংস্কার, আত্মশুদ্ধি এবং পথপ্রদর্শন ও মানব বিনির্মানের কাজ পুরো দমে চলছিল। হিদায়াতের এই স্বচ্ছ ঝরণা থেকে কত পিপাসার্ত তার পিপাসা নিবারণ করেছে এবং কত পথহারা মুসাফির পথের দিশা পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। মাওলানার আত্মশুদ্ধি ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম এবং আলোকিত পথ প্রদর্শন শুধু বিহার বা অখণ্ড ভারতের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। হিন্দুস্তানের বাইরে তাঁর খরীফা মুরিদদের মাধ্যমে এবং যে তিন বছর তিনি হিজাযে ছিলেন সে সময়ে এ আলোক মশাল বহু ঠাণ্ডা হৃদয়কে উত্তপ্ত করে তুলেছে এবং বহু সত্য পথযাত্রী তাঁর থেকে ইমানের উত্তাপ ও বিশ্বাসের শক্তি লাভ করেছে। এটা সত্য যে, তার মারকায বিহারেই ছিল। বিহারের মধ্যে মুঙ্গের, ভাগলপুর, দরভাঙ্গা ও আযীমাবাদের বিরাটসংখ্যক মুরিদদের কথা বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বাংলাদেশ থেকেও বাইয়াতের জন্য সর্বদা লোকদের আসা যাওয়া ছিল। মাওলানার প্রথম হজ্ব সফরের পর- যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে- বাইয়াতের জন্য মানুষের আগমনের ধারা কায়েম হয়ে গেল। আগমনকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক উলামায়ে কেরাম ছিলেন। হায়দারাবাদ, ভূপাল, দিল্লিরও অনেক লোক বাইয়াত হয়েছে। হিন্দুস্তানের বাইরে হিযায ছাড়াও জনযেবার, মুমবাসা, কাবুল, গজনী, খুরাসান, রাশিয়া, চীনের অনেক আলেম-তালেব হযরতের খেদমতে হাজির হয়ে অভূতপূর্ব কল্যাণ ও এই সৌভাগ্য সম্পদ নিয়ে ফিরে গেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সারাজীবন হিন্দুস্তানে কাটিয়েছেন এবং এখানেই সমাধিস্থ হয়েছেন।

চীনের এক বিশিষ্ট আলেমের বাইয়াত ও ইরাদা

সেই অমুসলিম দেশের মধ্যে মাওলানা নুরুল হক নামে চীনের একজন নামকরা আলেমের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চীনের নেতৃস্থানীয় এই আলেম হজ্বের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন কিন্তু অদৃশ্যের কোন ইশারা তাকে টেনে হিন্দুস্তান নিয়ে এলো। মাওলানা হিন্দুস্তান এসে হিন্দুস্তানেই জীবন কাটিয়ে দেন। মাওলানার সাথে তাঁর মুলাকাত কানপুরে হয়েছিলো। তাঁর সম্পর্কে মাওলানা রহ. বলেছেন, 'কখনো দুই মিনিটও তাকে নষ্ট করতে দেখা যেতো না। তাকে দেখে মনে হতো, আমাদের আকাবিরদের আমল আখলাক ও আদব অভ্যাস বুঝি এমনই ছিল। 'কামালাতে মুহাম্মদীয়ার' লেখক এ ব্যাপারে লেখেন- 'তিনি চীনের অধিবাসী ও সেখানকার মশহুর ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম ছিলেন। তাঁর দ্বারা চীনদেশে দীনের বহু কাজ হয়েছে। দুই হাজারের মতো ছাত্র তার কাছে আরবি ভাষার জ্ঞান লাভ করেছে। এদের অনেকেই আলেম হয়েছে। কোন এক সময় তাঁর পূর্ব পুরুষ চীনের (ফাগুর) উযীর ছিলেন। তিনি হজ্বের উদ্দেশ্যে এলাকা ছাড়লেন, লেখক মানুষ ছিলেন, তার অনেক বইও ছাপা হয়েছিল।

এ সময় হযরত রহ. কানপুরে অবস্থান করছিলেন। তিনিও সেখানে যান। 'দুলারী' মসজিদে হযরতের সান্নিধ্যে থাকেন এবং নকশবন্দিয়া সিলসিলায় মুরিদ হয়ে দীক্ষা লাভ করেন। এক বছর পর্যন্ত এমন কঠোর সাধনা করেন, যা দেখে লোকেরা হতবাক হয়ে গিয়েছিল। হযরত রহ. বলতেন, কোন সময় আমি তাকে কারো সঙ্গে দু'মিনিট অনর্থক কথা বলতে কিংবা অনর্থক কাজ করতে দেখিনি। এশার নামাজ আদায় করে তিনি শুয়ে যেতেন এবং ঠিক বারটায় উঠে তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য ওযীফা আদায় করতেন। ইশরাকের নামাজ পর্যন্ত যিকরে মশগুল থাকতেন। চাশতের নামাজ আদায় করে সঙ্গে সঙ্গে দরসদানে বসে যেতেন। চীনের দু'জন ছাত্রকে পড়াতেন। দরসদান শেষে 'শরহে বেকায়া' এর টীকা

লিখতেন। চীন দেশের উলামায়ে কেরাম এটাকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য পাঠ্য কিতাব মনে করতেন। এজন্য তিনি তা ছাপাতে চেয়েছিলেন। তাঁর লেখা তাসাউফ বিষয়ক কিতাব 'শরহুল লাতায়েফ' আমি হযরতের কুতুবখানায় দেখেছি। হযরত রহ. তার সম্বন্ধে বলতেন, তিনি হচ্ছেন 'আকাবিরের স্মারক'। তাকে দেখে আমাদের বুযুর্গানে দীনের কথা স্মরণ হতো। তিনি তার জীবনে এত বেশি কাজ করে গেছেন যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তিনি কানপুরেই ইন্তেকাল করেন। নতুন কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। [কামালাতে মুহাম্মাদিয়া : ৯৬]

দুনিয়াবিমুখতা ও রাজকীয়তা

হযরতের ভক্ত ও মুরীদদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, খাবারের দস্তরখানে অনেক সময় কয়েকশ মেহমান একত্র হয়ে যেতেন। মুরীদদের জন্য যথেষ্টসংখ্যক পৃথক পৃথক কামরা ছিল। সাক্ষাত প্রার্থীদের জন্য মেহমানখানা ছিল। লোকেরা এখানে এসে বেশকিছু দিন অবস্থান করে দীক্ষা নিয়ে ফিরে যেত।

হযরত মাওলানা মানাজির আহসান গীলানী রহ. এর নিজ চোখে দেখা বিবরণ শুনুন–

'আমি অধম সরাসরি মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ. এর নিকট শুনেছি, 'তার পীর ও মুরশিদ হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ. একদা তাকে বিদায় দেওয়ার সময় একমুষ্টি ছোলা তার কোলে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এই নাও, আমি তোমাকে দুনিয়া দিচ্ছি।' তিনি তো তাকে একমুঠ ছোলাই দিয়েছিলেন, কিন্তু দেখা গেল, তিনি দীনী ক্ষেত্রে যেমন তারাক্কী লাভ করেন, তেমনি দুনিয়াবী ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সচ্ছলতা অর্জন করেন। বড় বড় নবাব আমীরদের কাছে তাঁর জীবনযাত্রা ছিল খুবই ঈর্ষণীয়। আমি নিজ চোখে দেখেছি, 'খানকাহ রাহমানিয়া'য় কেবল চায়ের জন্য দৈনিক যে পরিমাণ চিনি ব্যয় হতো সেটা আধা মনের কম হবে না। একটা বাগানের পয়সা দিয়ে বাসা, মসজিদ ও খানকাহর যাবতীয় ব্যয় গায়বী ব্যবস্থাপনায় নির্বাহ হতো।

ইতোপূর্বে হযরতের কতিপয় সফর ও ভক্তদের ভিড়ের যে বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে সেটা কোন আকস্মিক বিষয় ছিল না। বরং তার অধিকাংশ সফরের অবস্থাই এমন ছিল। প্রতিটা স্টেশনে বহুসংখ্যক লোক সাক্ষাত ও দুআ নেয়ার জন্য উপস্থিত হতো। অথচ অনেক সময় তাঁর আগমনের সংবাদ প্রচারও করা হতো না। কোন কোন সময় মেজবানকে হাজারো মানুষের মেহমানদারী করতে হতো। বার্ধক্য ও অসুস্থতাকালে পালকিতে চড়ে সফর করতেন। সামান্য দূরত্বে

অনেক সময় পালকি বাহক পাওয়া যেত না। তখন উলামায়ে কেরাম ও উচ্চশ্রেণির লোকেরা হযরতের পালকি নিজেদের কাঁধে বহন করে নিতেন। এটাকে তারা নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করতেন।

কোথাও অবস্থান করলে হযরতের নিয়ম ছিল, যোহরের নামাজের পরে সাধারণ মজলিস হতো। প্রায় সময় ৫০/৬০ জন ভক্ত এ মজলিসে উপস্থিত থাকত। কোন কোন সময় এ সংখ্যা আরও বেড়ে যেত। তাহাজ্জুদের সময় তিনটায় উঠে যেতেন। এ সময় প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী খুসুসী মজলিস হতো।

'কামালাতে রাহমানী' গ্রন্থকার হযরতের মজলিস সম্বন্ধে লিখেছেন, 'হযরত রহ. তাঁর পরিবার-পরিজন এবং খানকাহর হাজারও ভক্ত মুরিদান নিয়ে কেবল আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতেন। শাহী খাবার পরিবেশন করা হতো। নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি এসে দেখলেন যে, সন্ধ্যাবেলায় অনেক হারিকেনে তেল ভরা হচ্ছে। তখন তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, আল্লাহই জানেন, হযরতের এখানে কত কামরা আছে! হযরতের জীবনযাত্রা, বাড়ি-ঘর এবং বহুসংখ্যক কর্মচারী দেখে লোকদের হিংসা হতো। বাড়ি-ঘর ও খানকাহর সুরম্য প্রাসাদ দেখে লোকেরা হতবাক হয়ে যেত। অসংখ্য মেহমান আসতেন। অনেকে এক সপ্তাহ এক মাস পর্যন্তও অবস্থান করতেন।

চার লাখ মুরিদ

মাওলানা তাজাম্মুল হুসাইন বিহারী (খলীফা হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী রহ. ও 'কামালাতে রাহমানী'র লেখক) হযরতের আলোচনা প্রসঙ্গে তার মুরীদের সংখ্যা চার লাখ বলেছেন। তিনি লিখেছেন, 'মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী রহ.-কে বুযর্গ ও দরবেশ হিসেবে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ. ছাড়া অন্য কেউ এত বেশি পরিচয় করিয়ে দেননি। ভারত, আফ্রিকা, আরবসহ বিভিন্ন স্থানে তাঁর মুরীদের সংখ্যা প্রায় চার লাখ হবে। [কামালাতে রাহমানী, পৃষ্ঠা : ৫২]

মুরীদদের সংখ্যা নিরুপণে তাঁর এ অনুমান অতিরঞ্জন কিংবা অগাধ ভক্তি ও ভালোবাসার ফল ধরে নিলেও এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, হযরতের মুরীদদের সংখ্যা অনেক বিস্তৃত ছিল যা 'হাজার হাজার' ছাড়িয়ে যাবে।

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রহ.ও হযরতকে চার সিলসিলায় বাইআত গ্রহণের এজাযত দিয়েছিলেন। একটা তাসবীহ, একটা চাদর, একটা টুপি তাকে হাদিয়া করেন। 'যিয়াউল কুলূব' গ্রন্থে হযরত হাজী সাহেব অনুমতি দানের বিষয়টি নিজ হাতে লিখে দেন।

তারবিয়ত ও তারবিয়াতের উসূল

তারবিয়াতের ক্ষেত্রে হযরত রহ. যে বিষয়টি সবচে' বেশি গুরুত্ব দিতেন তা হচ্ছে 'মহব্বত ও আনুগত্য'। অর্থাৎ একদিকে মুসলমানের হৃদয়ে জ্বলন ও দহন-যন্ত্রণা থাকবে, আল্লাহ পাকের ইশক ও ভালোবাসা বিদ্যমান থাকবে। অপরদিকে রাহে সুন্নাত ও শরীয়তের বিধি-নিষেধ পালনে বিন্দুপরিমাণও বিচ্যুতি হবে না। উভয়দিকের সীমা ও পরিসীমা পূর্ণরূপে মেনে চলবে।

ضبط محبت شرط محبت অর্থাৎ 'ভালোবাসা নিয়ন্ত্রণ করা ভালোবাসার জন্য শর্ত' এটা ছিল তাঁর জীবনের নমুনা।

অপরদিকে তিনি সকল ভক্ত ও মুরীদের ইসলাহ ও তারবিয়াতের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতাও বজায় রাখতেন। সবাই মনে করত যে, হযরত সবচে' বেশি আমার প্রতি স্নেহ ও মমতা রাখেন। হযরতের খলীফা ও ভক্তবৃন্দের লেখনি ও চিঠিপত্রে এ বিষয়টি অধিক পরিমাণে ফুটে উঠেছে। হযরতের স্বভাব-চরিত্রে উদারতা ও দূরদর্শিতা বদ্ধমূল ছিল। এ জন্য কোন সময় কারো প্রতি কঠোরতা করতেন না। তিনি সকল ভক্ত ও মুরীদের খবর রাখতেন। অনেক সময় তারবিয়াতের পাশাপাশি প্রয়োজন হলে আর্থিকভাবে সহযোগিতাও করতেন। কিন্তু তিনি নিজে তাদের কারো কাছ থেকে খেদমত ও সাহায্য সহযোগিতা কোন সময় নিতেন না।

বেশি প্রয়োজন হলে কোন ঘনিষ্ঠজন হতে করজ গ্রহণ করতেন। প্রথমবার হজ্ব শেষে দেশে ফিরে আসার জন্য হযরতের কাছে কোন পয়সা ছিল না। তখন একব্যক্তি হযরতকে কিছু পয়সা দিতে চাইলে তিনি এটাকে করজ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তা দ্রুত আদায় করে দেন। কাউকে কোন সময় অন্যায় ও অপরাধের কারণে এমনভাবে সতর্ক করতেন না, যাতে তার মন ভেঙ্গে যায় এবং অন্যান্য লোকও বিষয়টি জেনে যায়।

'কারামাতে মুহাম্মাদিয়া'র গ্রন্থকার মাওলানা আবদুল আযীয রহ. লিখেছেন–

'একদা হযরত মুযাফফরপুর অবস্থানকালে রেলযোগে নিজ বাড়ি মুঙ্গেরে আসছিলাম। সাহেবপুরে এসে আমি যে কামরায় ছিলাম, সে সময় এক পর্দাহীন নারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এতে প্রবেশ করে। সে সামনে এসে এমনভাবে বসল যে, সতর্কতা সত্ত্বেও তার থেকে দৃষ্টি সংযত রাখা সম্ভব ছিল না। মানবপ্রকৃতির চাহিদা অনুসারে অন্তরে খারাপ কল্পনা চলে আসে। যখন হযরতের দরবারে উপস্থিত হলাম, তখন আম মজলিস চলছিল। কিছুক্ষণ পর হযরত বললেন,

একদা আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান রা. এর মজলিসে একলোক গায়রে মাহরাম নারীর প্রতি কুদৃষ্টি করে উপস্থিত হয়েছিল। তিনি তাকে দেখে চেহারা কুঞ্চিত করে নিলেন এবং বললেন, আমার কাছে এমন লোকও আসে যাদের চোখ থেকে যিনার পানি প্রবাহিত হয়। যাকে উদ্দেশ্য করে তিনি এ কথা বলেছিলেন সে লোকটি দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল, আমীরুল মু'মিনীন! এ মুহূর্তে আপনি যে কথা বলছেন, এটা কি আল্লাহর পক্ষ হতে ইলহামকৃত? তিনি বললেন, আমার প্রতি কোন ইলহাম হয়নি, এটা মু'মিনের অন্তরদৃষ্টি। এরপর তিনি এ হাদীস পাঠ করেন–

اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ.

'তোমরা মু'মিনের অন্তরদৃষ্টি থেকে সতর্ক থাকো, কেননা সে আল্লাহ্ প্রদত্ত নূর দ্বারা অবলোকন করে।'

এ ঘটনা উল্লেখ করে হযরত বললেন, গায়রে মাহরামের প্রতি কুদৃষ্টির ফলে গোনাহ্ ব্যতীত আর কী ফায়দা আছে? আমি অধম সংকলক চিন্তা করে দেখলাম যে, হযরত আমাকে লক্ষ্য করেই এসব কথা বলেছেন।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মজলিসে নিয়ম ছিল যে, তিনি ব্যাপকভাবে মজলিসে সবাইকে সম্বোধন করে কথা বলতেন। যারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তারা উপলব্ধি করে নিত। হযরতও ইসলাহ্ ও তারবিয়াতের ক্ষেত্রে সবসময় এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে তিনি সবসময় সবাইকে লক্ষ্য করে কথা বলতেন কিংবা ইশারায় বলতেন। যারা হযরতের ঘনিষ্ঠজন ও খাদেম ছিলেন তাদের ক্ষেত্রেও হযরত এরূপ আচরণ করতেন। মনের ভাঙ্গন থেকে তিনি খুব সতর্ক থাকতেন। তারবিয়াতের এই নববী পদ্ধতি অবলম্বনের কারণে সর্বস্তরের মানুষ উপকৃত হতো। এতে মানুষের স্বভাব ও মানসিকতার পুরোপুরি রেয়ায়াত করা হয়। বিদ্বেষমূলক আচরণ ও বিতর্ক করার প্রবণতা ইসলাহের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হওয়ার কোনো অবকাশ থাকে না।

হযরত রহ. এরূপ সুশাসনের মাধ্যমে সবাইকে ইশক ও মহব্বতের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি প্রায় সময় বলতেন, 'শুরুতে কিছু মেহনত ও সাধনা করতে হয়। যখন অন্তর ইশক ও মহব্বত দ্বারা ভরে যাবে তখন এক বছরের কাজ কয়েক ঘণ্টায় সম্পন্ন হবে।'

তাঁর মতে তাসাউফ, মুজাহাদা ও আধ্যাত্মিক শক্তির মূল কথা হচ্ছে, সব সময় অন্তর আল্লাহর প্রতি ধাবিত থাকবে। তিনি বলতেন, 'আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনই হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য।'

হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ. এর সূত্রে তিনি বলতেন, 'আমার কাছে এমন অনেক মানুষ এসেছে যাদের দেহের প্রতিটি লোমকূপ আল্লাহর যিকিরে মগ্ন থাকে। অথচ আল্লাহর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।'

একদা তিনি বললেন,

'চোখের সাহায্যে দেখ, কানের সাহায্যে শোন, হাতের সাহায্যে কাজ কর; কিন্তু হৃদয় ও আত্মাকে আল্লাহর ধ্যানে মশগুল রাখ।'

তিনি আরও বলতেন, 'পীর ও মুরশিদের সন্ধানে তাড়াহুড়ার সাথে কাজ করবে না। যাকে দেখবে যে, তিনি শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দ, ইবাদাত, মু'আমালাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে খুব যত্নবান, তার সাহচর্যে গেলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, দুনিয়ার মহব্বত কমে যায় তার হাতেই তোমরা বাইআত হয়ে যাবে।'

উলামায়ে কেরাম ও শিক্ষিতজন বাইআতের আবেদন করলে তিনি তাদের প্রায় সময় এ কথা বলতেন। কিন্তু অশিক্ষিত ও সাধারণ মানুষকে তিনি কোন সময় এসব কথা বলতেন না। কেননা, তাদের জন্য এসব অনুসন্ধান কঠিন ও দুরূহ মনে হবে।

সব ভক্ত-মুরীদের জন্য এক নিয়ম ছিল না। প্রত্যেককে তিনি তার যোগ্যতা ও উপযোগিতা অনুসারে দিকনির্দেশনা দিতেন। সাধারণত কুরআন মজীদ বেশি পরিমাণে তেলাওয়াত করার জন্য তাগিদ দিতেন। এর পাশপাশি অন্যান্য যিকির, ইসতিগফার আদায় করার জন্য বলতেন। ইসতিগফার সম্বন্ধে তিনি বলতেন, 'শেষ রাতে চোখ খুলে গেলে অত্যন্ত মনোযোগ ও ধ্যানের সাথে গোনাহের কথা স্মরণ করে ইসতিগফার করবে। আল্লাহ্ তাআলা নেক লোকদের গুণাবলী প্রসঙ্গে বলেছেন–

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ.

'তারা রাতের শেষ ভাগে ক্ষমা প্রার্থনা করে।' [কামালাতে মুহাম্মাদিয়া : ১১৬]

যিকির-আযকারের উপকারিতা ও হিকমত প্রসঙ্গে তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। বলতেন,

'সুফিয়ায়ে কেরাম যিকির-আযকারের যে সব আমলের কথা বলেন এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, শরীয়তের বিধি-নিষেধ যথাযথরূপে আদায় করা। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

অর্থাৎ ঈমান ও ইয়াকীনের উৎকর্ষ এমন স্তরের হতে হবে, যাতে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও মহব্বতের তাগিদে এরূপ মনে হয় যে, আমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছি, তিনি আমার সঙ্গে আছেন। এরচেয়ে নিচুস্তরের ধ্যান হচ্ছে, আল্লাহ আমাকে দেখতে পাচ্ছেন।' [কামালাতে মুহাম্মাদিয়া : ১১৭]

তলব (অন্বেষা) ও লালসা

এ প্রসঙ্গে তিনি অন্বেষা ও লালসার পার্থক্য আলোচনা করেন। যেটা না বোঝার কারণে অনেক মানুষের মন ভেঙ্গে যায়। তারা অনুধাবন করতে পারে না যে, তাদের তলব বা অন্বেষা 'প্রকৃত অন্বেষা' নয়। লালসা থাকলে দ্রুত ক্লান্তি আসে এবং দ্রুত নিরাশার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তলব বা অন্বেষা এর চেয়ে উঁচু স্তরের বিষয়। গন্তব্যের দূরত্ব তার ভেতরে আরও শক্তি সঞ্চার করে। তালেব বা অন্বেষী কোন সময় ক্লান্ত ও নিরাশ হয় না, সাহসহারা হয় না। অভাব ও অসহায়ত্ব তার চলার পথের সহায়ক হয়।

হযরত বলেন, 'বর্তমান যুগে তালেব প্রায় নেই বলা যায়। প্রথমত কারো ভেতরে তো আল্লাহর ধ্যানই আসে না। অনেকে বিদআত বলে লোকদেরকে এ পথে আসতে বাঁধা দান করে। কেউ বলে, এরা প্রগতির পথে বাধা। কেউ এ পথের অভিমুখী হলেও তার ভেতরে তলব সৃষ্টি হয় না। লালসার সৃষ্টি হয়। ভালো কোন বস্তু দেখলে তা পেতে যেমন মনে লালসার সৃষ্টি হয়, তেমনি তার ভেতরেও লালসার সৃষ্টি হয়। তলব (অন্বেষা) ও লালসার মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। যার ভেতরে তলব থাকে সে মেহনত-মুজাহাদা করে কোন সময় ক্লান্তিবোধ করে না। তার কাছে কষ্টকে কষ্ট মনে হয় না। দ্বিতীয়ত সে কোন সময় নিরাশও হয় না। বর্তমান যুগে যারা নিজেদেরকে তালেব মনে করে তাদের ভেতরে এগুণ পাওয়া যায় না। অল্প দিনে সামান্য মেহনতে তারা ক্লান্ত ও নিরাশ হয়ে এ পথ হতে বিচ্যুত হয়ে যায়। এ জন্য তারা আল্লাহকে পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকে। [কামালাতে মুহাম্মাদিয়া–১২১]

অধিকাংশ সুফিয়ায়ে কেরামের মতে যে সব যিকির-আযকার ও আমল প্রচলিত আছে, হযরত এগুলো ধরে রাখার পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি বলতেন,

'তোমরা শরীয়তের ওপর আমল কর। হাদীস শরীফে যে সব যিকির ও আমলের কথা বর্ণিত হয়েছে এগুলোই যথেষ্ট। সুফিয়ায়ে কেরাম যেসব অযীফা শিক্ষা দিয়েছেন, এগুলো কেবল সে সকল মানুষের জন্য শোভনীয় যারা কেবল এ কাজের জন্যই হয়ে যায়। যদি তুমি কিছু আমল কর এবং তা পূর্ণরূপে আদায় না হয়, তবে এতে কোন উপকার হবে না।'

শরীয়তের বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে স্তরবিন্যাস

একটা বড় ভুল ও অসাবধানতা, যার শিকার কেবল সাধারণ মানুষ নয়, অনেক আহলে ইলমও হয়ে যায়। এটা হচ্ছে, শরীয়তের বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে স্তরবিন্যাসের প্রতি তারা পুরোপুরি খেয়াল করে না। শরীয়তের দৃষ্টিতে যে সব কাজ অন্যান্য বিধি-নিষেধের তুলনায় কম গুরুত্ব রাখে এগুলোর প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এর ফলে শরীয়তের অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমল অবহেলিত থেকে যায়। হযরতের তারবিয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষায় এ বিষয়ের প্রতি খুব গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি চাইতেন যে, শরীয়তে যে জিনিসটি যে স্তরের, সেটাকে তার স্তরেই রাখতে হবে। এক্ষেত্রে নিজের রুচিকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। শরীয়তের হুকুমকে প্রাধান্য দিতে হবে। হযরত বলতেন-

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পথ অনুসরণ করতে চায়, তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে, শরীয়তে যে নির্দেশটি যে স্তরে উপনীত, সেটাকে তার স্তরে রাখতে হবে। এতে কোন কমবেশি করা যাবে না। মনের ভেতরেও এ বিশ্বাস রাখতে হবে। মুস্তাহাবকে ওয়াজিব কিংবা ফরজ মনে করা যাবে না। অর্থাৎ মুস্তাহাব বর্জনকারীকে এমনভাবে তিরস্কার করা যাবে না, যেরূপ ফরজ কিংবা ওয়াজিব বর্জনকারীকে করা হয়। কেননা, মুস্তাহাব বর্জন করা জায়েয। এ জন্য যদি কেউ এটার ওপর আমল না করে, তবে তাকে তিরস্কার করা যাবে না। বিশেষত বর্তমান সময়ে; যখন শরীয়তের ওপর আমল করাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, যদি কোন ব্যক্তি মুস্তাহাবকে বিদআত বলে এবং মুস্তাহাবকে অস্বীকার করে তবে তার কী হুকুম হবে? বর্তমান সময়ে এ নিয়ে অনেক জায়গায় বিতর্ক ও বাড়াবাড়ি চলছে। এমন লোক খুব কমই দেখা যায়, যারা এক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখে এবং সাধারণ মানুষকে বিষয়টি বুঝানোর চেষ্টা করে যে, এখানে এতটুকু কম বা বেশি হচ্ছে, এতটুকু ভুল এবং এতটুকু শুদ্ধ।

মুস্তাহাব দু' প্রকার। যে সব মুস্তাহাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের উক্তি ও কর্ম দ্বারা সাব্যস্ত এগুলোকে বিদআত বলা যায়

না। যে ব্যক্তি এরূপ বলে সে ভুল বলে। আর যে সব মুস্তাহাব পূর্বযুগের বুযুর্গানে দীনের উক্তি ও কর্ম দ্বারা সাব্যস্ত এগুলোকে যদি কেউ বিদআত বলে কিংবা এগুলোর ওপর আমল না করে, তবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর হুকুমও ভিন্ন রকম হবে। যদি কেউ মনে করে যে, এগুলোর ওপর সবাই নিয়মিত আমল করলে সাধারণ মানুষ এগুলোকে ফরজ, ওয়াজিব বলে বিশ্বাস করবে। সর্বসাধারণকে তো ভুল বিশ্বাস থেকে রক্ষা করতে হবে। অথবা উঁচু স্তরের কোন জ্ঞানী মানুষ যদি মনে করেন যে, ইতোপূর্বে বুযুর্গরা যে কারণে এ আমল করতেন, বর্তমান পরিস্থিতি এর অনুকূল নয় এবং এ আমল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনও করেননি, এজন্য তিনি এটাকে বর্জন করেন। এরূপ অবস্থায় কাউকে তিরস্কার করা যাবে না; বরং এ দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশংসনীয় মনে করতে হবে। কোন মুসলমান বিশেষত কোন আহলে ইলম যদি এটাকে বিদ'আত বলে প্রচার করে এবং সমাজে ফিতনা সৃষ্টি করে, তবে নিঃসন্দেহে এটা অত্যন্ত গর্হিত বলে গণ্য হবে।' [কামালাতে মুহাম্মাদিয়া : ১২৯]

সামাজিক সম্পর্ক

মানুষের সঙ্গে হযরতের সম্পর্ক এমন পর্যায়ের ছিল যে, তাদের সঙ্গে মতপার্থক্য বা তিক্ততা সৃষ্টি হওয়ার কোন সুযোগই ছিল না। এক সময় যাদের সঙ্গে হযরতের বিরোধ ছিল, তারাও শেষ পর্যন্ত হযরতের সান্নিধ্যে এসেছে এবং হযরতের মেহমানদারী, তারবিয়াত পেয়ে ধন্য হয়েছে। অনেক সময় হযরত তাদেরকে আর্থিক সাহায্যও দিয়েছেন। শত্রুতা ও বিরোধ সম্বন্ধে জানা সত্ত্বেও হযরত তাদের সঙ্গে ভালোবাসা ও মহব্বতসুলভ আচরণ করতেন। 'কামালাত' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে একটা আকর্ষণীয় ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এতে হযরতের চারিত্রিক উৎকর্ষের পাশাপাশি তাঁর ঈমানী দূরদর্শিতারও পরিচয় ফুটে উঠেছে। এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক মানবীয় গুণাবলীর সঙ্গে হওয়া উচিত; ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে নয়। উত্তম চরিত্র ও উৎকৃষ্ট গুণাবলীর ভিত্তিতে যে সম্পর্ক হয়, সেটাই স্থিতিশীল ও চিরস্থায়ী হয়। তিনি বলেন,

'খানকাহ্ প্রতিষ্ঠাকালে এক ব্যক্তি নিয়মিত এখানে আসতেন। মাওলানা মুঙ্গেরী রহ. তার প্রতি বিশেষ নযর রাখতেন এবং তাকে যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করতেন। কিন্তু তার অবস্থা ছিল এমন যে, সে খানকায় বসে হযরতের বিরোধিতা করে কথা বলত। আমরা এসব শুনে খুবই কষ্ট পেতাম। কিন্তু হযরতের কারণে কিছু বলার সাহস পেতাম না। একদিন আসরের নামাজের পর লোকটি খানকায় এসে হযরতের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ও মন্তব্য করা শুরু করে। এসব শুনে আমার কষ্টের সীমা রইল না। আমি সংকল্প করলাম যে, পরিষ্কারভাবে এগুলো

হযরতকে অবহিত করব। হযরতের নিয়ম ছিল, তিনি ফজরের নামাজের আগেও চা পান করতেন। এ সময় তিনি একাকী থাকতেন। তবে চা পানের সময় কাউকে ডেকে শরিক করতেন। যে রাতে এ ঘটনা ঘটেছিল, সে রাতের সকালেই চা পানের জন্য আমাকে নির্দেশ করা হল। এ সময় হযরতকে একাকী পেয়ে পুরো বিষয়টি হযরতকে অবহিত করলাম। হযরত জবাবে বললেন, আল্লাহর কোন সৃষ্টি না দোষমুক্ত, আর না বিবেকহীন। আল্লাহ তাআলা আমাকে যৌবন বয়সে মানুষ চেনার যোগ্যতা দান করেছিলেন। যখন আমি কানপুর অবস্থান করছিলাম, তখন মহিলারা তাদের ভাবি জামাতাদেরকে আমার সামনে এনে দেখাতেন। তাদের ব্যাপারে আমি যা সিদ্ধান্ত দিতাম সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক প্রমাণিত হতো। আল্লাহর মেহেরবানী! কাউকে দেখলে তার গুণাগুণ আমি উপলব্ধি করতে পারতাম। এগুলো মানুষের স্বভাবজাত বিষয় যা কোন সময় বিচ্যুত হয় না। মানুষ একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে; কিন্তু এক সময় দোষত্রুটি প্রকাশ পেলে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। আমি কোন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করি না; বরং তার স্বভাবগুণের সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করি; যা স্থায়ী ও স্থিতিশীল। এ জন্য আমি যাদের সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করি, তাদের সঙ্গে কোন সময় মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় না; সম্পর্ক নষ্ট হয় না।' [কামালাতে মুহাম্মাদীয়াহ : ৩১৭]

হযরতের পত্রাবলি

হযরতের পত্রাবলি ইলম ও মারেফাতের বিশাল খাযানা। তাসাউফের হাকীকত ও গুপ্তধন সমৃদ্ধ রত্নভাণ্ডার। হযরতের পত্রাবলির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অনেক গভীরতর বিষয়কে তিনি অতি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। এতে অধিকাংশ তত্ত্ব ও তথ্য এমন যা সাধারণত সালিকীনের জন্য অপরিহার্য। এগুলো অধ্যায়ন করলে সিদ্ধির স্তরে পৌঁছার জন্য সালেকের অন্তরে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। মন ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে যায়। তার সীনায় আগুন জ্বলে উঠে। প্রতিটি পত্রেই সবচে বেশি এ বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক এমন গভীর হতে হবে যাতে কোন সময় গাফলত ও উদাসীনতার সৃষ্টি না হয়। রূহানী ও আধ্যাত্মিক অবস্থা এমন শক্তিশালী হতে হবে, যাতে দুনিয়ার সৌন্দর্য ও আকর্ষণ কিছুই মনে হবে না। পার্থিব জগতের সবকিছু বিস্বাদ ও তিক্ত মনে হবে। প্রতিটা মুহূর্তে সম্পর্কের গভীরতা অনুভূত হবে। আল্লাহর দীদার ও আখেরাতের প্রতি আসক্তি হৃদয়ে বদ্ধমূল হবে। জীবনের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ততার ভেতরেও আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হবে না।

ناخوش آں وقتے کہ بر زندہ دلاں بے عشق رفت

: ضائع آں روزے کہ بر مستاں بہ ہشیاری گزشت

'ইশক ও মহব্বত ব্যতীত যে সময়টুকু ব্যয় হয়ে যাবে এর প্রতি সে অসন্তুষ্ট থাকবে। প্রেমের দহন-যন্ত্রণা বিহীন যে দিনটা অতিবাহিত হবে সেটাকে সে অসার ও ব্যর্থ মনে করবে।'

তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, ইশক ও মহব্বতের গভীরতা অনুভব করার পাশাপাশি শরীয়াতের সীমা-পরিসীমা থেকে কোন সময় বিচ্যুত হওয়া যাবে না। এ বিষয়ে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কামাল বা কৃতিত্ব তো এখানেই যে, একদিকে হৃদয়ে ভালোবাসার আগুন জ্বলতে থাকবে, অপরদিকে শরীয়তের বিধি-নিষেধও পুরোপুরি পালিত হবে। কোন সময় এমন কাজ করা যাবে না যা শরীয়তের ও সুন্নাতের মানদণ্ডের বাইরে চলে যায়। মাওলানা ইসমাতুল্লাহ সাহেবের কাছে পাঠানো এক পত্রে তিনি লিখেন–

'বুযুর্গদের দু'টি অবস্থা থাকে। একটা হচ্ছে শরীয়ত ও সুন্নাত অনুসরণ। আরেকটা হচ্ছে ইশক ও মহব্বতের গভীরতা অর্জন। অনেকের ক্ষেত্রে শরীয়তের অনুসরণ প্রবল হয় আর ইশক ও মহব্বতের বিষয়টি দুর্বল হয়। কারো কারো ক্ষেত্রে ইশক ও মহব্বতের বিষয়টি প্রবল হয় এবং শরীয়তের বিধি-নিষেধ পালনে শিথিলতার সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলা যে সব বুযুর্গকে উঁচু মাকাম দান করেছেন তারা উভয় অবস্থায় সামঞ্জস্য বজায় রেখেছেন। উভয় দিকের হক পুরোপুরি আদায় করেছেন।

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ.

'তিনি প্রবাহিত করেছেন দুই দরিয়া, যা পরস্পরে মিলিত থাকে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা কোনটাই অতিক্রম করতে পারে না।'

শাহ রহমতুল্লাহ মুযাফফারপুরী রহ. হযরতের অন্যতম খলীফা ছিলেন। তিনি তালীম ও তাবীযের ব্যাপারে হযরতের কাছে অনুমতি চাইলে জবাবে তিনি লিখলেন–

'যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম জিজ্ঞেস করবে তাকে জবাব দিতে হবে। তবে নিজের ইসলাহের বিষয়টি অগ্রাধিকার দেবে। যদি দুনিয়ার সব মানুষ মুক্তি পেয়ে যায় আর আমরা কেবল অবশিষ্ট থাকি, তবে আমাদের চেয়ে বেশি হতভাগা আর কে হবে? আমাদের পবিত্র ধর্মের মূলনীতি হচ্ছে তাওহীদ। তবে এ ক্ষেত্রে কেবল

মুখের স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়। মুসলমানের হৃদয়ে যে সত্তার ভালোবাসা বিদ্যমান তার চোখে মুখে ও শিরা উপশিরায়ও সে সত্তা বিদ্যমান থাকবে।

اس قدر رہتا ہے مجھ کو آپکی باتوں کا دھیان

جب کوئی بولا صدا کانوں میں آئی آپ کی

'আমার অন্তরে আপনার ধ্যান এত বেশি যে,

কানে কোন শব্দ এলে সেটা আপনারই শব্দ বলে মনে হয়।'

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের ভেতরে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ কোন ইবাদতে মনোযোগ ও একনিষ্ঠতা আসবে না। কেবল সামাজিক আচার হিসেবে এ সব পালিত হবে।

তিনি আরও লিখেছেন-

'যবানে ওযীফা পড়লে কিছু আসে যায় না। মনোযোগ সৃষ্টি করতে হবে; যাতে আল্লাহর ধ্যান মনের গহীনে বসে যায় এবং অন্তর থেকে গায়রুল্লাহ পুরোপুরি বিদায় হয়ে যায়। তা'বীযের বিষয়টা আমার পীর ও মুর্শিদ শিক্ষা দেননি; বরং যা জানা ছিল তাও ভুলিয়ে দিয়েছেন। তবে তিনি বলেছেন, যবানে এমন শক্তি সৃষ্টি কর, সেটা তাবীযে পরিণত হয়ে যায়।

সর্বশেষ লিখেছেন-

'আমার নামে শাহ ও নাযেম যুক্ত করবে না। ফকীরকে বাদশাহ বলে সম্বোধন করলে বাদশাহদের প্রতি অপমান আরোপ করা হবে।'

ওয়াহ্দতে ওজুদ সম্বন্ধে হযরতের একটি পত্র

ওয়াহদতে ওজুদ তাসাওউফের একটা সুপ্রসিদ্ধ মাসআলা। এ নিয়ে কী পরিমাণ লেখালেখি হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। তবে এ সংক্রান্ত অধিকাংশ লেখাই হচ্ছে এমন যা সাধারণ মুসলমানের হাতে দেয়ার মতো নয়। তারা এসব উপলব্ধি করতে পারবে না এবং তা থেকে উপকৃতও হতে পারবে না। বিষয়টা এত গভীর যে, সবার পক্ষে তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আর এটার ওপর দীনের পূর্ণতাও নির্ভর করে না। হযরতও এটার পক্ষপাতি ছিলেন না যে, এ বিষয়টা সকল সালেক ও ভক্ত-মুরিদের সামনে ব্যাপকভাবে আলোচিত হোক। কিন্তু 'মাকামাতে মুহাম্মাদিয়া'র লেখকের এক প্রশ্নের জবাবে এ জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা তিনি এমনভাবে পেশ করেছেন যে, শরীয়তের নীতিমালা, বিধি-নিষেধ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে ওয়াহদাতুল ওযূদের কোন বিরোধ পাওয়া যায় না এবং তা বিশুদ্ধভাবে

বোঝাও দুষ্কর নয়। 'মাকাতীবে মুহাম্মাদিয়া' ২য় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে, হযরত লিখেছেন–

'তোমরা ওয়াহদতে ওজুদ ও ওয়াহদতে শুহূদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছ যে, এগুলোর সারকথা কী এবং এর মধ্যে কোনটা সত্য? প্রথম কথা হচ্ছে, এগুলো এমন সব আকীদার অন্তর্ভুক্ত নয়, যা জানা ও মানা সকল মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। তা ছাড়া বিষয়টা এত নাযুক যে, এ ক্ষেত্রে অনেক আহলে ইলম ও বিদগ্ধ মনীষীদের বিবেক ও জ্ঞান-বুদ্ধি অক্ষম হয়ে যায়; সাধারণ মানুষের বিষয়টি তো বলার অপেক্ষা রাখে না।'

'ওয়াহদতে ওজুদ' আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,

'সূফীবাদের পরিভাষায় 'ওজুদ' দ্বারা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বকে বুঝানো হয়। 'ওজুদ' অর্থ বিদ্যমান। 'ওজুদ' এর সারকথা হচ্ছে, অস্তিত্বশীল সত্তা কেবল একজন। আর এ বিশ্বজগত এবং তাতে যা কিছু আছে সবই তাঁর অস্তিত্বের বিভিন্ন অবস্থা প্রমাণ করছে। সমুদ্রের ভেতরে কোন সময় তরঙ্গমালা দেখা যায়। কোন সময় সমুদ্রপৃষ্ঠে বুদবুদ দেখা যায়, কোন সময় শীতকালে সমুদ্রের পানি তুষারাবৃত থাকে। মনে হয় তা সাদা দ্বীপ। বাস্তবে এ সবই হচ্ছে, সমুদ্রের পানির বিভিন্ন অবস্থা। কিন্তু সমুদ্র তো একটা সীমিত বস্তু। এর অবস্থা যতই ভিন্ন ভিন্ন হোক সবটারই একটা সীমা পরিসীমা আছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার সত্তা তো অসীম। তিনি অনাদি অনন্ত। তার শান ও অবস্থাও অনন্ত ও অসীম। অগণিত অসংখ্য পদ্ধতিতে তার শান ও অবস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে এবং ঘটতে থাকবে। তার মর্জি মোতাবেক নতুন নতুন রঙে তার আলো বিচ্ছুরিত হয়।

كل يوم هو في شان (তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত থাকেন।) এর অর্থ এটাই। এখানে নাযুক বিষয় হচ্ছে, সমুদ্রের তরঙ্গ বা বুদবুদকে সমুদ্র বলা হয় না এবং সমুদ্রের ভেতরে যে শক্তি নিহিত আছে সেটা বুদবুদ বা তরঙ্গে থাকে না। অনুরূপ আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন শান ও অবস্থা থাকে, এসব শান ও অবস্থাকে আল্লাহ বলা যায় না।

হযরত আরও লিখেছেন, 'এটা এমন এক অবস্থা হযরত মূসা আ. যার শিকার হয়েছিলেন। এতে তার যবান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং বক্ষদেশ সংকুচিত হয়েছিল।'

ويضيق صدري ولا ينطلق لساني (আমার বক্ষদেশ সংকুচিত হয়ে যায় এবং আমার জিহ্বা সাবলীল নয়।) এর ব্যাখ্যায় হযরত বলতেন,

'আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ.কে বলেছিলেন যে, তুমি ফিরআউনের কাছে যাও, আমার তাওহীদ ও একত্বের কথা তাকে শোনাও। হযরত মূসা আ. আল্লাহ তাআলার সত্তা দর্শনে নিমজ্জিত ছিলেন। এ জন্য তিনি বললেন, তোমার জামাল ও জালাল দর্শনের ফলে এখন না আমার হৃদয় ও আত্মা নিয়ন্ত্রণে আছে, না আমার যবান ও ভাষা সক্রিয় আছে। সুতরাং ফিরআউনের কাছে গিয়ে কীভাবে তোমার বড়ত্ব ও মহত্বের কথা বর্ণনা করবো? সূফীরা হযরত মূসা আ.- এর কথার ব্যাখ্যা এরূপ করে থাকেন। এর স্বাদ ও মজা কেবল তারাই অনুভব করতে পারে যাদেরকে আল্লাহ ইহসান-এর স্তরে পৌঁছার তাওফীক দান করেছেন এবং যারা واعبد ربك كأنك تراه 'তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত এমনভাবে কর যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ'-এর ওপর আমল করতে সক্ষম হয়। তাফসীরবিশারদরা বাহ্যত যে অর্থ করে থাকেন, সেটাও শুদ্ধ ও নির্ভুল। কুরআন মজীদে জাহেরী বাতেনী (প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য) উভয় অর্থ গ্রহণের সুযোগ আছে। এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

সর্বশেষ তিনি লিখেছেন-

'বান্দা আল্লাহ পাকের সত্তা ও গুণাবলী বিষয়ে অজ্ঞ। তার বুদ্ধিবৃত্তি এগুলো অনুধাবন করতে অক্ষম। এ সম্বন্ধে যে যা বলেছে, সবই নিজের জ্ঞান ও অবস্থা অনুপাতে বলেছে। হে প্রিয়! এ বিষয়ে আল্লাহর কালাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস দ্বারা কোন মীমাংসা হয়নি, সুতরাং বুঝতে হবে যে, এর মীমাংসা আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় হয় নি। এ বিষয়টি মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির উর্ধ্বে হওয়ার কারণে এর মীমাংসার পেছনে লেগে থাকায় জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করা ব্যতীত আর কোন উপকার নেই। যে কাজ নিজের উপকার বয়ে আনে এমন কাজে মনোযোগী হওয়া উচিত। এরপর আল্লাহর পক্ষ হতে মনের গহীনে যা উদয় হবে সেটা মানতে হবে আর অন্যদের মা'যূর মনে করতে হবে। যদি আল্লাহওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়, তবে এ ক্ষেত্রে নীরব থাকতে হবে। [মাকাতীবে মুহাম্মাদিয়া]

সত্তা ও গুণাবলী দর্শনই হচ্ছে মূল বিষয়, কাশফ ও কারামাত কাম্য নয়

হযরত রহ. এক বিস্তারিত পত্রে মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. এর ওপর অভিযোগকারীদের জবাবে লিখেছেন যে, 'এ অভিযোগের একটা বড় কারণ হচ্ছে, মুজাদ্দিদ রহ. সুন্নাত ও শরীয়তের খুব পাবন্দী করতেন। এটাকেই তিনি জীবনের মূল পুঁজি মনে করতেন। এ জন্য তার এ মতাদর্শ ও মাসলাক সে সব লোকের পছন্দ হয়নি, যারা সুন্নাত সম্বন্ধে অনবহিত এবং শরীয়তের মূলতত্ত্ব

সম্বন্ধে অজ্ঞ। তিনি বলেন, 'এমন মুজাদ্দিদ (অর্থাৎ মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.) –এর অভিমত আমাদের জ্ঞানসীমানার বাইরে হলেও কোন হাদীসের সঙ্গে তো এর বিরোধ নেই। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, প্রতি শতাব্দীতে একজন মুজাদ্দিদ সৃষ্টি হবেন। মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. দশম শতকে জন্ম নিয়েছেন। এগার শতকে তার সংস্কার কার্যক্রম শুরু হয়; যা দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শুরু। সুতরাং তাঁকে যেরূপ এগার শতকের মুজাদ্দিদ বলা যায়, তেমনি দ্বিতীয় সহস্রাব্দেরও মুজাদ্দিদ বলা যায়। কোনটাই হাদীসের পরিপন্থী নয়।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. বলেন, দুনিয়াবিরাগীরা একনিষ্ঠতা ও মনোযোগ সৃষ্টি করার জন্য যে সব পথ ও পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, এতে অনেক প্রভাব রয়েছে। এগুলো চর্চা করলে এমন স্বাদ অনুভূত হয়, যা দুনিয়ার অন্য কিছু দ্বারা হয় না। এর ফলে কেউ গায়বী ও গোপন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে, কেউ নূর প্রত্যক্ষ করে। তাদের উদ্দেশ্য থাকে কেবল উপভোগ করা এবং বিস্ময়কর বস্তু দেখা ও দেখানো। তারা এতে এমনভাবে আত্মনিয়োগ করে যার ফলে আল্লাহ তাআলার যাত ও সিফাত, জামাল ও জালাল পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। নিজেদের অবস্থা নিয়ে এত বেশি নিমগ্ন থাকে যার ফলে তারা আসল সম্পদ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। কিন্তু আওলিয়ায়ে কেরামের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কাশফ ও কারামাত তাদের উদ্দেশ্য থাকে না। আল্লাহ পাকের যাত ও সিফাত দর্শন করা তাদের উদ্দেশ্য থাকে। অধিকন্তু তারা স্বাদ উপভোগ, কাশফ ও কারামাত পরিহার করতে চান। অনেক সময় তারা এগুলোকে নিজের তারাক্কী ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধা মনে করেন।'

'তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্তরে আল্লাহর স্মরণ ও যিকির ব্যতীত আর কিছু থাকবে না। শরীয়তের বিধিনিষেধ পালন তাদের কাছে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের মতো মনে হবে। তাঁরা স্বাদ উপভোগ, কাশফ, কারামাত ও অলৌকিক অবস্থা থেকে দূরে থাকেন। কেবল আল্লাহ পাকের সত্তা ও গুণাবলী দর্শনে নিমগ্ন থাকেন। তাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের শান ও মহত্ত্ব বদ্ধমূল থাকে।

إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ.

ফলে আল্লাহর কথা আলোচনা করলে তাদের হৃদয় শিহরিত হয়ে উঠে। তাদের মধ্যে বেশি মর্যাবান হচ্ছেন তারা, যাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ.

(তারা সে সব লোক যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হইতে বিরত রাখে না।) তারা তাদের হৃদয় ও আত্মা আল্লাহর নিকট সপে দিয়ে উল্লসিত থাকেন। সুবহানাল্লাহ! তাঁদের অবস্থা কত বিস্ময়কর! তাদের হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। বাহ্যত দেখা যায় যে, তারা সবকিছু করে যাচ্ছেন; কিন্তু তাদের মন আল্লাহর স্মরণে সদা নিমগ্ন। এটাই ছিল সাহাবায়ে কেরামের শান। নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া সিলসিলার বুযুর্গানে দীনের অবস্থাও এরূপ। তাদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য মানুষের অন্তরকে কুদরতীভাবে আল্লাহর দিকে আকর্ষণ করে। মেসমেরিজম ও যাদুবিদ্যা তো মানুষকে তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আকর্ষণ করে; কিন্তু এসব আল্লাহওয়ালাদের শান ভিন্ন রকম। মানুষের হৃদয় ও আত্মা স্বেচ্ছায় তাদের পদতলে লুটিয়ে পড়ে। বিশেষত, যখন তারা আল্লাহর ধ্যানে বিভোর থাকেন, তখন যে কেউ তাদের নজরে পড়ে যায় আল্লাহর জন্য সে পাগল হয়ে যায়।' [মাকাতীবে মুহাম্মাদিয়া : ১ম খণ্ড]

নূর ও কাশফের দৃষ্টান্ত

হযরত তাঁর পত্রাবলির ভেতরে এ বিষয়টা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে লিখেছেন যে, সালেককে সবসময় সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। কোন সময় যেন এমন না হয় যে, নূর ও কাশফ কিংবা অলৌকিক কিছু দর্শনে সে আসল উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। মুজাদ্দিদ রহ.ও এক পত্রে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন–

'নূর ও কাশফ কিংবা গায়বী বিষয় দর্শনই যদি আসল উদ্দেশ্য হয়, তবে এ বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলার কুদরত ও সৌন্দর্যের দৃশ্যাবলি তো কোন ক্ষেত্রে কম নয়।'

অন্য এক স্থানে লিখেছেন–

'নূর ও তাজাল্লী এবং কাশফের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, দুনিয়ার মুসাফির চলার পথে বিভিন্ন বস্তু ও দৃশ্যাবলি দেখে থাকে, কিন্তু সে এ সবের দিকে মনোযোগ দেয় না অথবা এক পলক দৃষ্টিপাত করে নিজের গন্তব্যের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে যায়। অনুরূপ সুলূকের পথেও। সুলুকের পথে পরিভ্রমণকালে একজন মুসাফিরের বিভিন্ন ধরনের তাজাল্লি দৃষ্টিগোচর হয়– যা কখনও দেখা যায় পুরস্কার হিসেবে। আবার কখনও পরীক্ষা রূপে।

একজন মুরীদকে তিনি এ বিষয়ে সতর্ক করে লেখেন, যেভাবে একজন মুসাফির কোনো স্থানে যাবার কালে পথিমধ্যে অনেক বিরল, বিস্মকর বিষয় দেখে থাকে, কোথাও বাগ-বাগিচা কোথাও শ্যামলিমা, কোথাও পাহাড়-পর্বত, কোথাও সুরম্য প্রাসাদ। আবার কোনো স্থানে রং তামাশা, কোথাও গান-বাজনা, মোটকথা বিভিন্ন

ধরণের খেল-তামাশা নজরে আসে। তখন যদি কোনো ধরনের খেল-তামাশার প্রতি সে দৃষ্টিপাত না করে কোনো পাহাড় পর্বত কিবা দৃষ্টিনন্দন সবুজ শ্যামলিমার প্রতি নজর না দেয় এবং সোজা পথ ধরে সে চলতে থাকে তবে দ্রুত সে উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে সমর্থ হবে। আর যদি কোনো দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে তবে আল্লাহ্ হাফেজ। হয়তো তাতে ফেঁসে গিয়ে পথচলা থেমে যাবে। আর যদি ফেঁসে না যায় তবে তা দেখতে দেখতে বিলম্ব তো হবেই। এর উপরই একজন আধ্যাত্মিকতার পথের মুসাফিরকে অনুমান করতে হবে। সে পথেও সালেকের যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের বিরল বিস্ময়কর ঘটনাবলী নজরে আসবে। তন্মধ্যে কিছু 'রাহমানী' আবার কিছু হয়ে থাকে 'শয়তানী'। কেউ খুব মনোহরী আওয়াজ শুনতে পায়। কেউ অদৃশ্যের ঘটনাবলী অবগত হতে থাকে কিংবা কারও ভবিষ্যত-ঘটনার কাশফ হতে থাকে। কারও কারও রুহানিয়াতের সাথে অধিক সম্পর্ক হয়ে যায়। সে অধিকাংশ সময় পবিত্র আত্মাসমূহের সাথে মিলিত হতে থাকে। বস্তুত এসব কিছুই উদ্দেশ্য বহির্ভূত। সালেকের জন্য সমীচীন নয় এসবের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা।

যিকিরের প্রভাবহীনতা ও মন্দ চিন্তা উদয়ের একটি বড় কারণ

মাওলানা রহ. এ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে লিখেছেন, অনেক লোক যিকির করে কিন্তু এই চিন্তা করে না যে, অন্যদিকে সে এমন সব কাজের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে কিংবা এমন সংস্পর্শে আবদ্ধ রয়েছে যার ফলে অন্তর যিকিরের পরিপূর্ণ প্রভাব কবুল করতে পারছে না। যদিও কিছু প্রভাব পড়ে তবে তা দ্রুতই অপসৃত হয়ে যায়। এর কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনটি হয়ে থাকে- কোনো পাপে লিপ্ত হওয়া, মন্দ সংস্পর্শ, সন্দেহজনক সম্পদ।

তিনি বলেন- আল্লাহর সন্ধান ও আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছা নেহায়েত মুশকিল। তাকে সহজ মনে করা এবং উদাসীনতার সাথে কাজ করা মারাত্মক ভুল ও নির্বুদ্ধিতা। 'তলবে খোদা' ও 'উছুল ইলাল্লাহ নিতান্ত কঠিন কাজ। পৃথিবীতে এমন কঠিন কাজ আর দ্বিতীয়টি নেই। অবশ্য যাকে আল্লাহ তাআলা সহজসাধ্য করে দেন- তা ভিন্ন কথা। যদি কোনো প্রজার ঘরে রাজা চলে আসেন তবে তা রাজার প্রজা হিতৈষিতা ও বদান্যতা। এর বিপরীতে যদি সেই প্রজা নিজের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে রাজাকে নিজের ঘরে আনতে চায়- তবে তা বুদ্ধিতে ধরে না; অনেক দুরূহ বলেই মনে হয়।'

অতঃপর লেখেন-

'যিকিরে কিংবা ইবাদতে স্বাদ না পাওয়া এবং কুমন্ত্রণার আধিক্য হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো খারাপ সঙ্গ। (বাজারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসা-যাওয়া, অধিক পরিমাণে হাসি-ঠাট্টা ও ছিদ্রান্বেষণ, বিনা কারণে দীর্ঘ জাগতিক আলোচনা ও কথাবার্তায় লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি লেখকের দৃষ্টিতে খারাপ সঙ্গের পর্যায়ে পড়ে। সারা দিন খারাপ সংস্পর্শে থাকার ফলে অন্তরকে অন্ধকার ও নাপাকি আচ্ছন্ন করে ফেলে।)

অতএব তা সামান্য যিকিরের মাধ্যমে কিভাবে দূরীভূত হতে পারে? আর যদি তার কিছু দূরীভূত হয়ও তবে আগামীকাল তো আবার সেই সংসর্গ বিদ্যমান। যে অবস্থা আজকে সৃষ্টি হয়েছে আগামী দিনের সংসর্গ তো তা অপসৃত করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন ধরনের অন্তর সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন অন্তর এমন হতভাগা হয় যে, তার সংস্পর্শ, তার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করা তালিবের অন্তরকে এমন বিনষ্ট করে দেয় যে, দীর্ঘদিনের সাধনাও তার ফলে বরবাদ হয়ে যায়। তালিবের জন্য জরুরি হল এই বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা যে, যার সংস্পর্শের ফলে তার অন্তর বেশি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তার থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকবে। তা শনাক্ত করার প্রক্রিয়া হলো যখন যিকিরের মধ্যে বেশি অমনোযোগিতা আসে তখন চিন্তা করবে তা কী কারণে হয়েছে? আজ আমি কার কার সাথে বসেছি? আমি আজ কী কী কাজ করেছি? কেমন খাবার খেয়েছি? কোন গুনাহ তো করিনি? খাবার হারাম কিংবা সন্দেহজনক সম্পদ থেকে হয় নি তো? খুব চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে যা বুঝে আসে তা থেকে বিরত থাকবে এবং অত্যন্ত বিনীত হয়ে আল্লাহ তাআলার দিকে অভিমুখী হয়ে তওবা করবে এবং এই প্রতিজ্ঞা করবে যে, পুনরায় এমনটি করব না। যদি এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তবে অবশ্যই যিকিরের স্বাদ আসবে। বস্তুত তওবা ব্যতিরেকে যিকিরে স্বাদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মুর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়।'

অকৃতজ্ঞতার কারণে যে নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয় তা পুনরায় পাওয়া যায় না

এক চিঠিতে মাওলানা লেখেন, এই অবস্থা অর্জিত হওয়ার পর সামান্যতম না-কদরী, জবান কিংবা আমলের মাধ্যমে অকৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ সকল উন্নতিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারে। আর যে নিয়ামত অকৃতজ্ঞতার কারণে ছিনিয়ে নেওয়া হয় তা পুনরায় লাভ করা যায় না। এই অবস্থা ও হালাতের প্রতি সামান্য গাফলতও বিনাশী বিষতুল্য। তার ফলাফল হলো নিয়ামত হাত ছাড়া হওয়া ও নিয়ামতদাতার ক্রোধের পাত্র হওয়া;

'অন্তরে যদি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং উত্তম আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনার সঞ্চারও তাঁর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তবে তার মূল্যায়ন ও হেফাজত অবশ্যই করতে হবে। নতুবা সুমহান নিয়ামতের না শুকরী করা হবে। যার ফল নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া ও নিয়ামত দাতার ক্রোধের পাত্রে পরিণত হওয়া। বস্তুতঃ যে নিয়ামতকে অকৃতজ্ঞতার কারণে ছিনিয়ে নেওয়া হয় তা হাজার বার মাথা ধুনলেও পুনরায় তা লাভ করা যায় না। অনেক সতর্ক থাকা চাই। হেফাজতের উপায় হলো যে সকল আমলের কারণে সেই নিয়ামত পাওয়া গেছে তার ওপর অবিচলতা, নিত্য শোকর ও দীনতার সাথে তার পরিপন্থী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা।'

যিকিরের স্বাদ থেকে পৃথিবীতে আর কোন বড় স্বাদ নেই

মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ হুঁশিয়ারপুরীকে যিকিরের গুরুত্ব সম্পর্কে চিঠির শেষ দিকে নিম্নোক্ত কথাগুলো লেখেন–

'মাওলানা এসব কথাকে অন্তরে স্থান দেবেন এবং খুব চিন্তা-ভাবনা করে এর ওপর আমল করবেন। আল্লাহর স্মরণ ও তার ইবাদতে এমন স্বাদ ও মজা রয়েছে দুনিয়ার কোন স্বাদ তার এক শতাংশও হতে পারে না। আল্লাহ তাআলার স্মরণের ফলে অন্তরে এমন প্রশান্তির সৃষ্টি হয় যে, যেমনটি কোন নবাব, বাদশাহ কিংবা আমীরেরও হতে পারে না।

أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

এটি আল্লাহর তাআলার ফরমান। আলেমদেরকে দেখে নেহায়েত বিস্মিত হতে হয় যে, তারা অন্তরের প্রশান্তির জন্যে জাগতিক উপায়-উপকরণের পেছনে পড়ে পেরেশান হয়, অথচ তারা আল্লাহ তাআলার ইরশাদের প্রতি নজর দেন না। বেশি লেখা অপ্রয়োজন মনে করছি। আমি সম্ভবত মুখেও বলেছিলাম যে, প্রথমত ইসমে জাতের মশক করতে হবে। এ পর্যন্ত তা চালু রাখতে হবে যতক্ষণ না শিরা-উপশিরা দিয়ে আল্লাহর যিকির হতে শুরু করে এবং পুরো শরীর জবানে পরিনতি হয়। মাওলানা! তালেবের যখন এই অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং আপনা আপনি পুরো শরীর থেকে যিকির হওয়া শুরু করে তখন এ পরিমাণ হালাতের সৃষ্টি হয় যে, যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই এবং অলক্ষে তার যবান থেকেও যিকির চালু হয়ে যায়।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

কোন কোন ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিক এবং কোন কোন সরল প্রাণ মুসলমানও তাদের ধোঁকায় পড়ে এই সন্দেহে পতিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা নিজেই কুফর ও ঈমান সৃষ্টি করেছেন, তিনি কাউকে হেদায়েত দান করেছেন এবং কারও জন্যে জাহান্নামের ফয়সালা করেছেন। তবে তিনি কেন গুনাহের কারণে সতর্কবাণী ও পুণ্যের কারণে প্রতিশ্রুতি দান করেছেন? আর তাতে কী রহস্য ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে! মাওলানা একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে তা এভাবে বর্ণনা করেন যে, এই প্রশ্নের ভিত্তিই ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। একজন প্রশ্নকারীর জবাবে লেখেন :

'প্রথমে একথা বুঝে নিতে হবে যে, পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা আল্লাহ তাআলার মালিকানাধীন। তিনি মালিক এবং মানুষ তার মামলুক। এ কথা সকলে জানে যে, মালিক তার অধিকারভুক্ত সম্পদ ইচ্ছামত ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখেন। মামলুকের জন্য এই অধিকার নেই যে, মালিকের কোন ধরনের হস্তক্ষেপকে অন্যায় বলে আখ্যায়িত করে।'

অতঃপর তার দৃষ্টান্ত পেশ করতে গিয়ে বলেন :

'কারও কারও কাছে গাভী, বলদ, ছাগল-ভেড়া অনেক হয়ে থাকে। তা থেকে কোনোটি বিক্রি করে দেয়, কোনোটা নিজে লালন পালন করে এবং খুব ভালোভাবে খাইয়ে মোটাতাজা করে এবং কেবল তাকে দেখতেই তার ভালো লাগে। কোনোটার দুধ পান করে, কোনোটাকে জবেহ করে খাওয়া হয়; কোনোটার ওপর বোঝা বহন করা হয়। মোটকথা, সেই মালিক তাদের সাথে বিভিন্ন ধরনের আচরণ করে থাকে- যার কিছু কিছু বাহ্যত তাদের জন্য ভালো এবং কিছু মন্দ। কিন্তু সেসব প্রাণীর কি এই অধিকার আছে যে, তারা মালিককে অন্যায় আচরণের অপবাদ আরোপ করবে?

স্বাদ ও কায়ফিয়াত নয়; বরং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য

এক ব্যক্তি মাওলানার খেদমতে হাজির হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজ কর্মের প্রতি অনীহা ব্যক্ত করেন। মাওলানা তাকে লেখেন :

'এটি নিশ্চিত যে, যিকির ইত্যাদির মধ্যে যে স্বাদ ও কায়ফিয়াত রয়েছে তা ব্যবসা ইত্যাদির মধ্যে নেই। অথচ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রশংসায় অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং আমানতদার ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে সুসংবাদও দেয়া হয়েছে। কিন্তু তালেবের উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি হওয়াই বাঞ্ছনীয়; স্বাদ ও কায়ফিয়াত নয়।'

এক স্থানে মাওলানা রহ. একথাও প্রকাশ করেন যে, কোন কোন সময় এই স্বাদ ও কায়ফিয়াত সালেকের জন্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তার আরও অধিক উন্নতির ধারা বন্ধ হয়ে যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ফযীলত বর্ণনা করার পর লেখেন :

'যখন ব্যবসা-বাণিজ্যের এই ফযীলত। তখন তালেবে খোদার জন্য তা কীভাবে ওজর হতে পারে! অবশ্য এই পথে সেই স্বাদ ও কায়ফিয়াত নেই কিংবা নিতান্ত কঠিন– যেমনটি হযরত সুফিয়ায়ে কেরামের কাজের মধ্যে রয়েছে। তবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনই তালেবের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত; কোন বস্তুর স্বাদ ও কায়ফিয়াত নয়। এ জন্যে তালেবে খোদার উচিত হল, যে পদ্ধতিতে তা সম্ভব এবং আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালামের মাধ্যমে সেই পথে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি থাকাটা প্রমাণিত হবে তা অবলম্বন করবে।'

মাওলানা বলেন, 'বেছাল' ও 'কামাল' মূল উদ্দেশ্য নয়; যদি দোস্তের সন্তুষ্টি বিচ্ছেদের মধ্যে থাকে তবে বিচ্ছিন্নতাই হবে মিলন। নিরাশ হওয়া এবং নিজের কর্মকে কিছু মনে করা বড় ভুল। বস্তুত ভালোবাসার ঘাটতিরই নিদর্শন। এক চিঠিতে তিনি লেখেন :

'এই ধারণা করা যে, আমি এই পরিমাণ দুরূদ শরীফ পাঠ করি কিংবা এমন অবস্থায় থাকি তথাপি জিয়ারত থেকে বঞ্চিত। তা থেকে দুটি বিষয় বুঝা যায়। প্রথমত এ পরিমাণ পড়াকে কিছু মনে করা। দ্বিতীয়ত, নিরাশ হওয়া। এই দুটি বিষয় নির্বুদ্ধিতা ও ভালোবাসার অপর্যাপ্ততার নিদর্শন বহন করে। সত্যিকার ভালোবাসার অবস্থা নিম্নোক্ত চরণদ্বয় থেকে অনুমিত হয়–

ہجر یکہ بود در رضائے دلبر ☆ از وصل ہزار بار خوشتر

'যে বিচ্ছেদে প্রিয়জনের সন্তুষ্টি, তা হাজার মিলনের চেয়ে ভালো।'

আমাদের ইবাদত ও আনুগত্যের চাহিদা এই হওয়া চাই যে, স্বীয় আনুগত্য ও ইবাদতের খেয়ালও অন্তরে থাকবে না। সবসময় নিজেকে অপরাধী মনে করবে। অন্তরে এই উপলব্ধি থাকবে যে, আমাদের থেকে কিছুই হতে পারে না। নিজের আমলকে কিছু মনে করা বড় ভুল। সেই পবিত্র সত্তা যিনি আমাদের ধারণা-চিন্তারও ঊর্ধ্বে, তার হাবীবের সা. কেমন মর্যাদা হবে? তা অনুধাবন করে এই চিন্তা করতে হবে যে, আমাদের কী সত্তাই বা রয়েছে! বস্তুত আমাদের আমল এমন কি হয়েছে যে, সেই সুমহান দরবারে প্রিয় হবে এবং যার ফলে আমাদের

ওপর রহমত বর্ষিত হবে? আর এ কথাও খেয়াল রাখতে হবে যে, বুযুর্গগণ পঁচিশ হাজার বার দুরূদ শরীফ পড়েছেন। কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানিতে চেহারার উপর দাগ পড়ে গেছে। অতএব আমাদের হাজার দু'হাজার বার এমন কিইবা পরিমাণ হলো? এই সামান্য পরিমাণের ওপর এবং কোন সময় চোখের পানি নির্গত হওয়ার ফলে কী চিন্তা করি? বাল্য বয়সে অধমের যখন যিয়ারতের তামান্না জাগে তখন একাকী বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাঁদতাম। যিনি যেই অযীফা বলে দিতেন তা পড়তাম। বছরের পর বছর একই অবস্থা অব্যাহত থাকতো। কখনো নৈরাশ্য মনে স্থান পায়নি। যখন সরকার প্রজার ডাকে সাড়া দিলেন তখন অনেক কিছুই হলো। অতঃপর যতদিন দুর্ভাগ্য কিংবা সরকারের দর্শনের আগ্রহের মধ্যে বৃদ্ধি সাধিত না হয় এবং প্রকৃত ভালোবাসার পরীক্ষা ধার্য্য ছিল ততদিন দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ কখনো হতাশা মনে স্থান পায়নি; বরং আগ্রহ বাড়তেই থাকে।

অযীফার পরিমাণ নয় গুণগত মানই বিবেচ্য

মাওলানা রহ. স্থানে স্থানে স্বীয় বিভিন্ন চিঠিপত্র ও নির্দেশনার মধ্যে এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন যে, অযীফা ও যিকির-আযকারের তত বেশি প্রয়োজন নেই যতটুকু প্রয়োজন অন্তরকে গায়রুল্লাহ থেকে পবিত্র করা। তিনি বলেন, অযীফার আধিক্য বিবেচ্য বিষয় নয়; বরং স্নেহ কায়ফিয়াতেই মনোযোগ নিবদ্ধ করার বেশি উপযুক্ত যা অযীফার প্রাণসত্তা ও মূল বিবেচ্য বিষয়। এ জন্যে জাগতিক কাজের মধ্যে মশগুল থাকার পাশাপাশি এই চেষ্টা সর্বদা রাখতে হবে যেন আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক ও যোগসূত্র কোন সময়ই বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায় এবং অন্তর সর্বদা তার স্মরণে আবাদ থাকে। তার জন্যে সব ধরনের আত্মত্যাগ ও কুরবানি করা সহজ ও সুমধুর হয়।

এক চিঠিতে তিনি লেখেন :

'অনেক বেশি অযীফা পড়া উপকারী নয়; বরং এই প্রচেষ্টা রাখতে হবে যেন অন্তরে আল্লাহ তাআলার মহব্বত ও ভালোবাসা বদ্ধমূল হয়। জাগতিক কোন বস্তুর মর্যাদা যেন অন্তরে না থাকে। যে কাজ করব আল্লাহর জন্যই করব। এমন হালত যেন তৈরি হয়ে যায় যাতে আল্লাহর জন্য জানমাল উৎসর্গ করা সহজ হয়ে যায়। যার অন্তরে আল্লাহ তাআলার মহব্বত ও ভালোবাসা বদ্ধমূল হয় তার জন্য জানমাল বিসর্জন দেয়া কেবল সহজই নয়; বরং এই পরিমাণ আনন্দদায়ক হয় যে, তা বর্ণনা করে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।'

দুনিয়া বর্জন নয় বরং দুনিয়া সংশোধন

মাওলানা এ বিষয়টি অনুধাবন করতেন যে, ইসলামের চাহিদা এই নয় যে দুনিয়াকে সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করা হবে; বরং তার চাহিদা হলো দুনিয়াকে সংশোধন করে তাকে আখেরাতের প্রস্তুতির জন্য ব্যবহার করা হবে। তার বিশেষ আহবাবকে মাওলানা রহ. কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে একটি ছিল–

'আমার প্রিয়গণ! আমি এ কথা বলছি না যে, প্রত্যেকে দুনিয়া বিমুখ হয়ে মসজিদে বসে যাবে; বরং বলছি একথা যে,

اَصْلِحُوْا دُنْيَاكُمْ وَاعْمَلُوْا لِاٰخِرَتِكُمْ.

অর্থাৎ স্বীয় দুনিয়াকে সংশোধন কর এবং আখেরাতের জন্য আমল কর। দুনিয়া উপার্জনের সময় যেন আল্লাহ তাআলার খেয়াল থাকে। অর্থাৎ দুনিয়া এমনভাবে উপার্জন কর যাতে আল্লাহ তাআলাও রাজি থাকেন। অর্থাৎ তা হালালভাবে উপার্জন কর এবং তাতে আল্লাহ তাআলার হকসমূহেরও খেয়াল রাখবে। বান্দার হকের প্রতি বরং তার চেয়ে বেশি খেয়াল রাখবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা অমুখাপেক্ষী। তিনি তোমার তোয়াক্কা করেন না। পক্ষান্তরে বান্দা মুখাপেক্ষী। এ জন্য বান্দার হকের প্রতি খেয়াল রাখা অনেক বেশি আবশ্যক। নতুবা তা মাফ হওয়া মুশকিল।'

'হিজাব'ও এনায়েত

সালেকের জীবনে কোন কোন সময় এমন পরিস্থিতি আসে যে, তার ও আল্লাহ তাআলার মাঝে একটি 'হিযাব' বা অন্তরালের মতো কিছু অনুভূত হয় এবং মনে হতে থাকে যে, আল্লাহ তাআলার 'নজরে করম' অভিমুখী হচ্ছে না। তা সালেকের জন্য একটি জবরদস্ত পরীক্ষা ও ইমতেহানের সময়। মাওলানা বলেন, এই 'হিযাব'কে সর্বদা অন্তরাল মনে করা উচিত নয়। কোন কোন সময় আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য এবং তালেবের অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টির জন্যও তা হয়ে থাকে। তিনি তার এক বিশেষ নির্দেশনাকামী মুরিদকে লেখেন :

'খুব স্মরণ রাখবে যে, তালেব কোন সময় বঞ্চিত হয় না। বরং কিছু দিনের জন্য অন্তরালে থেকে আগ্রহকে বৃদ্ধি করা এবং অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়া বড় লক্ষণীয় বিষয়। যার ফল সুস্পষ্ট।

اس قدر رہتا ہے مجھ کو آپکی باتوں کا دھیان

کششیکہ کہ عشق دارد نگزاردت بدیساں

بجازه گر نیابی بمزار خواہی آمد

ইরশাদে রহমানী

মাওলানার সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'ইরশাদে রহমানী' যা তিনি 'সুলূক ও তরীকতের' বিভিন্ন আদব বিষয়ে লিখেছেন। এখনও তাতে সেই প্রভাব ও আছর বিদ্যমান যা পাঠকের হৃদয়কে আলোড়িত না করে পারে না। তাতে লেখকের নিষ্ঠা ও লিল্লাহিয়্যাতের ছায়া পড়তে দেখা যায়, এটি সেই কিতাবের সবচেয়ে বড় ও বুনিয়াদি বৈশিষ্ট্য। কিতাবটিতে মাওলানা রহ., মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদীর উদ্ধৃতি দিয়ে কিছু কবিতার চরণ লিখেছেন। তিনি লিখেছেন যে, মাওলানা রহ. বলতেন, এই কবিতাগুলোকে আবেগ-অনুভূতি ও ভাবনা-চিন্তা করে পড়লে অন্তরের সজীবতা, আধ্যাত্মিক পরিচ্ছন্নতা ও আনন্দ অনুভূতি অর্জিত হয়।'

প্রায় একই কথা মাওলানার সেই রচনা সম্পর্কেও বলা যেতে পারে। তা অধ্যয়নের ফলেও অন্তরে এক ধরনের ভাবনা ও কোমলতা, আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও হৃদয়ের প্রফুল্লতা অর্জিত হয়। মনে হয় যেন আমরা অল্প সময়ের জন্য এক নতুন পরিবেশ ও একটি নতুন পৃথিবীতে পৌঁছে গেছি এবং আমার অন্তরের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তাতে গুনাহর প্রতি ঘৃণা ও পুণ্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ তাআলার প্রতি এক প্রকার সম্পর্ক ও যোগসূত্রের অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে। এই উপকার ও অনুভূতি যতই সাময়িক ও সীমাবদ্ধই হোক না কেন অনেক মূল্যবান। বস্তুত এই অবস্থা যদি কয়েক মুহূর্তের জন্যেও সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে তা আমাদের জীবনের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান ও কার্যকরী অংশ। অনেক মর্যাদা ও সংরক্ষণযোগ্য। এই কিতাব মাওলানা রহ., মাওলানা ফযলে রহমান রহ.-এর মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে লিখেছেন। মাওলানা ফযলে রহমান রহ. তা পুরোপুরি দেখেছেন এবং তার ওপর এই কথা লিখে দেন :

یاالٰہی ازیں رسالہ مومناں را نفع شود

'হে আল্লাহ, এই পুস্তিকা দ্বারা মুমিনদের উপকার হোক।'

حَرَّرَهٗ : فضل رحمٰن غفر له الله تعالٰی و لآ بائه وابنآئه و مریدیه.

কিতাবটি মূলত মাওলানা ফযলে রহমানের রহ. মালফূজাত ও বিভিন্ন নসীহতের ওপর লিখিত। কিন্তু তাতে স্বয়ং মাওলানারও প্রাথমিক অবস্থা ও হালাতের উল্লেখ রয়েছে। তাতে অন্যান্য কিছু বিষয় রয়েছে। কিতাবটির এ পরিমাণ মাকবুলিয়াত

হাছেল হয়েছে যে, এর ১৭ কিংবা ১৮ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এর দ্বারা অনেক লোকের উপকার হয়েছে এবং কিতাবটি তাদের ঈমান ও ইয়াকীনের উন্নতি সাধনের কারণ হয়েছে। মাওলানা ফযলে রহমান রহ.-এর কক্ষে এই কিতাবটি সবসময় শোভা পেত। কিতাবটিতে লতীফাসমূহ এবং যিকির আযকারেরও বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু তা এমন পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে যে, একজন প্রাথমিক ও সাধারণ লোকের তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আর না তাতে বিনা প্রয়োজনে দ্বিরুক্তি ও অহেতুক জটিলতার অনুভূতি হয়।

মাওলানা ফযলে রহমান রহ. সহজতা এবং তালেবের ক্ষমতা ও যোগ্যতার প্রতি খেয়াল রাখতেন। মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ.-এর শাস-কষ্টের কারণে নফী-ইসবাতের যিকিরের ক্ষেত্রে কিছু কষ্ট হতো। মাওলানা তা জানালে মাওলানা রহ. বলেন,

'বেশি না পারলে কেবল তিন বার করবে। বসে না পারলে শুয়ে শুয়ে।'

মাওলানা একথা লিখে বলেন,

'সুবহানাল্লাহ! কতই না সহজ। তাও শরীয়তের পাবন্দী করেই। কেননা الدِّيْنُ يُسْرٌ এটি রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস। নকশবন্দীয়া তরিকার বুযুর্গরা লিখেছেন, নফী ইসবাতের যিকির তিনশ বারের চেয়ে কম হতে পারবে না। অথচ হযরত রহ. না আমাকে কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন; আর না অন্য কোন তালেবকে দিতে দেখা গেছে। তার কারণও হচ্ছে সহজীকরণ।

যিকিরের একটি বড় উপকারের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করে মাওলানা রহ. লেখেন,

'যদি আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারো সাথে অন্তরের সম্পর্ক হয়ে যায় কিংবা কোন মন্দ অভ্যাস অন্তরে স্থান করে নেয় তবে নফী-ইসবাতের যিকিরের ক্ষেত্রে সেই বস্তুটিকে নফী করবে। উদাহরণস্বরূপ- কারও যদি সম্পদের মহব্বত হয় তবে তা দূর হওয়ার জন্য لا الله বলার সময় এই খেয়াল করবে যে, আল্লাহর মহব্বত আমার অন্তরে রয়েছে। অনুরূপভাবে যেই প্রতিবন্ধকতাই আসবে তাকে সেভাবেই প্রতিহত করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা দূর হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সেই পন্থা অবলম্বন করবে। আল্লাহর মেহেরবানীতে তা দূর হয়ে যাবে। তা ভালোভাবেই পরীক্ষিত।

হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ.ও শায়খ-এর কল্পনা করার শিক্ষা দিতেন না বরং বলতেন :

'অলক্ষে কল্পনায় এসে যাওয়া ভিন্ন কথা। বস্তুত তাতে কোন সমস্যা নেই। স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামেরও এমনটি হতো। তাই কোন সাহাবীর উক্তি–

كَأَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْضِ سَاقَيْهِ.

মাওলানা রহ. একদা জিজ্ঞাসা করেন :

'হযরত! শায়খের কল্পনাকেই কি 'নিসবাত' বলে?

তিনি বলেন, 'শায়খের কল্পনা (তাছাওওর) হোক আর না হোক শায়খের মহব্বত হওয়া চাই। আমরা কখনো করিনি। আমরা তো তা–ই করি যা হাদীসে এসেছে। তা থেকেই কালেমায়ে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ জারি থাকে। মনে রাখবেন বিষয়টি শরিয়তের অনুসরণ ও সেসব আমলের মাধ্যমে হাছেল হয় যা হাদীসে এসেছে তা অন্য কোন আমলের দ্বারা হাছেল হতে পারে না।'

একবার মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ. জিজ্ঞাসা করেন :

'এমন কোন বিশেষ দুরূদ শরীফের কথা বলেন, যা পড়ার ফলে রাসূলুল্লাহ সা.–এর জিয়ারত নসীব হবে।

তিনি বলেন, 'কোন বিশেষ দুরূদ শরীফ নেই। এখলাস সৃষ্টি করতে হবে।' সামান্য চিন্তার পর ইরশাদ করেন : 'অবশ্য, সাইয়িদ হাসান রাসূল নুমা রহ.–এর নিম্নোক্ত দুরূদের আমল ছিল–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عِتْرَتِهٖ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ.

এর ফলে তিনি নিজেও স্বপ্নে দেখতেন এবং যাকে তিনি বলে দিতেন তারও যিয়ারত নসীব হত।' [ইরশাদে রহমানী]

একবার মাওলানার খেয়াল হলো যে, তিনি হযরতের সোহবতে বেশি থাকতে পারছেন না। অথচ অন্য লোকেরা এই সৌভাগ্য হাছেল করে চলেছেন এবং সবসময় হযরতের খেদমতে হাজির থাকেন। এই খেয়াল অন্তরে আসা মাত্রই মাওলানার রহ. বলেন,

'থাকার ফলে কী হয়! যা হওয়ার তো তোমার এক ঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যায়।'

একবার তিনি বলেন :

'নেককার হওয়া এক জিনিস এবং 'বেলায়াত ভিন্ন জিনিস। 'বেলায়াত' কেবল আল্লাহ তাআলার বিশেষ নজরের বদৌলতেই লাভ হয়ে থাকে। হযরতের কাছে বিশ বিশ বছর পর্যন্ত লোক পড়ে থাকে। অথচ হযরত বলেন, আমরা অনেক

চেষ্টা করি। কিন্তু কিছুই হয় না। আর যাকে তিনি চান এক 'তাওয়াজ্জুহ'–এর মাধ্যমেই হয়ে যায়। এই কথা বলে হযরত দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন : 'পঠন পাঠনে কী হয়? দেখ, আমি সামান্য কুরআন শরীফ পড়ে নিচ্ছি এবং আরও কিছু সামান্য পরিমাণ পড়েন। এর পরে লুতফ–এর মধ্যে এসে বলেন : 'আল্লাহ ও রাসূলের ওপর জান কুরবান করতে হবে। এর মাধ্যমেই সব কিছু হবে। এরপর কিছু কবিতা আবৃত্তি করেন। তন্মধ্যে থেকে দু'টি চরণ নিম্নরূপ :

سحر میں سامری کے کیا قدرت ☆ تیری آنکھوں میں جو اثر دیکھا

ہجوم داغ نے میرے یہ گلفشانی کی ☆ کہ اپنے آپ تماشے کو مہربانی کی

মাওলানা বলেন, 'এসব কথা আমাকে সম্বোধন করে বলেন, যদিও আরও লোক বসা ছিলেন। এর ফলে আমার ভেতরের অবস্থায় বিস্ময়কর পরিবর্তন আসে–

سُبْحَانَ مَنْ نَوَّرَ قُلُوْبَ الْعَارِفِيْنَ بِنُوْرِ الْعِرْفَانِ. (ارساد رحمانی)

মাওলানা ফযলে রহমান রহ.–এর মালফূজাত ও ইরশাদাত বর্ণনা করার পর মাওলানা রহ. অনেক সংক্ষিপ্ত অথচ সুসমন্বিত ও সুস্পষ্টভাবে সুলুক ও আত্মশুদ্ধির আদবসমূহ এবং সেই পথের প্রাথমিক শর্ত ও প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর বর্ণনা দেন যেগুলোর অধ্যয়ন প্রত্যেক আল্লাহওয়ালা– তালেবের জন্য নেহায়েত উপকারী।

অভিরুচি ও কায়ফিয়াত

আল্লাহ্ তাআলার কাছে ও অন্যদের দৃষ্টিতে মানুষের সবচেয়ে বড় সম্মান ও মর্যাদার মানদণ্ড হলো তার ভেতর ও বাহির এক হওয়া। তার নির্জনতা সমাবেশে উপস্থিতি থেকে ভিন্ন হবে না। আর একজন পরিপূর্ণ ঈমানদার ও অলির মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ড হলো বেঁহুশ ও ওয়াজদের অবস্থায়ও কোন অসমীচীন কথা তার জবান থেকে বের হবে না এবং মহব্বতের পাত্র উথলে পড়বে না। যদি কেউ 'জযব' ও 'কায়ফিয়াত' 'শাওক' ও 'পাগলামি এবং দরদ ও ব্যথা খুব কম পরিমাণে লাভ করে থাকে তবে তার সুস্থির অবস্থা সেই ব্যক্তির মতো প্রশংসা ও মর্যাদাযোগ্য নয় যার ভেতর 'ইশক' ও 'মহব্বত' এবং যওক-শওকের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ অথচ বাইরে কোনো ধরনের অস্থিরতা নজরে আসে না।

এই যাওক ও কায়ফিয়াত (যেমনটি আল্লাহর কোন কোন অলির ইরশাদাত থেকে অনুমতি হয়।) কোন কোন সময় এমন স্তরে উপনীত হয় যে, মানুষ নিজের অস্তিত্বকেই বোঝা মনে করতে থাকে এবং তার ফলেও গায়রত অনুভব করে।

بردائے عقل نامحرم کہ امشب باخیال او

چناں خوش خلوتے بودم کہ من ہم نیستم محرم

এটি পূর্ণরূপে ফানা হয়ে যাওয়ার স্তর। সে সময় নিজের চক্ষু ও দৃষ্টিশক্তিতেও পর্দা আসা শুরু হয়ে যায়। আর কেবল 'মাহবুবের' ব্যতীত সব কিছু অন্তরের ওপর ভার এবং রূহের জন্য অসহ্য হয়ে যায়। তার অবস্থা হয়ে যায় তেমন যেমনটি নিম্নের কবিতার চরণসমূহে ব্যক্ত হয়েছে–

غیرت از چشم برم روئے تو دیدن نہ دہم

گوش را نیز حدیث تو شنیدن نہ دہم

گر بیاید ملک الموت کہ جانم بہ برد

تانہ بینم رخ تو روح رمیدن نہ دہم

ইশকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মাওলানার জিন্দেগী সেই যওক শওক ও আনন্দ অনুভূতির নমুনা ছিল। তার সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ও তামান্না রাসূল সা.–এর দর্শন লাভ। যেমনটি তিনি তাঁর একটি চিঠিতে ব্যক্ত করেছেন। বাল্যকাল থেকে তিনি সর্বদা সেই আকাঙ্ক্ষা ও তামান্নায় বিভোর থাকতেন এবং কাঁদতেন। মাওলানা রহ. তাঁর মুরিদদের কিছু বিশেষ কবিতা আবৃত্তি করারও তালকীন করতেন। বলতেন, এগুলো জুমার রাতে আবৃত্তি করতে হবে।

মাস্টার খোদা বখশ মুঙ্গেরী রহ. (যিনি মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ.–এর মুরীদ ও মাওলানা মুঙ্গেরী রহ.–এর দীক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন।) তিনি বলেন, 'একদা যথারীতি ভাগলপুর থেকে ফিরে আসি এবং হযরত মুঙ্গেরী রহ.–এর খেদমতে হাজির হই। ভাগলপুরবাসীদের সালাম–কালাম পৌঁছে দিই। শেষে বলেন, আর কোন কথা? বললাম, না। পুনরায় বলেন, আর কোন বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হয়নি তো? আমার মনে আর কোন বিষয় ছিল না। কিন্তু বার বার প্রশ্নের পর মনে পড়ে, ফেরার পথে সুলতানগঞ্জ স্টেশনে একটি ঘটনা ঘটেছিল। বললাম, জ্বি, হ্যাঁ, যখন গাড়ি সুলতানগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছে, একজন ফকীর বড় উদাস মনে কিছু কবিতার চরণ আওড়াচ্ছিল– যা আমার খুব পছন্দ হয় এবং মুখস্থ হয়ে যায়। বললেন, পড়েন? আমি নিম্নোক্ত কবিতার চরণগুলো পড়লাম–

نسیما جانب کویش گزر کن ☆ بگو آں نازنیں شمشاد مارا

بہ تشریف قدوم خود زمانے ☆ مشرف کن خراب آباد مارا

کہ بے دیدار تو اسباب شادی ☆ نمی شاید دل ناشاد مارا

তিনি জোশে এসে বলেন, মিয়াঁ! এর ফলে তো হুজুর সা.-এর জিয়ারত হয়ে থাকে।'

রাসূল সা.-এর সাথে সম্পর্কের কারণে মাওলানা রহ. আরবদের খুব খেয়াল রাখতেন। যদি জানতে পারতেন, অমুক স্থানে একজন আরব লোক এসেছেন এবং তার কোন প্রয়োজন রয়েছে, তখন তাকে সাহায্য করার পূর্ণ প্রচেষ্টা করতেন এবং নিজের প্রয়োজনকে পেছনে ফেলে রাখতেন। একবার একটি মূল্যবান 'আবা এক আরবকে দিয়ে দেন। মুদতার মুযাফফরপুরী এ ধরনেরই একটি চাক্ষুষ ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে যথার্থই বলেছেন :

کوئی آجاتا مدینہ کا جہاں

مال کیا اس پر فدا کرتے تھے جاں

কুদরতী সেমা!

কোন কোন সময় মাওলানার রহ.-এর সেমার (সঙ্গীত) প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হত। নির্জনে বসে কোন সুমধুর কণ্ঠের ব্যক্তির কাছ থেকে আশআর শুনতেন।

কোন সময় কোন বিশেষ কায়ফিয়াত ও জজবার ফলে কিছু শোনার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কোন এমন লোক পাওয়া যায়নি যিনি কিছু শোনাতে পারেন, তবে কুদরতের পক্ষ থেকে তার ব্যবস্থা হয়ে যায়। রাতে স্বপ্নের বিরল-বিস্ময়কর আবৃত্তি শুনতে পান যা জাগ্রত অবস্থায় পৃথিবীতে সম্ভব নয়। কোন কোন সময় এমন অবস্থা হতো যে, স্বপ্ন থেকে জেগে গেছেন তখন আওয়াজ আসা বন্ধ হয়ে যায়। আবার যখন চোখ বন্ধ করেন তখন পুনরায় আওয়াজ আসা শুরু হয়ে যায়। এটি বিস্ময়কর ঘটনা। যিনি আল্লাহ তাআলার প্রিয় রহীম কারীম আল্লাহ তাআলা এভাবেই তার আকাঙ্ক্ষা ও মনোবাসনা পূর্ণ করেন। এ ব্যাপারে কারো বিন্দুমাত্র মতভেদ নেই। কোন কোন সময় এমনও হতো যে, মাওলানা আব্দুল আযীয বিহারী রহ. কিংবা হাফেজ রহমতুল্লাহ মুযাফফরপুরী রহ. একাকী ইশক জাগানিয়া আশআর শোনাতেন এবং মাওলানা রহ.-এর চোখ বুজে আসত। কোন কোন সময় পূর্ণ ইস্তেগরাক-এর অবস্থা হয়ে যেত। তবে মাওলানা

রহ.–এর 'ইস্তেগরাক' 'ওয়াজদ' ও কায়ফিয়াতের অবস্থায়ও নামাজের বড় বেশি খেয়াল থাকত। আজান শোনামাত্রই সতর্ক হয়ে যেতেন এবং নামাজ আদায় করতেন। প্রথম হজ্বের সফরে মাওলানার 'ইস্তেগরাকী' অবস্থার প্রাবল্য হয়। মাঝে কয়েক ওয়াক্ত নামাজের সময় হয়। তথাপি নামাজ যথাসময় আদায় করেন এবং পুনরায় সেই অবস্থায় ফিরে আসে।

নামাজের প্রতি ইশক

নামাজের প্রতি মাওলানার এ পরিমাণ ইশক ছিল এবং জামাত ও সময়ানুবর্তিতার এ পরিমাণ যত্ন ছিল যে, তাকে দেখে

قُرَّةُ عَيْنِيْ فِيْ الصَّلٰوةِ.

এর অর্থ বুঝে আসত। এই শেষ যুগে তার এক বাস্তব ও জীবন্ত নমুনা নজরের সামনে আসত। তার ধারণা নিম্নের একটি ঘটনা থেকে অনুমিত হতে পারে।

একদা মাওলানা রহ. লাখনৌতে অবস্থান করছিলেন এবং দিনটি ছিল জুমার দিন। মাওলানার সময় সম্পর্কে যথাযথ ধারণা ছিল না। নামাজের জন্য চললেন। যখন মামা-ভাগ্নির কবরওয়ালী মসজিদে পৌঁছেন– তখন জানতে পারলেন নামাজ হয়ে গেছে একথা শুনে মাওলানা এতটাই প্রভাবিত হয়ে পড়েন যে, ফলে তিনি কার্পেটে পড়ে যান।

মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে দুর্বলতা ও অসুস্থতার তীব্রতা বেড়ে গিয়েছিল। ফলে ওঠা-বসারও শক্তি ছিল না। মাগরিবের নামাজের সময় তাকবীরের আওয়াজ কানে এসে পৌঁছে। হঠাৎ করে বিছানা থেকে ওঠে পড়েন এবং মসজিদে পৌঁছে বিছনায় পড়ে যান। অতঃপর হামাগুড়ি দিয়ে কোন রকম জামাতে শরিক হয়ে যান। [কামালাতে মুহাম্মাদিয়া]

মাওলানার অসুস্থতা ও শারীরিক দুর্বলতার সময় এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হত্তো যে, আজানের আওয়াজ যেন মাওলানার কানে না পড়ে, নতুবা অস্থির হয়ে স্বীয় অসুস্থতা ও দুর্বলতার পরোয়া না করে বাইরে এসে যেতেন। এই সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও পূর্বোক্ত ঘটনাটি ঘটে যায়।

রুচি ও সুপরিচ্ছদ

প্রিয়তার মাওলানার স্বভাবে শুরু থেকেই রুচিবোধ ছিল। তিনি সুন্দর পরিচ্ছদ ও রুচিপূর্ণ কাট-ছাটকে পছন্দ করতেন। কিন্তু স্বভাবে সাদাসিধে ও অকপটতার প্রতি ঝোঁক ছিল। তিনি বলতেন : অন্তরে চায় কম্বল গায়ে দিতে ও মোটা কাপড় পরিধান করতে। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও যেসব পোশাক আল্লাহ তাআলা পাঠান

তা আল্লাহর তাআলারই নিয়ামত ও দান মনে করে তা ফেরত পাঠানোকে মন সাঁয় দেয় না। তবে বিশেষ পোশাক আঁকড়ে থাকাকে ভালো মনে হয় না– চাই তা নতুন হোক কিংবা পুরাতন। যেভাবে নতুন পোশাকের কারণে অন্তরে খটকা আসতে পারে তেমনি মোটা কাপড়েও। বিশেষত দরবেশদের লৌকিকতার ভয় অধিক হতে পারে। কখনো কখনো বলেন, অকপট ও সাদামাটা পোশাকধারী লোক অনেক উত্তম মনে হয়। কিন্তু সেই কারীম ও দান-দক্ষিণা প্রদানকারীর বিস্ময়কর বান্দা-হিতৈষিকা যে, অন্তরের কোন ধরনের কামনা-বাসনা না থাকা সত্ত্বেও তিনি সব ধরনের সরঞ্জাম পৌঁছে দেন এবং আরামে রাখেন। এটি বাস্তব সত্য ও সন্দেহাতীত

جان وتن پروردۂ احسان تست

بے عوض بندہ نوازی شان تست

হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার নকশবন্দী রহ. অনেক শান-শওকতের সাথে থাকতেন এবং তার কাছে সম্পদের এমন প্রাচুর্য ছিল যে, বড় বড় আমীর ও নেতৃবৃন্দের কাছেও তেমনটি থাকত না। তবে সেসবের কোন প্রভাব তার তাকওয়া পরহেযগারী, ইরশাদ ও সুলূকের ওপর ছিল না। 'কামালাত'–এর লেখক এসবের উল্লেখ করতে গিয়ে এই চিত্তাকর্ষক ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেন :

'যখন মাওলানা জামী রহ. বায়আত –এর উদ্দেশ্যে তার খেদমতে উপস্থিত হন। তখন এই ধন-দৌলতের প্রাচুর্য ও চাকচিক্য দেখে নিম্নোক্ত চরণটি পড়তে পড়তে ফিরে আসেন।'

نہ مرد است آنکہ دنیا دوست دارد

ফিরে এসে এক মসজিদের মধ্যে শুয়ে থাকেন। এমতাবস্থায় ইলহাম হয়। নিজের এই ভুল সিদ্ধান্তের ওপর তওবা ও ইস্তেগফার পড়ে পুনরায় হাজির হন। হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার রহ. তাকে দেখামাত্রই বললেন, জামী! গতকাল কী কবিতার চরণ পড়েছিলে? অনেক জোরাজুরির পর তিনি বললেন,

نہ مرد است آنکہ دنیا دوست دارد

তার জবাবে খাজা সাহেব রহ. দ্বিতীয় একটি চরণ আবৃত্তি করেন–

بدارد، از برائے دوست دارد

সপ্তম অধ্যায়

জীবনের শেষ দিনগুলো, মৃত্যু এবং খলিফাবৃন্দ

নদওয়ার স্মরণ

ইরশাদ ইসলাহ্ এবং তাযকিয়া-তারবিয়াতের মহান কার্যক্রমের মাঝেও মাওলানা কখনই নদওয়ার কথা ভুলেননি এবং নদওয়ার সাথীদের সাথে যোগাযোগের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই, মাওলানা গোলাম মোহাম্মাদ হুশিয়ারপুরী এবং মুনশি ইহতেশাম আলী সাহেব রহ. ছাড়াও অন্যান্য হযরতের সাথেও তাঁর সম্পর্ক সুদৃঢ় ছিল। তিনি মাওলানা আব্দুল হাইয়ের কাছে অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের খবরাখবর জিজ্ঞেস করতেন। নদওয়া তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক তাযকিয়া এবং তারবিয়াতের কেন্দ্র ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। এ জন্য এর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রশ্নও তাঁর মনে জাগত না। এ সময় হযরত মাওলানা আন নদওয়াও অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পড়তেন এবং তার ঘনিষ্ঠজনদের কাছ থেকেও নিয়মিত নদওয়ার খোঁজখবর রাখতেন। এক চিঠিতে তিনি মাওলানা আব্দুল হাইকে লিখেন- আন নদওয়াতে মাহফিলের সংক্ষিপ্ত অবস্থা জেনেছি, আপনার মাধ্যমে- এর বিস্তারিত অবস্থা জানতে চাই।

মতবিরোধ সত্ত্বেও মাওলানা নদওয়ার দরসগাহকে প্রাধান্য দেন এবং তার দুই পুত্রকে এখানে পড়ার জন্য পাঠিয়ে দেন।

মাওলানা আব্দুল হাই সম্ভবত কোন এক সময় পুনরায় তাকে নদওয়ার দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করে এক পত্র লেখেন। এর জবাব লিখতে গিয়ে হযরত মাওলানা তাঁর পুরোনো বন্ধুর ব্যাপারে অনুযোগের সুরে বলেন-

আপনি তো পত্র প্রেরণের ধারা বন্ধ করে দিয়েছেন। আফসোস! আপনি তো আমাকে মৃতু মনে করেছেন। হ্যাঁ, আপনার ধারণা সঠিক। আমার অবস্থা এমনই হয়ে গেছে যে, আমাকে মৃত মনে করা হচ্ছে। আচ্ছা ভালো, যেকোন সময় খাতেমা বিল খায়েরের দুআ করলেই চলবে। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, আপনি আমাকে পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণের আবদার করেছেন। কাজেই আমার বিশ্বাস আপনি আমাকে নদওয়ার খবরাখবর অবগত করবেন।

তখনও মাওলানার ইলমি আগ্রহ উদ্দীপনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বিশালতার মাঝে কোন পার্থক্য আসেনি বরং তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নদওয়ার সাথী সঙ্গীদের ইলমি বিষয়াবলীর আদান প্রদানের ধারা অব্যাহত ছিল এবং নতুন প্রকাশনা ও কিতাবাদি পাওয়া এবং কেনার ব্যাপারে মাওলানা বরাবর অবগত করতেন।

এক চিঠিতে তিনি মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল হাই রহ. কে লেখেন- হায়দারাবাদ হতে ইদারাতুল মাআরিফ- এর প্রকাশনা চেয়েছি। মিসরের কিতাবাদি মৌলভী নুরুদ্দীনের কাছে এবং মুনশি মুহাম্মাদ আলীর কাছেও কিছু কিতাবের আবদার করেছি। আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে, মৌলভী হাসানের হাশিয়াকৃত নতুন হিদায়ার প্রকাশনাটা কেমন? এই হাশিয়াওয়ালা হিদায়া ইউসুফী প্রকাশনার সাথে তার সম্পর্ক কেমন? দেওয়ানে হাফেজ লাখনৌর নামকরা ছাপাখানায় ছাপা হয়েছে। শুনতে পেলাম এটা নাকি ভালোই। এতে ৩০০ (তিনশ) কবিতা সংকলন করা হয়েছে। আমি এটাও চাচ্ছি।

এক চিঠিতে তিনি লেখেন-

মিয়া ফয়জুর রহমান সম্ভবত তাবাকাতে ইবনে সাআদের চতুর্থ খণ্ড আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমাকে চিঠি লিখেছিল যে, ১০০ রুপির প্রয়োজন, দ্রুত পাঠিয়ে দিলে ভালো হয়।

আমি জবাব দিয়েছি যে, তুমি তো রওয়ানা করে দিয়েছ। আমি তা দেখে রুপি পাঠিয়ে দেব। ওই খণ্ডটি পৌঁছেছে। এটা খুবই ছোট যদিও তার ছাপা খুবই ভালো। কিন্তু তার দামও খুব বেশি মনে হচ্ছে। লন্ডনের ছাপা কিতাবও এত চড়া মূল্যের হয় না। হায়দারাবাদের এক ব্যক্তি তিনটি প্রশ্ন করেছে। এর জবাবই একটি পুস্তিকা হয়ে গেছে। এক সুহৃদ সেটা ছাপিয়ে দিয়েছে। এটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। এটা দেখবেন, যদি কোনো ভুল ধরা পড়ে তাহলে অবশ্যই জানাবেন।

শেষ দিনগুলো

দুর্বলতা ও অসুস্থতা আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। এখন তা আরো প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল। হজ্বের দুয়েক বছর আগ থেকেই এর তীব্রতা চলে আসছিল। এ সময় হযরত মাওলানা তার ঘনিষ্ঠজনদের যে পত্র লেখেন তাতেও রোগব্যাধির কথার আলোচনা রয়েছে। এখানে এমনও বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, তখন তাঁর রোগব্যাধি মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল।

এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন- 'এখন আমি প্রায়শই অসুস্থ থাকি। দুর্বলতা এবং জরাজীর্ণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আল্লাহ তাআলা খাতেমা বিল খায়ের নসিব

করুন।' অন্য জায়গায় লিখেছেন- এখন আমি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছি এবং অধিকাংশ সময়ই অসুস্থ থাকি। আমি সর্বদা-ই আল্লাহ তাআলার পয়গামের অপেক্ষা করি।

মুনশি ইহতেশাম আলী সাহেবকে এক চিঠিতে লিখেছেন- কোন কোন দিন তো অবস্থা এমনও হয়ে যায় যে, মনে করি যে, আজই আমার জীবনের শেষ দিন।

হযরত মাওলানার কিডনির্তে সমস্যা ছিল। মৃত্যুশয্যায়ও তাঁর কিডনিতে মারাত্মক ব্যথা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তার আসল রোগ ছিল দুর্বলতা। যা জ্বর ইত্যাদির উপসর্গ ধারণ করে মারাত্মক পীড়াদায়ক ব্যাধি হিসেবে প্রকাশ পাচ্ছিল।

জীবনের শেষ বছরগুলোতে বিস্মৃতি চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। এমনকি, নিজের সন্তানকেও চিনতে পারতেন না। কিন্তু আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, ফরজ ও সুন্নতের ব্যাপারে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। খুবই ধীর স্থিরভাবে নামাজ আদায় করতেন। কোন কোন সময় বিস্মৃতির মধ্যে কয়েকদিন কেটে যেত, খাবার দাবারের কথা মনে থাকতো না কিন্তু আজানের শব্দ কানে আসার সাথে সাথেই চোখ খুলে অযু করে নামাজ আদায় করতেন। নামাজ থেকে ফারেগ হওয়ার পরই পূর্বের অবস্থা জারি হয়ে যেত।

এই সময় একদা করীম বকশ মরহুম (যার আলোচনা পূর্বে চলে গেছে) হযরত মাওলানার পা দাবাচ্ছিলেন। কথার এক পর্যায়ে তিনি ইশারা করলেন, এতে বোঝা গেল যে, সময় শেষ হয়ে এসেছে। করীম বখশ সাহেবের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। বললেন, হযরত আপনার অবর্তমানে আমরা কী করব? করীম বখশ সাহেবের বর্ণনা, এ কথা শুনে হযরত উঠে বসলেন এবং খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন- মিয়া! তিন হাত মাটির মধ্যে যাওয়াতে কী আর হয়? আল্লাহর ওলীরা যখন জীবিত থাকে তখন মনে করবে যে, তরবারি তার কোষের মধ্যে রয়েছে আর যখন তারা ইন্তেকাল করেন তখন তো তরবারি কোষ হতে বেরিয়ে আসে। জীবন প্রদীপ কিছুটা এভাবে জ্বলছিল, দর্শক স্পষ্ট বুঝতে পারছিল যে, আখেরাতের সফরের প্রস্তুতি চলছে। ইলম ও মারিফাতের এই সূর্য অস্তপ্রায়।

এ কারণে তো মাহফিলে উত্তাপ বইছিল। কিন্তু পরিস্থিতি কোন দুর্যোগের সংকেত দিচ্ছিল। তবে এই অবস্থায়ও উৎসাহীদের জন্য বিশেষ শিক্ষণীয় পাথেয় ছিল। প্রত্যেক স্তর এবং প্রত্যেক অবস্থানের বড়রাই এই মেঘ কবলিত সূর্য হতে আলোকিত হচ্ছিল।

এটা তো প্রেম ভালোবাসার উত্তাপ ও আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে সাথে ইলম ও মারেফাতের আলো, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি, গবেষণামূলক দূরদৃষ্টির আলোকসম্ভার এবং পারস্পরিক ঐক্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল। এখানকার একজনকে অপরজন হতে বিচ্ছিন্ন করা যেত না। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা, এই মাহফিলে মাওলানা মুরতাজা হাসান দেওবন্দী, মাওলানা নেসার আহমদ কানপুরী, মাওলানা ইবরাহীম শিয়ালকুঠী (আহলে হাদীস), মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান নদভী, মাওলানা শিব্বীর আহমদ উসমানী, মাওলানা আব্দুশ শাকূর লাখনুভী, মাওলানা মানাযের আহসান গিলানী রহ.–এর মতো সচেতন উলামায়ে কেরামকে একই সময়ে দেখা যেত। কিছু উলামায়ে কেরাম বিশেষ করে মাওলানা আব্দুশ শাকূর সাহেব, মাওলানা আযহারুল ইসলাম ফতেহপুরী এবং মাওলানা গিলানী কোন কোন সময় সপ্তাহ এমনকি মাসও কাটিয়ে দিতেন।

শেষ সময়

শনিবার দিন মাওলানার অন্তিম রোগ শুরু হলো এবং তা এগার দিন স্থায়ী থাকল। এর প্রথম উপসর্গ এই ছিল যে, দিনের বেলা গোসল করলেন, আর রাতের বেলা গরমের তাড়নায় বারান্দায় বিশ্রাম নিলেন। এতে জ্বর এসে গেল। দেখতে দেখতে জ্বরের তীব্রতা বাড়তেই লাগল এবং ভয়ানক আকার ধারণ করল। অবস্থা বেগতিক দেখে একান্ত আপনজনদের টেলিগ্রাম করা হলো। তাঁর ঘনিষ্ঠজনের ভিড় লক্ষ্য করা গেল। কিন্তু পরক্ষণেই অবস্থা একটু ভালো হতে শুরু করল। আস্তে আস্তে জ্বর চলে গেল।

তৃতীয় অথবা চতুর্থ দিন আবার জ্বর দেখা দিল। এবার তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন। উহ আহ শব্দ করা বা ব্যথা বেদনার কথা প্রকাশ করার অভ্যাস হযরত মাওলানার ছিল না। অবস্থা জিজ্ঞেস করলে মাওলানা 'আলহামদুলিল্লাহ' ছাড়া অন্য কিছুই বলতেন না। এর আগে একবার আসরের নামাজের সময় কিডনির ব্যথা এতটাই বেড়ে গেল যে, তিনি জামাতে শরিক হতে পারলেন না। মাওলানা আব্দুস সামাদ রাহমানী নামাজের পরে অন্য লোকদের নিয়ে হযরতকে দেখতে এলেন। তিনি বললেন– আজ কিডনির ব্যথা এতটাই বেড়ে গেছে যে, এর আগে কখনই এত মারাত্মক আকার ধারণ করেনি। এরপর তিনি এই কবিতা পড়লেন–

عاشقاں را درد و غم حلوا بود ☆ گرچہ باد یگر کساں بلوا بود

'প্রেমিকের জন্য ব্যথা বেদনা তো প্রেমাস্পদের মিলনের মত,

যদিও তা অন্যদের জন্য মারাত্মক বিপদের কারণ হয়।'

হযরতের সাহেবযাদা তখন মালাওয়া থেকে চলে এসেছিলেন এবং উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন– এ ধরনের একটি কবিতা বলেছেন দাগ–

وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے یارب

مرے دونوں پہلوؤں میں دل بیقرار ہوتا

এ কবিতা শুনে মাওলানার ওপর এক বিশেষ অবস্থা জারি হয়ে গেল। কয়েক বার এই কবিতাটি আওড়ালেন। এগার দিন পর্যন্ত অসুস্থতার ধারা অব্যাহত থাকল। হযরত পবিত্রতার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত হুঁশ ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কড়া তাকিদ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই অবস্থায় একবার ফিরনি সামনে ধরা হলে সামান্য একটু মুখে তুলে দিয়েই ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, এখন আমার এই জিনিসটিও ভালো লাগছে না। অবশেষে খাওয়া-দাওয়া একেবারেই ছেড়ে দিলেন। খুব কষ্টে ঔষুধ গলার মধ্যে রাখা হচ্ছিল। অবশেষে পাঁচ দিন বেহুঁশ অবস্থায় কাটালেন। এ দিনগুলোতে তিনি জামাতে শরিক হতে পারলেন না। এর আগে মারাত্মক অসুস্থ থাকাকালেও তিনি জামাত তরক করেননি। সামান্য একটু শক্তি অনুভব করলেই জামাতে শরিক হতেন। মসজিদে হাজির হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে যেতেন। কামরায় নামাজ আদায় করলে খুবই অপ্রসন্নতা অনুভব করতেন।

ইন্তেকাল

ইন্তেকালের একদিন আগে মাওলানার এক খাস খাদেম একান্ত আপনজন হাজী লিয়াকত হুসাইন সাহেব হযরতের ঠোঁটে কান লাগালেন। তখন তিনি 'আল্লাহ আল্লাহ' আওয়াজ শুনতে পেলেন। ৯ রবিউল আউয়াল, রোজ মঙ্গলবার মোতাবেক ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ দুপুরের কাছাকাছি সময়ে মনে হলো যে, রুশদ ও হেদায়াতের এই রবিরও অস্ত যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। যোহর নামাজের পরে ২টার সময় আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলতে বলতে জীবনটাকে তার মালিকের হাতে সোপর্দ করলেন।

বিদ্যুতের গতিতে শহরে হযরতের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। চতুর্দিক থেকে লোকজন এসে ভিড় জমাতে লাগল। মাওলানা বরাবর যেখানে অবস্থান করতেন সেখানেই তাকে অশ্রু এবং পানিতে গোসল দেওয়া হলো। মানুষের মারাত্মক ভিড়ের কারণে মাগরিবের নামাজের পরে জানাযা অনুষ্ঠিত হলো। চাঁদনী রাতে

জানাযা খাটিয়াতে রাখা হলো, নামাজের পরে অসিয়ত মোতাবেক বারান্দার পশ্চিম পাশে লিচু গাছের নিচে দাফন করা হলো। অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় যাবত হিন্দুস্তানের সমাজ ও পরিবেশকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করে এই দিবাকর লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন।

در دست نہ تیر یست، نہ در دست کمان است

ایں سادگی اوست کہ بسمل دو جہان است

در مدرسہ راز جنبش لعل تو حکایت

در میکدہ از مستی چشم تو نشان است

সন্তানাদি

হযরত মাওলানা তিনটি বিয়ে করেছিলেন। প্রথম বিয়ে হয়েছিল মুহীউদ্দীনপুরের (মুযাফফর নগর) মরহুম মীর আমান আলীর কন্যার সাথে। তখন মাওলানার বয়স ছিল ২২ বছর। এই স্ত্রীর গর্ভে ২ মেয়ে এবং ৩ পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। এরা হলেন সাইয়িদ আহমদ আলী, সাইয়িদ মাহবূব আলী ও সাইয়িদ মাসূম আলী। এদের শেষ দুজন একেবারে অল্প বয়সেই ইন্তেকাল করেন। সাইয়িদ মাহবূব আলীর আশ্চর্যজনক অবস্থা দেখা যেত। 'কামালাতে মুহাম্মাদিয়া'-এর লেখক লিখেছেন- তিনি যখনই কথা বলা শুরু করলেন তখনই খুব বেশি পরিমাণে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আরে মিয়া! তুমি এত আল্লাহ আল্লাহ কর, তুমি কি আল্লাহকে দেখ। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দিলেন, আল্লাহ্ তো আমার কামরায়। আমার বিল্ডিং-এর মধ্যে। আমার ঘরে। ১০ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

মাওলানা সাইয়িদ আহমাদ আলী একজন আমলদার আলেম এবং উঁচু মাপের ইবাদতকারী এবং আল্লাহভীরু ছিলেন। তিনি মাওলানা নূর মুহাম্মাদ পাঞ্জাবী, মাওলানা আহমাদ হাসান কানপূরী ও মাওলানা মুহাম্মাদ ফারুক চিরকুঠীর কাছে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী বার্ধক্যের কারণে নিজে তাকে শিক্ষা দিতে পারেননি।

তিনিও ফুলাত এলাকায় (মুযাফফর নগর) বিয়ে করেন। তিনি ১২২৮ হিজরী রমযান মাসে জুমার দিন নামাজ পড়ার সময় ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তেকালের কয়েক মাস পরেই হযরতের অন্য মেয়ে উম্মে সালামাহ দুরূদ শরীফ পড়া

অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। বড় মেয়ে উম্মে কুলসুম ১৩২৭ হিজরীতে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

দ্বিতীয় বিবাহ মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ.–এর ইশারায় একজন বিধবার সাথে হয়েছিলে। এ বিদুষী নারী মাওলানা ফযলে রহমানের হাতে বাইয়াত হয়েছিলন এবং তালীমও প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তার থেকে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। বিয়ের ১০ বছর পরে তার ইন্তেকাল হয়ে যায়।

তৃতীয় বিবাহ সীকরীতে (মুযাফফর নগর) হয়েছিল। তার গর্ভে ৫ ছেলে, এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় জনের নাম ছিল আতীকুল্লাহ। ১৩১৮ হিজরীতে হযরত মাওলানা যখন হজ্বে যান তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১ মাস। শৈশবে তার খেলাধূলার প্রতি কোনই আগ্রহ ছিল না। বেশির ভাগ সময় নীরব থাকতেন। একবার তা মা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, চুপ করে থাক কেন?

জবাব দিলেন– 'আমি আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করি।'

মাত্র নয় বছর বয়সে অনেক নিষেধ করা সত্ত্বেও রমযান মাসের সবগুলো রোযা রাখেন। 'কামালাতে মুহাম্মাদিয়াতে' তার আলোচনায় বলা হয়েছে– তার মা একবার তাকে মখমলের একটি টুপি পরার জন্য দিলেন যাতে জরির কারুকাজ করা ছিল। কিন্তু তিনি তা পরলেন না। একটি সাদা কারুকাজহীন টুপি পরলেন। তিনি বললেন– আমি এ জাতীয় টুপি পরি না। ১২ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

দ্বিতীয় পুত্র মাওলানা লুৎফুল্লাহ তিনি তাকওয়া, পরহেযগারী, বিবেক বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। মাওলানা তাকে খেলাফতও দিয়েছিলেন। তিনি ১২৪২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

তৃতীয় পুত্র মুতীউল্লাহ। মাত্র আট বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

চতুর্থ পুত্র মাওলানা নুরুল্লাহ।

পঞ্চম পুত্র মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ রহমানী। তিনি বিহারের আমিরে শরীয়ত ছিলেন। বিহারে তার ব্যক্তিত্ব এবং প্রচেষ্টার দ্বারা মুসলমানরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

মাওলানা লুৎফুল্লাহর পর তিনি-ই মসনদে ইরশাদে সমাসীন হন। বিহারের প্রসিদ্ধ দীনী সংগঠন 'ইমারতে শরইয়্যাহ' মাওলানার তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হয়। মাওলানা চার বছর নদওয়াতে লেখাপড়া করেন। তিনি পিতার হাতে 'বাইয়াত' হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তার পিতার খলীফা মাওলানা মুহাম্মাদ আরেফ

সাহেবের কাছে বেশি উপকৃত হন। দীর্ঘ সময় তিনি হযরত মাদানীর সাহচর্যে ধন্য হন। (মাওলানা ফযলে রহমান সাহেবের খলীফা) মাওলানা হাজী মুহাম্মাদ শফী সাহেবের কাছে পাঁচ বছর অতিবাহিত করেন। মাওলানা রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করেন এবং জেল জুলুমের নির্যাতনও ভোগ করেন। জামিয়া রাহমানিয়ার দ্বিতীয়বার নবযৌবন লাভ ও কুতুবখানায়ে রাহমানিয়ার প্রশস্ততা ও উন্নতি মূলত তাঁরই পরিশ্রমের ফসল। তিনি ১৯৯১ সালে ইন্তেকাল করেন।

মুরিদ এবং খলীফাবৃন্দ

হযরত মাওলানার মুরিদ ও খলীফাদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী হলেন মাওলানা মুহাম্মাদ আরেফ সাহেব। তিনি বিহারের দরভাঙ্গা জেলার হরসিংহপুরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি মূলত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাবাদী রহ.-এর হাতে বাইয়াত ছিলেন। কিন্তু তার সুলূক ও তারবিয়্যাতের দায়িত্ব পড়ে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রহ.-এর জিম্মায়। আর তিনি তার হাতেই খেলাফত লাভে ধন্য হন। হযরত মাওলানারও তাঁর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। প্রায় ৩০ বছর পর্যন্ত মাওলানার সোহবত ও তরবিয়্যাতের ফয়েয দ্বারা উপকৃত হন। এরপর কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। মাদরাসায়ে রহমানিয়া সাওপুল (ভাগলপুর) তাকে আজও স্মরণ করে।

অত্যন্ত সহজ সরল ও বিনয়ী মানুষ ছিলেন। অনেক সময় দেখা গেছে ভীষণ গরমের মৌসুম, মাওলানা মুঙ্গের আগমন করেছেন। ঠিক দুপুরের সময় মাওলানা নিজের আসবাবপত্র নিজে বহন করে স্টেশন হতে খানকায় চলে এসেছেন। তিনি কোন কামরায় পর্যন্ত থাকতেন না বরং মসজিদেই অবস্থান করতেন। সাধারণ অসাধারণ সবার সাথেই সব সময় মিশতেন, সবার মাঝেই বসে যেতেন।

বিহারের কোন কোন এলাকায় তাজিয়ার ব্যাপক প্রচলন ছিল। মাওলানার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এখন সেখানে তাজিয়ার নামগন্ধও নেই। 'তারহিস্ত' অঞ্চলে বিধবা বিয়েকে মন্দ চোখে দেখা হতো। মাওলানার প্রচেষ্টায় এটাও দূর হয়েছে। মাওলানা শুকরা নামক গ্রামে এক বিধবা মহিলাকে অনেক চেষ্টা করে বিয়েতে রাজি করালেন। এর ফল এই দাঁড়ালো যে, অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক বিধবা এই অজ্ঞতার আঁধার হতে মুক্ত হয়ে আলোর মুখ দেখতে পেল। এখন তো সেখানে ব্যাপকভাবে বিধবা বিয়ের প্রচলন দেখা যাচ্ছে।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ব্যাপারে মাওলানা খুবই যত্নবান ছিলেন। সুযোগ থাকলে শক্তি প্রয়োগ করে বাধা দিতেন। অন্যথায় মুখে বলতেন অথবা ওই স্থান ত্যাগ করতেন। মৃত্যুশয্যায় আবেদন করা হলো, 'দুআ করবেন,

আল্লাহ্ তাআলা যেন অভাব অনটন থেকে রক্ষা করেন। তিনি বলেন, আমার কোন সন্তানই অভাবী হবে না। যদি তোমরা খোদাভীরুতা অবলম্বন করে থাক। অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন–

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

'যে কেউ আল্লাহ্কে ভয় করে আল্লাহ্ তাআলা তার পথ বের করে দেন। আর তার ধারণাতীত উৎস হতে রিযিক দান করেন।' [সূরা ত্বালাক : ২-৩]

রোগ তীব্রতর হলো, যন্ত্রণা বেড়ে গেল। লোকজন বিষয়টি অনুধাবন করে অবস্থা জিজ্ঞেস করল তিনি জবাব দিলেন– 'কোন কষ্ট নেই, তবে অস্থিরতা আছে। এখন তো আমার পরওয়ারদেগারের সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে।' এরপর হযরতের পুত্র মাওলানা আব্দুর রহমান আগমন করলেন। উচ্চস্বরে مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ. পড়লেন।

এই হাদীস মাওলানাকে প্রশান্ত করে দিল। আর তিনি উচ্চস্বরে বললেন– নিশ্চয়! এরপর আর কোন কথা হলো না। ৯ সফর ১৩৬৩ হিজরী জুমআর নামাজের সময় তিনি ইন্তেকাল করলেন।

মাওলানার অপর খলীফা মাওলানা আব্দুর রহীম গুগরী। মুঙ্গের এবং ভাগলপুরের বিস্তৃত অঞ্চলেও মাওলানার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ তওবা করেছে। কাদিয়ানী প্রতিরোধেও তিনি বিশাল ভূমিকা পালন করেছেন। অন্য খলিফাদের তালিকা নিম্নরূপ–

১. মাওলানা হাফেজ শাহ্ রহমাতুল্লাহ্ মুযাফফরপুরী;

২. মাওলানা হাফেজ শাহ্ হাবীবুল্লাহ্;

৩. মাওলানা হাফেজ শাহ্ আব্দুল মজীদ মুযাফফরপুরী;

৪. মাওলানা মাহবুব হাসান রাহমানী;

৫. মাওলানা আব্দুর রশীদ সাহেব রানী সাগর (জেলা- আরাহ);

৬. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক সাহেব;

৭. মাওলানা মুহাম্মাদ লুৎফুল্লাহ্ সাহেব (সাহেবজাদা ও প্রথম সাজ্জাদনশীন);

৮. শায়খ আবু বকর হাম্মাদ মক্কী;

৯. মাওলানা ইবরাহীম সাহেব (মুমবাসাহ)।

মাওলানা ইবরাহীম সাহেবের আলোচনা কিতাবে করা হয়েছে। আফ্রিকাতে শত শত বিধর্মী তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মাওলানা রহমাতুল্লাহ মুযাফফরপুরীর পিতা ছিলেন হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ ও মাওলানা ইসমাইল শহীদ রহ.-এর খলীফা। দরভাঙ্গায় তার অনেক মুরীদ ছিলেন। এখানে হযরত মাওলানার কয়েকজন মুরীদের কথা উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। কামালাতে মুহাম্মাদীয়ার লেখক সেই আলেমদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়েছেন যারা বায়আত হয়েছিলেন এবং দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে মাওলানা নূরুল হক চিশতী, মাওলানা জহির হাসান শওক ফেমচী, মাওলানা মুফতি আবদুল লতীফ, মাওলানা হাকীম আবদুল বারী, দরভাঙ্গা মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব, কামালাতে মুহাম্মাদীয়ার লেখক মাওলানা আলী হাসান, মাওলানা সাইয়িদ শাহ সামী আহমদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। মাওলানা মানাজির আহসান গিলানী হযরতের জীবনের শেষ এক বছর খেদমত ও দীক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন।

ভক্তদের মধ্যে হাজী লিয়াকত হুসাইন ছিলেন হযরতের রুচিসচেতন ও একান্ত খাদেম। তাছাড়া মুনশী শরাফত হুসাইন, মীর আলী হাসান প্রমুখ ছিলেন হযরতের বিশেষ ভক্তদের অন্তর্ভুক্ত।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী হাসান কামালাতে মুহাম্মাদীয়া নামে হযরতের জীবন ও কর্মের ওপর ৩০৭ পৃষ্ঠার একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেটাই হযরতের জীবন ও কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে বড় তথ্যভাণ্ডার। বর্তমান গ্রন্থে ওই গ্রন্থ থেকে অনেক কিছুই নেয়া হয়েছে। মাওলানা মুহাম্মাদ আলী হাসান ছিলেন মুঙ্গের জেলার বারিয়া এলাকার বাসিন্দা এবং দরভাঙ্গা মাদরাসায়ে ইমদাদিয়ার ফার্সীর উস্তাদ। তিনি হযরত মাওলানার সাথে সমকালীন অনেকের চেয়ে বেশি সময় কাটানোর সুযোগ পেয়েছেন এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সফরে তিনি হযরতের সাথী ছিলেন। হযরতের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। হযরতও তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

বিশ্ব বরেণ্য বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও দা'ঈ
আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) রচিত কিতাব সমূহ

০১। মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?
০২। সীরাতে সাইয়িদ আহমেদ শহীদ (র) (১ম -২য়)
০৩। সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (১ম–৭ম) খণ্ড
০৪। কারওয়ানে জিন্দেগী (১ম–৭ম) খণ্ড
০৫। শায়খুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র)
০৬। হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী (র)
০৭। তারুণ্যের প্রতি হৃদয়ের তপ্ত আহ্বান
০৮। হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)
০৯। হযরত মুজাদ্দিদে আল্ ফেসানী
১০। ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান
১১। ইসলামঃ ধর্ম. সমাজ সংস্কৃতি
১২। সীরাতে রসূল আকরাম (সা.)
১৩। হযরত আলী-এর জীবন ও খিলাফত
১৪। নতুন পৃথিবীর জন্ম দিবস
১৫। ঈমানদীপ্ত কিশোর কাহিনী
১৬। ইসলামী জীবন বিধান
১৭। সালাত: গুরুত্ব ও তাৎপর্য
১৮। সিয়াম: গুরুত্ব ও তাৎপর্য
১৯। হজ্ব: গুরুত্ব ও তাৎপর্য
২০। যাকাত: গুরুত্ব ও তাৎপর্য
২১। আরকানে আরবা'আ
২২। ছোটদের আলী মিয়া
২৩। ঈমান যখন জাগলো
২৪। কারওয়ানে মদীনা
২৫। প্রাচ্যের উপহার
২৬। বিধ্বস্ত মানবতা
২৭। আমার আম্মা
২৭। আমার আব্বা
২৮। নয়া খুন
২৯। নবীয়ে রহমত
৩০। পুরানো চেরাগ -(১ম – ৩য়) খণ্ড
৩১। ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব
৩২। বিশ্ব সভ্যতায় রসূল আকরাম (সা.)
৩৪। হযরত আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহ.)
৩৫। মুসলিম লেখক ও প্রাচ্যবিদদের ইসলাম বিষয়ক গবেষণা মূলক মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা

মুহাম্মদ ব্রাদার্স

৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

সেলঃ ০১৮২২-৮০৬১৬৩ ; ০১৭২৮-৫৯৮৪৪০

দায়েরায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ রায়বেরেলীতে হযরত মাওলানার বিশ্রাম কক্ষ

এখানে চির নিদ্রায় শায়িত হযরত মাওলানা (শাহ্ আলামুল্লাহ কবরস্থান)

আল্লামা সুলায়মান নদভী রহ. ছাত্রাবাস

মা'হাদুল কুরআনিল কারীম

আল্লামা শিবলী রহ. পাঠাগার

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার প্রধান গেইট

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার কেন্দ্রীয় ভবন

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার কেন্দ্রীয় ভবনের একাংশ

মসজিদ-ই-রহমানী, মুঙ্গের, বিহার, ভারত

জামিয়া রহমানী, মুঙ্গের, বিহার, ভারত

রহমানী ফাউন্ডেশন, ভারত